হুগলী

বা

দক্ষিণ রাঢ়।

প্রথমার্দ্ধ।

শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত প্রণীত।

কলিকাতা,

৮০ নং গ্রে ষ্ট্রীট হইতে

শ্রীললিতমোহন পাল দ্বারা প্রকাশিত

ও

৬১ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীটস্থ গোবর্দ্ধন প্রেস হইতে

শ্রীগোবর্দ্ধন পান দ্বারা মুদ্রিত।

১৩২১ সাল।

মূল্য ১৷০ এক টাকা চারি আনা।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫১	১৫	৩৯০	৬৯০
৫৫	১৯	পরিকীর্ত্তিতঃ	পরিকীর্ত্তিতং
৫৫	২০	বিচরণা	বিচারণা
৫৫	২০	নাত্র	র্নাত্র
৫৫	২১	জগৎপতে	জগৎপতেঃ
৫৭	২৪	রাঢ়দেশ	রাঢ়দেশুঃ

হুগলী

বা

দক্ষিণ রাঢ়।

প্রথমার্দ্ধ।

শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত প্রণীত।

কলিকাতা,

৮০ নং গ্রে ষ্ট্রীট হইতে

শ্রীলম্বিতমোহন পাল দ্বারা প্রকাশিত

ও

৬১ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীটস্থ গোবর্দ্ধন প্রেস হইতে

শ্রীগোবর্দ্ধন পান দ্বারা মুদ্রিত।

১৩২১ সাল।

মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫১	১৫	৩৯০	৬৯০
৫৫	১৯	পরিকীর্ত্তিতঃ	পরিকীর্ত্তিতং
৫৫	২০	বিচরণা	বিচারণা
৫৫	২০	নাত্র	র্নাত্র
৫৫	২১	জগৎপতে	জগৎপতেঃ
৫৭	২৪	রাঢ়দেশ	রাঢ়দেশুঃ

কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ

পরম বিদ্যোৎসাহী বিদ্বজ্জন-সমাদৃত পরোপকার

পরায়ণ স্বদেশ-বৎসল কলিকাতা হাইকোর্টের

পূর্ব্বতন বিচারপতি রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ

বৃত্তিপ্রাপ্ত

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, এম্, এ, বি, এল,

মহাশয়ের নামে

এতদ্ গ্রন্থ গ্রন্থকার কর্ত্তৃক

প্রীতিপূর্ণ মনে

উৎসর্জিত হইল।

ভূমিকা।

পুস্তক সমাপ্ত হইলেই তাহার ভূমিকা লেখা বিহিত। অথচ উপস্থিত খণ্ড সম্বন্ধে কিছু না বলিলেও চলে না। এজন্য সংক্ষেপে এই ক্ষুদ্র ভূমিকাটী লিখিত হইল। দ্বিতীয় খণ্ডে সবিস্তার লিখিত হইবে। তাহাতে সকল কথাই থাকিবে।

পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে চুঁচুড়া হিন্দু-সমিতি হুগলী জেলার ইতিহাস সম্বন্ধীয় একটী উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিবার জন্য ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন। পরীক্ষক ছিলেন সাহিত্যাতিরথ শ্রীযুক্ত অক্ষয় চন্দ্র সরকার দাদা মহাশয়! এরূপ প্রবন্ধ লেখা আমার প্রকৃতিবিরুদ্ধ হইলেও আপনার জেলার ইতিহাস বলিয়া লিখিতে প্রবৃত্ত হই এবং পুরস্কারও লাভ করি। প্রবন্ধটী তৎকালে ক্ষুদ্রাকার ছিল, পরে বড় করিয়া লেখাও হইল কিন্তু মুদ্রাঙ্কনের কোন ব্যবস্থা হইয়া উঠিল না। বঙ্গের প্রায় সকল জেলারই ইতি-হাস হইতেছে কিন্তু শিক্ষা ও সভ্যতায় হুগলী সর্ব্বাগ্রগণ্য হইয়াও ইতিহাসবিহীন। যৎকালে হুগলীর অস্তিত্ব ছিল না তৎকালে এই সুবিস্তৃত ভূভাগ সুহ্ম ও রাঢ় নামে প্রসিদ্ধ ছিল। বর্ত্তমান হুগলী তাহার অংশ মাত্র। রাঢ় আবার উত্তর ও দক্ষিণ দুইভাগে বিভক্ত। বর্দ্ধমান বাঁকুড়া হাওড়া হুগলী এবং মেদিনীপুর দক্ষিণ রাঢ়ের অঙ্গীভূত ছিল। অতএব যতদিন হুগলী জেলার পৃথক অস্তিত্ব বর্ত্তিয়াছে ততদিনের প্রাচীন ইতিহাস উহাদের সহিত জড়িত, একসঙ্গে না লিখিলে উহার অঙ্গহানি হয়। অতএব তাহাতে উপেক্ষা করা চলে না।

পারিবারিক দারুণ দুর্বিপাকে আমার আর্থিক ও মানসিক অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়া উঠে। সেরূপ স্থলে ইহা প্রকাশিত করিবার আশা একবারে পরিহার করিতে হয়। কিন্তু যাবতীয় উপকরণ সংগৃহীত, অর্দ্ধেক অপেক্ষা বেশী লিখিয়া ফেলিয়া রাখাও সহ্য হইল না - কাপি ছাপাখানায় দিলাম। আট ফর্ম্মা ছাপার পর অর্থাভাব প্রযুক্ত ছাপার কাজ অগ্রসর হইল না। আমার পূর্ব্বতন ছাত্র শ্রীমান ললিতমোহন পাল বড়ই সাহিত্যামোদী, তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের পূর্ব্বতন বিচারপতি পরম সাহিত্যানুরাগী স্বদেশবৎসল শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের স্বগোচর করিলে তিনি মুদ্রিত ফর্ম্মা কয়েকটী দেখিতে চাহেন, এবং সেইগুলি দেখিয়া দেড় শত টাকা দেওয়ায় এবং আমার ছাত্র শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ শেঠ, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন পাল শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র শেঠ এবং শ্রীযুক্ত গঙ্গারাম শেঠ যথাসাধ্য কিছু কিছু আনুকূল্য করায় এই প্রথমখণ্ড বাহির হইল। দ্বিতীয় খণ্ড মুদ্রিত হইতেছে—ইহাতে মোগল ও ইংরাজ রাজত্বের বিবরণ তৎকালপ্রসিদ্ধ মহারাজা রাজা জমিদারগণের ইতিহাস, কবি, লেখক, ধনী, মানী ও অন্যান্য ব্যক্তিগণের বৃত্তান্ত এবং রাঢ়ের সামাজিক ইতিহাস ভিন্ন ভিন্ন জাতির অভ্যুদয় অবনতি কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক সমস্ত বিষয় সবিস্তার লিখিত হইতেছে।

কলিকাতা, সিমলা
৮ই চৈত্র, ১৩২১ সাল।

শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত।

হুগলী।

—ঃ*ঃ—

সুহ্ম ও রাঢ়।

হুগলী—"হুগলী" নাম বড় বেশীদিনের নহে। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে যখন সরস্বতীর স্রোতোবেগ মন্দীভূত হওয়া প্রযুক্ত সুপ্রাচীন সপ্তগ্রাম নগরের সৌভাগ্য-লক্ষ্মী চঞ্চলা হইতে থাকেন, বাণিজ্য-গৌরব ক্ষয় পাইতে আরম্ভ করে, সেই সময়ে পর্ত্তুগিজেরা সপ্তগ্রাম পরিত্যাগপূর্ব্বক কিছু দূরে দক্ষিণে আপনাদের হাট-বাজার গোলাগঞ্জ বাণিজ্যের কুঠি এই স্থানে সংস্থাপিত করেন। অনেকে অনুমান করেন যে, পর্ত্তুগিজেরা গোলাকে গোলিন বলিত। গোলিন হইতেই হুগলী নামের উৎপত্তি। ছিল গোলিন—হইল হুগলী। কি জন্য বা কি প্রকারে কোথা হইতে আদ্যাক্ষর "হু" আসিয়া জুড়িয়া বসিল এবং শেষের ন লোপ পাইল, ইহার কোন কৈফিয়ৎ তাঁহারা দিতে পারেন না। যদি গোলা হইতেই হুগলী নামের উৎপত্তি মানিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে গোলা-গুলি তৎকালে হোগলা নামক তৃণ হইতেই প্রস্তুত হইত, হোগলানির্ম্মিত গোলার সন্নিবেশ প্রযুক্ত স্থানটীর নাম হুগলী হওয়াই সমধিক সম্ভাবিত হইতে পারে। আধুনিক হুগলী সহরের অবস্থিতিস্থলে পূর্ব্বে অন্য কোন পল্লী ছিল বলিয়া মনে হয় না। কারণ ন্যূনাধিক চারিশত বৎসর পূর্ব্বে রচিত কবিকঙ্কণের চণ্ডী-কাব্যে হুগলীর পরপারবর্ত্তী গৌরিফা, হালিসহর, এপারে ত্রিবেণীর উল্লেখ আছে, কিন্তু হুগলী, চন্দননগর,

গোন্দলপাড়া, ভদ্রেশ্বর, গোরুটীর কথা নাই—আর আছে নিমাই-তীর্থের ঘাটের কথা যথা,—

বাম দিকে হালিসহর, দক্ষিণে ত্রিবেণী।
দুকূলে যাত্রীর রবে কিছুই না শুনি॥

*　　　　*　　　　*

গরিফা বাহিয়া সাধু বাহে ভাগীরথী।
কপোত এড়ায়ে সাধু পাইল সরস্বতী॥

*　　　　*　　　　*

উপনীত হৈল সাধু নিমাইতীর্থের ঘাটে।
নিমের বৃক্ষেতে যথা ওড় ফুল ফুটে॥

বৈদ্যবাটী নিমাইতীর্থের ঘাটের দক্ষিণে এবং কালীঘাটের মধ্যে কেবল বেতড়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে বোধ হয় শ্রীরামপুর, মাহেশাদি গ্রামের অস্তিত্ব তৎকালে ছিল না। ত্রিবেণীর সঙ্গে সঙ্গে সপ্তগ্রামের এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়,—

কলিঙ্গ, তৈলঙ্গ, অঙ্গ, বঙ্গ, কর্ণাট।
মহেন্দ্র, মগধ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট॥
বরেন্দ্র, বন্দর, বিন্ধ্য পিঙ্গল সহর।
কাশী, কাঞ্চী দ্রাবিড় রাঢ়, বিজয়নগর॥
মথুরা, দ্বারকা, আর কোলাপুর কায়া।
কুরুক্ষেত্র, প্রয়াগ, গোদাবরী, গয়া॥
ত্রিহট্ট, কাণ্ডুর আর হস্তিনা নগরী।
আর কতশত সহর বলিতে না পারি॥
এসব সহরে যত সদাগর বৈসে।
তরণী সাজায়ে তারা বাণিজ্যেতে আইসে॥

সপ্তগ্রামের বণিক কোথাও না যায়।
ঘরে বসে থাকে সুখে নানা ধন পায়॥
তীর্থমধ্যে পুণ্যতীর্থ ক্ষিতি অনুপম।
সপ্তঋষির শাসনে বলয়ে সপ্তগ্রাম॥

কবিকঙ্কণ-চণ্ডী।

ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে হুগলী, চন্দননগর, চুঁচুড়া প্রভৃতির অস্তিত্ব ছিল না। হুগলীর অভাব সপ্তগ্রাম মিটাইত। হুগলীর ব্যবসায় বাণিজ্য ও রাজ-কার্য্যাদি সমস্তই সপ্তগ্রামে নির্ব্বাহ পাইত। সপ্তগ্রামের এই অধিকার স্মরণাতীত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। তাহার আলোচনা পরে করা যাইবে, এখন দেখিতে হইবে, যে সপ্তগ্রাম একটী নগর মাত্র; অবশ্য বহুকালের প্রাচীন নগর তাহাতে সন্দেহ নাই—উহা কোন্ দেশের বা কোন্ রাজ্যের নগর। বর্ত্তমান সময়ে দেখা যাইতেছে—ইহার তিনদিকের ভূভাগ বা জনস্থান অনেক দিন হইতে রাঢ় নামে প্রসিদ্ধ। এনাম যদিও সরকারী কাগজ পত্রে এখন প্রচলিত নাই, কিন্তু লোকমুখে ইহার এই নাম আজি পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। তদ্ভিন্ন ইহার অপর নাম —"সুহ্ম" আজিকালি কেহ কেহ ইহাতে আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন—"দেশীয় ও বিদেশীয় প্রত্নতত্ত্ববিদেরা রাঢ় দেশকে প্রাচীন সুহ্ম দেশ বলিলেও তাহা নহে।" কথাটা যখন উঠিয়াছে, তখন তাহার আলোচনার প্রয়োজন।

রাঢ় ও সুহ্ম এই দুই নাম আমরা বহুপ্রাচীন শাস্ত্রে দেখিয়া আসিতেছি। কেবলমাত্র দেখা নয় তাহার শাস্ত্রিক

প্রমাণও পাইতেছি। সেইগুলির অনুধাবন করিয়া দেখিলেই ইহার সুসিদ্ধান্ত হইতে পারিবে। তবে অনেকে তাহাও যে না করিয়াছেন এমন নহে। তথাপি আমরা চর্ব্বিত চর্ব্বণে প্রবৃত্ত এই জন্য যে তৎসম্বন্ধে যদি আরও কোন নূতন যুক্তি তর্ক দ্বারা সুহ্ম যে রাঢ় তাহা আরও সুস্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন করিতে পারি।

রাঢ় বহুপ্রাচীন দেশ—রাঢ় নামও অপ্রাচীন নহে, আড়াই হাজারের ত কথাই নাই—তাহা অপেক্ষা উহার প্রাচীনত্বে সন্দেহ করিবার কিছু নাই। আমরা পশ্চাৎ তাহার আলোচনা করিব। এখন দেখা যাউক প্রাচীন কাব্য, নাটক, পুরাণাদিতে উহার কিরূপ পরিচয় আছে, পরে তাহার সঙ্গতি অসঙ্গতি, যৌক্তিকতা অযৌক্তিকতার বিষয় বিবেচনা করা যাইবে। অতি পুরাকাল হইতে ইহা গৌড় বা বঙ্গদেশের অন্তর্গত। রাঢ়ের প্রাচীন রাজগণ, কখন গৌড় বা বঙ্গদেশের রাজার অধীন, কখন অনধীন ছিলেন। এ জন্য কোন কোন প্রাচীন গ্রন্থে রাঢ়ের উল্লেখ আছে, কোন গ্রন্থে বা কেবল বঙ্গেরই নাম দেখিতে পাওয়া যায়, রাঢ়ের নাম নাই—আবার কোন কোন গ্রন্থে রাঢ়, বঙ্গ ও গৌড়ের পৃথক পৃথক উল্লেখ দৃষ্টিগোচর হয়।

ভাগীরথ্যা পূর্ব্বভাগে দ্বিযোজনতঃ পরে।
পঞ্চ-যোজন পরিমিত হ্যপবঙ্গোহিভূমিপ॥

দিগ্বিজয় প্রকাশ।

*　　*　　*　　*

বৈদ্যনাথং সমারভ্য ভুবনেশান্তগং শিবে।
তাবদ্বঙ্গাভিধে দেশো যাত্রায়াং নহি দুষ্যতি॥

*　　*　　*　　*

রত্নাকরং সমারভ্য ব্রহ্মপুত্রান্তগং শিবে।
বঙ্গদেশ ময়া প্রোক্তঃ সর্ব্বাসিদ্ধি প্রদায়কঃ॥

শক্তিসঙ্গম তন্ত্র।

বৈদ্যনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া ভুবনেশের অন্ত পর্য্যন্ত তাবৎ দেশ বঙ্গ, তথায় গমনে দোষ নাই। আর সমুদ্র হইতে ব্রহ্মপুত্র নদের শেষ পর্য্যন্ত সর্ব্বসিদ্ধিদাত্রী বঙ্গভূমি। সুহ্মদেশ যে ইহার ভিতর তাহা উপলব্ধি করিতে পারা যায়। অনেকানেক পুরাণমধ্যে এবং চলিত কথাতেও অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। সুহ্ম ও রাঢ়ের যে পৃথক্ উল্লেখ নাই—তাহার আর কোন কারণ নাই। ঐ দুই রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবার অল্পকাল মধ্যেই উহাদের প্রসার প্রতিপত্তির অপচয় প্রযুক্তই এরূপ ঘটিয়া থাকিবে। রাঢ়ের পুনরভ্যুদয় কালে আবার রাঢ় যে স্বনামপ্রসিদ্ধ ছিল, তাহা প্রবোধচন্দ্রোদয়ের দম্ভবাক্যে বুঝিতে পারা যায়।

সন ১৩১৪ সালের কার্ত্তিক সংখ্যক ঐতিহাসিক চিত্রে—"প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সাহিত্যে বঙ্গের উল্লেখশীর্ষক-প্রবন্ধে" উদ্ধৃত হইয়াছে—

সুহ্মান্ মাল্যান্ বিদেহাংশ্চ মলয়ান্ কাশিকোশলান্।
মাগধান্ দণ্ডকুলাংশ্চ বঙ্গানঙ্গস্তথৈবচ॥

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ৪০ অঃ ২২।২৩ শ্লোক।

কিন্তু বঙ্গবাসীর বাল্মীকি রামায়ণে ঐ শ্লোকের এইরূপ মুদ্রাঙ্কণ দৃষ্ট হয়।

সমুদ্রমবগাঢ়াংশ্চ পূর্ব্বতান্ পত্তনানি চ।
মন্দরস্য যে কোটিং সংশ্রিতাঃ কেচিদালয়া॥

এরূপ পাঠদ্বৈধ স্থলে ইহা সর্ব্বসম্মত প্রমাণ হইতে পারে না।

এতদ্ব্যতীত পূর্ব্বাঞ্চলে আর কোন দেশের নাম দেখা যায় না। মহাভারত ও বিষ্ণুপুরাণে সুহ্ম দেশের বিশেষ পরিচয় আছে যথা—

তাং স দীর্ঘতমাঙ্গেষু স্পৃষ্ট্বা দেবীমথাব্রবীৎ।
ভবিষ্যন্তি কুমারাস্তে তেজসাদিতবর্চ্চসঃ॥
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গাশ্চ পুণ্ড্রাঃ সুহ্মাশ্চ তে সুতাঃ।
তেষাং দেশা সমাখ্যাতাঃ স্বনাম কথিতা ভুবি॥
অঙ্গস্যাঙ্গোঽভবেদ্দেশো বঙ্গো বঙ্গস্য চ স্মৃতাঃ।
এবং বলেঃ শূরাবংশ প্রখ্যাতো বৈ মহর্ষি চ॥

মহাভারত আদিপর্ব্ব।

মহর্ষি দীর্ঘতমা বলিরাজ-মহিষীর অঙ্গস্পর্শ করিয়া বলিয়াছিলেন তোমার মহাবলপরাক্রান্ত অঙ্গ বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম নামে পাঁচপুত্র জন্মিবে। তাহাদের নামানুসারে তাহাদের স্ব স্ব অধিকৃত পাঁচটী দেশ বা রাজ্য হইবে। অঙ্গের নামানুরে অঙ্গ, বঙ্গের নামানুসারে বঙ্গ, কলিঙ্গের নামানুসারে কলিঙ্গ, পুণ্ড্রের নামানুসারে পুণ্ড্র এবং সুহ্মের নামানুসারে সুহ্ম দেশ।

মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেন—"সুহ্মাই রাঢ়দেশ। সুহ্মাঃ—রাঢ়াঃ।

অথ মোদাগিরৌচৈব রাজানাম্ বলবত্তরম্।
পাণ্ডব বহুবীর্য্যেন নিজঘান্ মহাদধে॥
ততঃ পুণ্ড্রাধিপং বীরং বাসুদেব মহাবলম্।

কৌশিকীকচ্ছ নিলয়ং রাজানঞ্চ মহৌজসম্॥
উভৌ বলভৃতৌ বীরাবুভৌ তীব্রপরাক্রমৌ।
নির্জ্জিত্যাজৌ মহারাজ বঙ্গরাজমুপাদ্রবৎ ॥
সমুদ্রসেননির্জ্জিত্য চন্দ্রসেনঞ্চ পার্থিবং।
তাম্রলিপ্তঞ্চ রাজানাং কর্ব্বটাধিপতিং তথা ॥
সুহ্মনামাধিপঞ্চৈব যে চ সাগরবাসিনঃ।
করমাহারয়ামাস রত্নানি বিবিধানি চ ॥

সভাপর্ব্ব ২৯ অধ্যায়।

অনন্তর মোদাগিরিতে উপস্থিত হইয়া নিজ বাহুবলে সেই স্থানের রাজাকে সংগ্রামে সংহার করিলেন। তৎপরে মহাবীর পুণ্ড্রাধিপতি বাসুদেব ও কৌশিকীকচ্ছনিবাসী মহাবলসম্পন্ন পরাক্রান্ত বীর দুইজনকে পরাজয় করিয়া বঙ্গরাজের প্রতি ধাবমান হইলেন। অনন্তর সাগরতীরবাসী সমুদ্রসেন চন্দ্র সেন তাম্রলিপ্ত কর্ব্বাটাধিপতি প্রভৃতিকে এবং সুহ্মদেশের রাজাকে পরাজয় করিয়া বহু ধনরত্ন লাভ করিলেন।

৺কালীপ্রসন্নসিংহের মহাভারতের অনুবাদে লিখিত আছে— "তৎপরে মহাবীর হাবীর, পুণ্ড্রাধিপতি বাসুদেব ও কৌশিকী কচ্ছবাসী মনৌজা এই দুই মহাবলপরাক্রান্ত মহাবীরকে পরাজয় করিয়া বঙ্গরাজের প্রতি ধাবমান হইলেন।"

মূলানুযায়ী অনুবাদ হয় নাই, মূলে আছে "মহৌজসম্" মহা+ওজসম=মহৌজসম্ এ স্থলে মনৌজা হইল কিরূপে? আর হাবীরই বা আসিল কোথা হইতে? এইরূপ অশুদ্ধ অনুবাদের বশীভূত হইয়া কত প্রবন্ধ লেখক যে বিষম প্রমাদ বাধাইয়াছেন তাহা বলিবার নহে।

বিষ্ণুপুরাণে সুহ্মদেশের পরিচয় এইরূপ—

উশীনরস্যাপি শিবিনৃপনরকৃমি
—খর্ব্বাখ্যাঃ পঞ্চপুত্রাঃ বভুব বিষদর্ভ
সুবীর কৈকেয় মদ্রকাশ্চত্বারঃ শিবিপুত্রা
তিতিক্ষোরুষদ্রথঃ পুত্রোঽভূৎ, ততোহেমঃ।
হেমাৎ সুতপাঃ, তস্মাদ্বলি, যস্যক্ষেত্রে দীর্ঘ
তমসা অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ সুহ্ম পুণ্ড্রাখ্যং
বালেয়ং ক্ষত্রমজন্যত॥

উশীনরের পাঁচ পুত্র—শিবি, নর, কৃমি, নৃপও খর্ব্ব। শিবির চারি পুত্র, তাহাদের নাম—বৃষদর্ভ, সুবীর, কৈকেয় ও মদ্রক। তিতিক্ষুর পুত্র—উষদ্রথ, তৎপুত্র হেম, হেমের পুত্র সুতপা।— তাঁহার পুত্র বলি। এই বলির মহিষী সুদেষ্ণার গর্ভে মহর্ষি দীর্ঘ-তমা অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ পুণ্ড্র ও সুহ্মনামে পাঁচ পুত্র উৎপাদন করেন। তাঁহাদের নামানুসারে তাঁহাদের অধিকৃত পাঁচটী দেশের নামকরণ হয়—অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ পুণ্ড্র ও সুহ্ম। মহাভারতেও ঠিক এই কথাই লিখিত আছে।

ভাগবৎ পুরাণের উক্তি—

ততো হেমাঽথসুত পাবলি সুতপোসোঽভবৎ।
অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গাদ্যাঃ সুহ্মপুণ্ড্রাধ্র সংজ্ঞিতাঃ॥

গরুড় পুরাণের কথা—

বলিঃ সুতপসোযজ্ঞে অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গকাঃ।
সুহ্মপৌণ্ড্রাশ্চ বালেয়া অনপানস্তথাঙ্গতঃ॥
পূর্ব্বখণ্ড ১৪৩ অধ্যায়।

বাস্তুতে আগমন করিলে শাক্যবালকেরা তাহাকে দাসীপুত্র বলিয়া উপহাস করে। জাতক্রোধ বিরুঢ়ক পরে পিতাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া শ্রাবস্তীর সিংহাসন অধিকার করিলে প্রসেনজিৎ স্বীয় পুত্রের বিরুদ্ধে আপন জামাতা অঙ্গ ও মগধের অধীশ্বর অজাতশত্রুর সাহায্যপ্রাপ্তির জন্য রাজগৃহ যাত্রাকালে পথিমধ্যে দেহত্যাগ করেন। বিরুঢ়ক কাশীকোশলের রাজপদ প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বাপমানের প্রতিশোধার্থ কপিলাবাস্তু আক্রমণ করিয়া সপ্তসপ্ততি সহস্র শাক্যকে বিনষ্ট এবং পঞ্চশত শাক্য-কন্যাকে বন্দিনী করেন। ভগবান বুদ্ধের খুল্লতাত অমৃতোদন শাক্য। তাঁহার পুত্র পাণ্ডুশাক্য ঐ যুদ্ধের পূর্ব্বে স্বজনগণ সহিত গঙ্গাতীরে আসিয়া বাস করেন, এবং তথায় রাজ্য স্থাপন করিয়া সুখে রাজত্ব করিতে থাকেন। এই পাণ্ডুশাক্যের রাজধানী হুগলীর উত্তরবর্ত্তী পাণ্ডুয়া। পাণ্ডুশাক্যের নামানুসারে উহার নাম পাণ্ডুয়া। রাঢ়ের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আর অধিক বলিবার কি আছে। প্রাচীন বঙ্গীয় কবিগণের অনেকেই রাঢ়ের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন,—

রাঢ়মধ্যে সপ্তগ্রাম অতি অনুপম।
দুই দিন সাধু তথা করিলা বিশ্রাম॥

কবিকঙ্কণ চণ্ডী।

কবিকঙ্কণের চণ্ডী চারিশত বৎসরের প্রাচীন।

১৪১৭ শকাব্দে রচিত বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে সপ্তগ্রামের উল্লেখ আছে। তাহাও চারিশত বৎসর অপেক্ষা বেশী কালের। কৃষ্ণরামের ষষ্ঠীমঙ্গল একখানি প্রাচীন গ্রন্থে তাহাতেও সপ্তগ্রামের পরিচয় আছে। অতঃপর দেখিতে হইবে এই রাঢ়দেশ ও সুহ্ম

অভিন্ন কি না। মহাভারতের নীলকণ্ঠ প্রণীত টীকা, রঘুবংশ, ধোয়ি কবির পবনদূত এবং দশকুমারচরিতের কথা স্বীকার করিলে সকল আপত্তিই চুকিয়া যায়। কিন্তু প্রতিবাদীগণ তাহা মানিয়া লইতে রাজি নহেন। তাঁহাদের যুক্তিতর্কের তাদৃশ বলও নাই। তাঁহারা বলেন—সুহ্মদেশ ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব্বপারে পর্ব্বতের উপর; আরও বলিয়া থাকেন যে আসাম, শ্রীহট্ট, শিলং, মধুপুরগড় প্রভৃতিই প্রাচীন সুহ্মদেশ তাহাতে সন্দেহ নাই। এইরূপ নানারকমের কথা। রাঢ় যে সুহ্মদেশ নহে—তাহার প্রথম অজুহৎ—মধ্যমপাণ্ডব ভীমের দিগ্বিজয় বর্ণনা মধ্যে দুইবার সুহ্মের উল্লেখ কেন—একবার মগধের নিকট, বারান্তরে কর্ব্বটের নিকট—ইহা অতি অসম্ভব ঘটনা বটে। ইহার উত্তর এই যে অশ্বমেধের ঘোড়াটার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভীমসেনকে যাইতে হইয়াছিল সেই ঘোড়া সুহ্মদেশ দিয়া দুইবার গমন করিয়াছিল। তজ্জন্যই সুহ্মদেশের নাম দুইবার করিতে হইয়াছে।

বৈশাখমাসের পূর্ণিমা তিথিতে যথাবিধি পূজা করিয়া অশ্বমেধের ঘোড়ার কপালে যজ্ঞকর্ত্তার নাম ও পরাক্রম চিহ্নিত পত্র লিখিয়া দিতে হয়। রক্ষকেরা তাহার রক্ষার জন্য সে যেখানে যাইবে তাহার সঙ্গে সেইখানে যাইবে তাহার যদৃচ্ছ গমনে বাধা দিবে না। এক রাজ্য হইতে পাশের রাজ্যেই যে সে ঘোড়া চলিতে থাকিবে এমন কোন কথা নাই। তাহার ইচ্ছানুসারে সে যেখানে যাইবে, রক্ষিগণকে তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইতে হইতে।

বৈশাখপৌর্ণমাস্যাং তু পূজয়িত্বা যথা বিধি।
পত্রং লিখিত্বা ভালেতু স্বনাম বলচিহ্নিতম্॥

মোচনীয় প্রযত্নেন রক্ষকৈঃ পরিরক্ষিতাঃ।
যত্র গচ্ছতি যজ্ঞাশ্বস্তত্র গচ্ছন্তি রক্ষকাঃ॥

পদ্মপুরাণ পাতাল খণ্ডে ৪র্থ অঃ।

* * * *

আক্রেন্তমাদিদেশাথ্যরামঃ শস্ত্রভৃতাং বর।
যাহি বহুস্তু রক্ষার্থং পৃষ্ঠতঃ স্বেচ্ছয়া গতেঃ॥

মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেনের পূর্ব্বদিগ্বিজয়বার্ত্তায় প্রতিপন্ন হই-তেছে যে অশ্বমেধের ঘোড়া যদৃচ্ছ গমন করে। তিনি আপন দিগ্বিজয় যাত্রা উপলক্ষে কোথায় কোন্ নদীনালা পার হইয়াছিলেন তাহার উল্লেখ করেন নাই। তাঁহাকে অনেকবার সরিদ্বরা সগরবংশ-পরিত্রাত্রী ভাগিরথী পার হইতে এবং তাহার অপর পারে যাইতে হইয়া-ছিল। সভাপর্ব্বে তাঁহার দিগ্বিজয় বিবরণ পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে যে তিনি জ্যেষ্ঠ্যাগ্রজ যুধিষ্ঠিরের নিকট বিদায় লইয়া করিতুরগ-সঙ্কুল বহুবল সমভিব্যাহারে পূর্ব্বদিগ্বিভাগে যাত্রা করেন এবং অনতিকাল মধ্যে পাঞ্চাল নগরে উপস্থিত হইয়া পাঞ্চালগণকে স্ববশে আনয়ন করেন। অনন্তর বিদেহ ও গণ্ডকদিগকে পরাজিত করিয়া অত্যল্পকাল বিলম্বেই দশার্ণদেশ অধিকার করিয়াছিলেন। (এই দেশ বিন্ধ্যপর্ব্বতের পুর্ব্ব দক্ষিণে।) গঙ্গাযমুনাদি কোন নদী পার হইবার কথা নাই। ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে বিদেহ ও গণ্ডকদিগকে পরাভূত করিতে যাইবার পথে সরযু গণ্ডক দুই নদী ও গঙ্গাদি নদী উত্তীর্ণ হইতে হয়। ঐ দুইটী স্থান গঙ্গার উত্তর তীরে। সেখান হইতে দশার্ণদেশে যাইতে হইলে নিশ্চিতই গঙ্গা পার হইতে হয়। কিন্তু ভীমসেনের নদী পার হইবার কোন কথাই নাই ত।

তৎপরে ভীমসেন অশ্বমেধেশ্বরকে স্ববশে আনয়নপূর্ব্বক দক্ষিণ-দিগ্বর্ত্তী পুলিন্দ নগরে যাত্রা করেন। তথায় সুকুমার ও সুমিত্র নামক ভূপতিদ্বয়কে বশীভূত করিয়া তিনি যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে চেদিরাজ শিশুপালের নিকট উপস্থিত হইলেন। শিশুপাল যুধিষ্ঠিরের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। সেখান হইতে কুমাররাজ্যে শ্রেণীমান ও কোশলাধিপতি বৃহদ্বলকে পরাভূত করিলেন। তৎপরে অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন। পাঠক বুঝিবেন—কোথায় বিন্ধ্যগিরির দক্ষিণ পূর্ব্বদিগবর্ত্তী দশার্ণ আর কোথায় অযোধ্যা। সুতরাং বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইতেছে যে ভীমসেন দেশের পর দেশ জয় করিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি অযোধ্যার রাজা দীর্ঘযজ্ঞকে পরাজিত করিয়া গোপালকক্ষ, উত্তর কোশল ও মল্লদেশ জয় করিলেন। পাঠক স্মরণ রাখিবেন এখানে এক মল্লদেশ আবার বঙ্গদেশের বাঁকুড়া জেলা ও মল্লভূমি বা মল্লদেশ। তৎপরে মধ্যম পাণ্ডব হিমাচলের পার্শ্বদেশে সমুদায় জলোদ্ভব দেশ অধিকৃত করিলেন। তৎপরে তিনি ভল্লাট ও শুক্তিমান পর্ব্বতবাসিদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া কাশীরাজ সহিত সুবাহুকে বশীভূত করিলেন। কোথায় বিদেহ গণ্ডক, কোথায় অযোধ্যা, আর কোথায়ই বা কাশী! কাশী অযোধ্যার দক্ষিণ, আবার অযোধ্যার কত পূর্ব্বদিগে গণ্ডক বিদেহ। মানিতেই হইল অশ্বমেধের ঘোড়া কাহারও বাধা মানিয়া, বশীভূত হইয়া চলিবার নহে। সে যে দিকে ইচ্ছা যতবার ইচ্ছা ততবার সেই দিকে যাইত। অশ্ব-রক্ষককে তাহার অনুসরণ করিতে হইত। কাশীরাজকে স্ববশে আনয়ন করিয়া তিনি সুপার্শ্ব, ক্রথ, মৎস্য, মলদ ও পুণ্ড্রভূমি জয় করিলেন, তৎপরে তথা হইতে প্রতিগমনপূর্ব্বক মদধার

মহীধর ও সোমধেয়দিগকে জয় করিয়া উত্তর মুখ করিয়া ছিলেন। ইহাতে বুঝিতে হইবে—দশার্ণ হইতে একবার উত্তর মুখ করিয়াছিলেন। ক্রমে দক্ষিণ দিকে আসিয়া আবার উত্তর দিকে তাঁহাকে যাইতে হইয়াছিল; সেখানে বৎসভূমি অধিকার ও ভর্গের অধীশ্বর নিষাদাধিপতি (নিষদ নহে) ও মণিমাল প্রভৃতি রাজগণকে পরাভূত করিলেন। তৎপরে সান্ত্ববাদ প্রদানপূর্ব্বক শর্ম্মক ও বর্ম্মকদিগকে বশীভূত করিলেন। পরে মহারাজ বৈদেহক এবং জগতীপতি জনককে পরাজিত করিলেন। (ইতিপূর্ব্বে একবার বিদেহ দেশে যাইবার উল্লেখ আছে) অতঃপর ছল প্রকাশে শক ও বর্ব্বরদিগকে বশতাপন্ন করিলেন। তৎপরে ইন্দ্র-পর্ব্বত সন্নিহিত বিদেহদেশে অবস্থিতি করিয়া তিনি সপ্ত প্রকার কিরাতাধিপতিকে পরাভূত করিলেন, ইহাতে বুঝিতে হইবে—ঐ সপ্তবিধ কিরাতভূমি বিদেহের এত নিকট যে সেখানে থাকিয়া তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া ফিরিয়া আসা চলে না, অতএব এই সকল কিরাতভূমি কোন ক্রমেই মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্ববর্ত্তী হইতে পারে না। কোথায় বিদেহ আর কোথায় আসাম উপত্যকা, বিদেহ হইতে আসাম উপত্যকা পায়চালি করিবার পথ নহে যে সেখান হইতে দুই এক দিন অন্তর আসাম উপত্যকায় যাতায়াত করিতে পারা যায়। অতঃপর স্বপক্ষ হইলেও সুহ্ম ও প্রসুহ্মদিগকে যুদ্ধে জয় করিয়া মাগধ-দিগের প্রতি ধাবমান হইলেন। (সুহ্ম প্রসুহ্ম হইতে মগধে ফিরিতে হইয়াছিল।) তথায় দণ্ড, দণ্ডধার ও অন্যান্য মহীপালদিগকে জয় করিয়া তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া গিরিব্রজে যাত্রা করিলেন। তথায় জরাসন্ধতনয়কে সান্ত্বনা দানে হস্তগত করিয়া তাঁহাদের

সঙ্গে মহারাজ কর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন (কর্ণ অঙ্গাধিপতি ভাগলপুরের নিকট তাঁহার রাজধানী ছিল।) কর্ণকে পরাভূত করিয়া ভীমসেন পার্ব্বত্য রাজগণকে (সম্ভবতঃ সাঁওতাল পরগণার রাজাদিগকে) বশীভূত করিয়া মোদাগিরিতে উপস্থিত হইলেন, তৎপরবর্ত্তী বিবরণ পূর্ব্বে সমূল অনুবাদে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর তখন অস্তিত্বহীন ছিল না, ঐ নামেই খ্যাত ছিল। সেই প্রাগ্‌জ্যোতিষের যখন কোন উল্লেখ নাই তখন তৎ সন্নিকটবর্ত্তী আসাম উপত্যকা বা আরাকান প্রদেশের কথা ত বহুদূরের। এই জন্যই যে ঢাকা, নোয়াখালী প্রভৃতিকে পাণ্ডব-বর্জ্জিত দেশ বলে তাহা অগ্রাহ্য করিবার বা উপেক্ষায় উড়াইয়া দিবার নহে।

দ্বিতীয় কথা—"যুধিষ্ঠির পঞ্চশত নদনদীপ্লাবিত সাগরসঙ্গমে স্নান করিয়া সমুদ্রের ধারে ধারে গিয়া বৈতরণীর পরপারবর্ত্তী কলিঙ্গদেশে পঁহুছিয়াছিলেন, কিন্তু সুহ্মদেশে যান নাই।" যাইবেন কেমন করিয়া—সুহ্মদেশের অবস্থিতির বিষয় চিন্তা করিলেই বুঝা যাইত যে সাগরসঙ্গম হইতে কলিঙ্গের পথে সুহ্মদেশ নহে। সুহ্ম সাগরসঙ্গমের উত্তর আর কলিঙ্গ পশ্চিমে, তখন উড়িষ্যা পৃথক্ ছিল না, কলিঙ্গ দেশের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। বলিরাজার পাঁচ পুত্র স্ব স্ব নাম প্রসিদ্ধ দেশে রাজত্ব করিতেন। পঞ্চ ভ্রাতার পাঁচটী রাজ্য পরস্পর সংলগ্ন থাকাই সম্ভব—আছেও তাই। অঙ্গ ভাগলপুর অঞ্চল তাহার পূর্ব্বে পুণ্ড্র বা মালদহ দিনাজপুরাদি, তাঁহার পূর্ব্বদিকে বঙ্গ—পাবনা বগুড়াদি অঞ্চল। পুণ্ড্রদেশের দক্ষিণে গঙ্গাপারে রাজমহল বীরভূম মুর্শিবাবাদের কিয়দংশ যাহা, গঙ্গার পশ্চিমে অবস্থিত, এবং সমগ্র বর্দ্ধমান হুগলী

হাওড়া লইয়া সুহ্মদেশ, তাহার সংলগ্ন দক্ষিণ পশ্চিমে কলিঙ্গ। মহাকবি কালিদাস রঘুর দিগ্বিজয় উপলক্ষে লিলিয়াছেন—

রঘু সুহ্মদেশাধিকারের পর গঙ্গাজলে জয়পতাকা প্রোথিত করিয়া এবং গজনির্ম্মিত সেতু দ্বারা কপিশা নদী উত্তীর্ণ হইয়া উৎকলদেশ দিয়া কলিঙ্গাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন।

ইহাতে এই বুঝিতে হয় যে সুহ্মদেশ হইতে কপিশানদী পার হইয়া উৎকল দেশের উপর দিয়া কলিঙ্গদেশে যাইবার পথ। এখনকার আবাল-বৃদ্ধে অবগত আছেন যে মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ হইতেই উড়িষ্যার আরম্ভ, বালেশ্বর, কটক ও পুরী উৎকল বা উড়িষ্যা। দেশ তাহার পরেইকলিঙ্গদেশের আরম্ভ। যদ্দি গারো পর্ব্বতই সুহ্মদেশে[illegible]স্থিতিস্থান হয় তাহা হইলে সেখানে কপিশনদীই কোথা, [illegible]র সেই কপিশা পারে উৎকল এবং উৎকলের পরে কলিঙ্গের অবস্থিতি কিরূপে সম্ভাবিতে পারে। আপন জেদ্ বজায় জন্য দমোলুক তমোলুক হইতে পারে না—কিন্তু বোঙ্গি বঙ্গ হইবার আপত্তি নাই। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ আধুনিক বলিয়া তাঁহার উক্তি উপেক্ষিত—ধোয়ী কবি সে তাম্রলিপ্তিকে সুহ্মদেশের রাজধানী বলিয়াছেন তাহাও নগন্য বলিতে যাঁহাদের সঙ্কোচ হয় না তাঁহারা অনায়াসেই বলিবেন—গারো পর্ব্বতের সমীপবর্ত্তী সুহ্মদেশ

ভীমের দিগ্বিজয়বার্ত্তার মধ্যে কোথায় আছে যে "ভীম গঙ্গার উত্তর পার দিয়া মিথিলা প্রভৃতি জয় করিতে করিতে

---

* কপিলার অপভ্রংশে কাঁসাই, ইহা মেদিনীপুর সহর স্পর্শ করিয়া প্রবাহিতা।

পূর্ব্বমুখে আসিয়াছিলেন। তিনি শর্ম্মক (শ্যাম) বর্ম্মক (ব্রহ্ম) জয় করিয়া সুহ্ম প্রসুহ্ম জয় করতঃ মগধে গিয়াছিলেন। সুতরাং গঙ্গার উত্তর পারে কোন স্থানে সুহ্ম ও প্রসুহ্মদেশ হইবে। *

তর্কস্থলে যদিই স্বীকার করা যায় যে শ্যাম বর্ম্মা অ্যাসাম উপত্যকায় সুহ্ম প্রসুহ্ম—কিন্তু সেখান হইতে একবারে মগধে যাওয়া কতটা সুগম—মধ্যে কত দেশ থাকিয়া যায় সেগুলির নামটী মাত্র নাই, বঙ্গ পুণ্ড্র কোথায় রহিল ? আর একটা কথা—সেখান হইতে মগধে যাইতে হইলে কি গঙ্গা পার হইতে হয় না ? আজিও দেখা যাইতেছে মগধ গঙ্গার দক্ষিণে। এরূপ কুতর্ক তুলিলে সত্যের অবধারণ হয় না। আমরা ইতিপূর্ব্বে ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে বহির্গত হইয়া ভীম যে দেশের পর যে দেশে গিয়াছিলেন সংক্ষেপে সমস্তই বলিয়াছি, একটী স্থানের নামও বাদ দি নাই। তিনি বিদেহ রাজ্যে অবস্থিতি করিয়াই সপ্ত কিরাতপতিকে জয় করিয়াছিলেন, সেখান হইতেই সুহ্মদেশে পাদার্পণ করেন।

অমরা প্রত্যেক কথাটী ধরিয়া বিরুদ্ধ মতাবলম্বীগণের মত খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইলে তাহাতেই একখানি পৃথক পুস্তক রচিত হইয়া যায়। তাঁহাদের যুক্তিতর্ক কতটা বলবৎ তাহা আমাদের প্রমাণ প্রয়োগের সহিত মিলাইয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। আমরা কোথাও টানিয়া-বুনিয়া স্বমতের পোষকতা করিবার চেষ্টা করি নাই। মহাভারতের কথার সহিত কুমারসম্ভবের দুই বিভিন্ন কথা জুড়িয়া স্বীয় মত সমর্থনের জন্য বাগ্‌জাল বিস্তার করি নাই। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে প্রায় সকল স্থানেরই নাম ও অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। আমার মতে এঙ্গি বেঙ্গি

অঙ্গ বঙ্গ অনায়াসেই হইতে পারে কিন্তু অঙ্গের বেলায় তমোলুক দমলুক কোন মতেই হইতে পারে না। বিবেকবুদ্ধি লইয়া কে এরূপ কথা বলিবে জানি না আমরা ধারাবাহিক আলোচনার পূর্ব্বে মাধাইনগরের তাম্রশাসন-পত্র খানি অগ্রে উদ্ধৃত করিব।

লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসনপত্র।

এই তাম্রশাসনপত্র খানি জেলা পাবনা মহকুমা সিরাজগঞ্জ ও ষ্টেসন রায়গঞ্জের অধীন মাধাইনগর গ্রামে রঘুনাথ সিংহ নামে একজন বুনা মৃত্তিকার নীচে প্রাপ্ত হয়। মাধাইনগর নিমগাছির জঙ্গলের অন্তর্গত স্থান। নিমগাছিতে বিরাটরাজার বাড়ী ছিল বলিয়া চির জনশ্রুতি আছে। আজও এই স্থানে অনেক প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই তাম্রালিপির শিরোভাগে যে বিষ্ণু, শিব ও দশভুজার মূর্ত্তি আছে, রঘুনাথের নিকট শুনিয়াছি যে, সে তাহার প্রত্যহ পূজা করিত। মামলা মোকদ্দমা উপলক্ষে রঘুনাথের সহিত আমার পরিচয় থাকাতে তাম্রলিপি প্রাপ্ত হওয়ার বৃত্তান্ত আমি তাহার নিকট অবগত হইয়া গত জ্যৈষ্ঠ মাসে তাম্রশাসন খানি তাহার নিকট হইতে লইয়াছি। এবং তাহার পাঠোদ্ধারের জন্য এই সিরাজগঞ্জের শ্রীযুত গোপীচন্দ্র সেন কবিরাজ মহাশয়কে উক্ত তাম্রশাসন প্রদান করি। তিনি বিশেষ পরিশ্রম করিয়া তাহার পাঠোদ্ধার করিয়াছেন এবং আমি ঐ সংস্কৃত পাঠ দৃষ্টে তাহার বঙ্গানুবাদ

ও ইংরাজি অনুবাদ করিয়াছি। এইক্ষণ প্রার্থনা, অনুবাদে কোন ভুল থাকিলে সকলেই অনুগ্রহপূর্ব্বক সে দোষ মার্জ্জনা করিবেন। নিবেদন ইতি ১৩০৩ সন তারিখ ২৩শে ভাদ্র।

এই তাম্রশাসনের প্রাপ্তিবৃত্তান্ত উপরোক্ত বিজ্ঞাপনে সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। সিরাজঞ্জের মুন্‌সেফী আদালতের উপরোক্ত উকিল শ্রীযুত দুর্গানাথ তালুকদার মহাশয় তাম্রশাসন খানি পাঠোদ্ধারার্থে বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসে আমাকে প্রদান করেন। আমি উহার পাঠোদ্ধার করতঃ তাহা মুদ্রিত করিয়া তৎসহ তাম্রশাসন খানি কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটিতে অর্পণ করিব এই সঙ্কল্প করিয়া পাঠোদ্ধার করিতে প্রবৃত্ত হই, কিন্তু নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকাতে ও তাম্রশাসন খানি দেবনাগর ও বাঙ্গালা অক্ষরের মধ্যবর্ত্তী এক প্রকার অক্ষরে লিখিত বিধায় পাঠোদ্ধার সমাপ্ত করিতে আমার বিলম্ব হয়। এই সময় পাবনার কালেক্টর মাননীয় শ্রীযুত মিঃ সি, এ, র‍্যাডিচ সাহেব বাহাদুর তাম্রশাসন খানি আমার নিকট হইতে লইয়াছিলেন কিন্তু আমি তাহার অধিকাংশ পাঠোদ্ধার করিয়াছি দেখিয়া পাঠোদ্ধার সমাপনার্থে কতিপয় দিনের জন্য উহা পুনরায় আমাকে অর্পণ করিয়াছেন। সম্প্রতি পাঠোদ্ধার সমাপ্ত হইয়াছে। এইক্ষণ উহা বাঙ্গালা ও ইংরাজিসহ পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়া উক্ত শ্রীযুত কালেক্টর বাহাদুরের নিকট প্রেরণ ও সর্ব্বসাধারণের গোচর করিবার অভিপ্রায়ে মুদ্রিত করিলাম।

পরিশেষে বিনয়ের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে,, তাম্রলিপি খানির শেষ ভাগের কতিপয় পংক্তির লেখা সহসা দেখিয়া বোধ হয় যে, এককালীন নষ্ট হইয়াছে। কিন্তু বিশেষ মনোযোগপূর্ব্বক

পাঠ করিলে উহার সকল অক্ষরই পড়া যায়। যাহা হউক, কোন স্থানে ভ্রম হইয়া থাকিলে, যিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা সংশোধন করিবেন, তাঁহার নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ হইব। নিবেদন ইতি সন ১৩০৫ তারিখ ২৩শে ভাদ্র।

বশম্বদ—

শ্রীগোপীচন্দ্র সেন কবিরাজ।

সিরাজগঞ্জ।

মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের প্রদত্ত

তাম্রশাসন।

(মাধাইনগরে প্রাপ্ত)

ওঁ নমো নারায়ণায়।

যস্মাঙ্কেঃ পরংঘঃস্থো ঘোরসিতয়িন্নেত্যেকশো ধীশ্রিয়া।
যশোঘন স্তীর দুগ্ধবহিঃ সমুদ্রং যস্মাতিথিঃ সংযযুঃ॥
আয়ুর্ব্বেদ্ দ্যুতিবোধন ত্রায়ন্তা সঘোর যুধানো মুরৈঃ
শ্রীধল্ল সেনৈকো ভূষণো নৃপস্ত যঃ পূজ্যস্ত পঞ্চাননঃ।
স্বঙ্গাঙ্গাঙ্গুল পুণ্ডরীক মম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ ধারা—
যজুযুদ্ধারস্ত সুহ্মধাম্নীস্বরোস্তিস্ম।
ক্ষিত্যলঙ্কারঃ সুহ্মমণিঃ ক্ষীরাম্ভোনিধি প্রীতি—
ঝমজৈমী ব্রৈষে কশৈঃ প্রংসী কাঙ্কীবুজন্মথো রাজা যঃ স্ম।
সুকর্ম্মজাল নিধি শুদ্ধধর্ম্মা নীতিপঃ স্বধনস্পূষঃ সন্ধতিস্মাক্রয়ৈ।

ক্রতুভির্ব্বরিষ্ঠঃ প্রদ্যুম্নাখ্যো রাজা যো অজনিষ্ম।
তদন্বয়েশ্বতি ধীরাখ্যো রিপুবশীকৃচ্ছ্রো যোনরেন্দ্রাখ্যঃ
সৌরীক্ষিভিঃ সম্প্রাপ্তিঃ ঘোষিত গুণরাশেবীরসেনস্য।
সঙ্গাবান্ সত্যসন্ধঃ ক্রিয়াণামুক্ত নিষ্কলঙ্কো যযাম সামন্তসেনঃ
—কৃত্বানির্ব্বীর মুর্ব্বীতলমধীনতরং স্থৈর্য্যবারা।
বিদ্ধলক্ষ্যানি শ্লিষ্টৈর্যেন সূর্য্যাস্তেষু রুধিরকণাকীর্ণধারঃ কৃপাণঃ
বীরাণামন্বেষৈস্তস্টৌ বিশ্বরম্রম্নানং।

উর্দ্ধং শল্যং ধ্বস্তং শল্যোনোর্দ্ধৈঃ সাম্যনীরোহসৌ যমসীমা-দ্ধেমন্তসেনো ভবথুর্ধীরো মাঘধবাসঃ স বসুমতী সেব্যঃ। ওষধীশ বশোবদ্ যস্মে বসুনেব মৌলিমৌক্তি ইন্দ্রৌমসি যন্ঘুষ্যতি, অজনি বিজয়সেনস্তে কস্য বীরোস্ত। যস্যাশু সমরে ঋবাণ শ্রেয়সা মেক শেষ। কৃতজ্ঞঃ সতিবিধিপোষণ বশস্যধবঃ ধ্রুবঃ সুকৃতি সুধীনাং। শিক্ষাশীল সন্ধ্যা ক্ষমা সত্যং ক্রত্রিম যে তপব্রতস্য প্রদ্যুম্ন সেনস্যাক্ষৌণিনাশা নিষ্ক্রিয়শস্য যশসঃ স্মরং। লক্ষ্যলব্ধ স্তীক্ষ্ণ-চাক্ষুষঃ স্তোকপ্রজ্ঞঘ্নঃ পুরংবঞ্চতি। ক্রিয়াবন্ধো যস্যাম্বর যশো ক্ষীরসঙ্গাব্ধি যোধীজ্ঞবিঘ্নঃ। ধর্ম্মকার্য্যাধীনো ইয্যতি যস্তীর্থাস্ব-স্তেষু ভূষণোহ সুরঘাতী বপুর্ব্বল্লালসেনোজজ্ঞে, হীনান্ধ ক্ষুব্ধ পামরস্য বন্ধুঃ। যশোবল নবজলাশয়ো নরেশ্বরাণামেকঃ স সলক্ষীরম্বুধিঃ। যজ্ঞবৃত্তৌ সুরাসুর বিষ্ণুঃ যুদ্ধসিদ্ধি রুচধর্ম্মা। ত্রৈলোক্যসুখায় কুলোজ্জ্বলে ঘোরস্তস্য প্রয়াসঃ, ক্ষুব্ধ শান্ত সুশীল ক্ষমা দক্ষ যুধিক্ষম যুদ্ধ বিধি বিষর্ষণৈঃ। ভূপস্য প্রকৃষৈ র্ব্বিক্ষচমূঃ যেপ্যন্তর-স্থানি, বশীমল্ল কাপালিকমূর্ত্তিঃ যুদ্ধবিবক্ষা ক্ষমাবল ক্ষত্র প্রবুদ্ধৈঃ। ব্রহ্মণ্যবৃ্ট্টি কর্ম্মনিষ্ঠঃ স সুশীলঃ বিদ্বান্ বলক্ষ লক্ষ সৈন্যাধ্যক্ষ, যমাধিক কুঞ্জরসমঃ মত্ত ক্ষত্রঃ প্রাজ্ঞো

যুদ্ধধর্ম্মেষু। বিশ্বাদ্গৌড়েশ্বরঃ শ্রীক্রমপুরং প্রকর্ম্মা, যস্যাসীমচক্রে নিষ্কর লোকো রাজা সর্ব্বে প্রীতির্ব্বিশস্বন্ধঃ ক্ষণৈ ধনৈঃ। দূরং যস্য সুলক্ষ্যং যেনাসৌ কাশীরাজ্ঞঃ সমরেষপি লিপ্সা রাজ্যবিধিক্ষর ধ্বংসো ভীমসংগ্রাম সন্ধান স্তীক্ষ্ণৈস্ত। ভূশূরঃ প্রজ্ঞঃ কজ্ঞঃ প্রাণৈঃসমৈধর্ম্মৈঃ প্রাণিণাংস্বকৈর্ম্মৈর্ধর্ম্মং রক্ষতি, প্রাজ্ঞসনে বিক্রমপুরে বসন্ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে। ঐশ্বর্য্যং যস্যাসি সম্পত্তির্ব্বধো নৃজুষ্ঠো ঋদ্ধিধর্ম্মো ক্ষুধাক্রবঃ, শশ্বংস্তকুত্রিমূর্ত্তি শ্চরিষ্ণুর্ধর্ম্মো বিধিঃ প্রজাপতিঃ। গুণ সিন্ধুক্রিয়া শার্দ্দূল স্ত্রিসন্ধ্যারাধাম ব্রহ্মকবচং বিজ্ঞ ধীর—সুব্রাহ্মণ সুশিষ্য বৃন্দৈ ক্ষত্রবলাভিষিক্তঃ। বন্ধুর্ব্রহ্ম বৈরীঞ্চ ঘস্রঃ যো ব্রাহ্মণাঞ্চ সুরি নিয়ন্তা, মহোপম নবধা কূল সম্বন্ধি বিষয়াচার বিনয়কাদি ধর্ম্মঃ। লক্ষ্য সুখী লক্ষান্তরে লক্ষ্যং স্থাপ্য মবধি, সধর্ম্ম সুলক্ষ্যৈর্ব তীক্ষ্ণ চক্ষুষা লক্ষণোষধীজ্ঞো লক্ষ্যজ্ঞশ্চ ক্ষজ্ঞঃ। উর্ব্বীশঃ সুশাসকঃ সূক্ষ্মবীঃ সুশিক্ষঃ সুবিজ্ঞঃ সুযশস্বী ধর্ম্মবশে। ব্রহ্মকর্ম্মস্বী ক্ষমালক্ষ্মী যুক্তো অশেষ প্রজ্ঞঃ। পরম সুধীর ত্রিসন্ধ্যাং ব্রহ্মকবচং ব্রহ্মগায়ত্রী মুপাসতে ব্রহ্মধৃতিঃ সুধন্যো অশেষ সুধী ব্রাহ্মণানাঞ্চ সঙ্গঃ। ঔষধ ধী স্বামী স্বধর্ম্ম পুষ্টকশ্চক্ষুঃ লক্ষাণী কূর্য্যাদ্ধর্ম্মমূলং, ব্রহ্মণ্য কুলঞ্চ বল্লালস্য সুতো লক্ষ্মণ ধীরঃ। ব্রহ্মণ্যষট্ কর্ম্মবৃত্তিঃ সুখ্যাতি ঘনদ্যুতিঃ ক্ষমাবৃত্তিঃ ক্ষধর্ম্ম ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম প্রযুক্তঃ সকল কল্যাণ হেতুঃ। শুদ্ধ সন্ধঃ বীরব্রতঃ রক্ষিসৈন্যস্য রক্ষাকর্ম্ম বিধি নিযুক্ত ক্ষমঃ, রক্ষজ্ঞঃ স্বীয় কর্ম্মজ্ঞতা সুকাম যশঃ সম্বন্ধঃ। শুদ্ধনীতিজ্ঞঃ বসুব্রহ্মজ্ঞঃ ধর্ম্মসুখী কর্ম্মসুখী সর্ব্ব কর্ম্মেষু সুবিজ্ঞঃ, ররিষ্ঠ ক্ষসাধুঃ কেল্লি-বিকলী কৃতকর্ম্মা। নির্লিপ্তধীঃ ব্রাহ্মধর্ম্মেষু তদ্ধর্ম্মৈকঃ সম্বন্ধঃ ধর্ম্মব্রহ্ম বিবিজ্ঞঃ, ব্রহ্মমণ্ডলৈকশ্চক্রবর্ত্তী গৌড়েশ্বরো যশঃ সিন্ধুঃ।

লক্ষ্মীশো বসুনাথো বিষয়সত্তমো ভূশূরো রঘু শ্রীলক্ষ্মণো থিরাজ, শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেনঃ সেনয়া যো বিজয়ী লক্ষ সমুদ্রঃ। রসজ্ঞ ক্ষুধা ধরাসুরামঃ বিশালাক্ষো বাণ সংসক্ত শ্মশ্রুঃ, বিজ্ঞমুখ্যঃ স সুধীবরোসি ব্রাহ্মণ ধর্ম্মাধ্যক্ষঃ সত্যসন্ধঃ প্রবিশ্য বিক্রমপুরং সেনাসম্ভির্যদনৈর্ব্বাধিকৃতং স্বপুরং, লক্ষ্মণ ধন্যো বিক্রম সিন্ধুর্যজুষি কাম যজ্ঞেষ্বতীব প্রবৃত্তঃ। ধর্ম্মজ্ঞস্য ঋক্‌কর্ম্মশাসী বসতি মৎস্য বনেষু, দোঃসাধিক দোষেষু অরণ্যৈক মোষকো বসোমধ্যো ধার্ষ্টঃ। তং বিশ্ববংসে ক্ষাত্বষ্টকো যৌদ্ধিকো যন্ত্রশংসো নৈকষ গুণীয়কো, বিষয় প্রবাসী দক্ষাশ্চ সকল রাজন্য সেনা নিযুক্তাঃ ক্ষব্রাহ্মণয়ো ক্ষপ্রবীরোক্তানি শ্যাসিতৈঃক্ষমবপুঃ, সুযজ্ঞ ন্যাস লক্ষণ জপান্ ক্ষিপ্রকরান্ ব্রাহ্মণঃ সুবিজ্ঞঃ। ব্রাহ্মণেষ্টবান্ জপাৎপ্রমাদপ্লস্তি সমাধিয়ন্তে, ব্রহ্মতম স্বভাবৈঃ ক্ষমন্তি জপাশিষ্যৈ গুরুশ্চ বপুজ্ঞঃ। তং ব্রহ্মশান্তি বরৈরাক্রান্তং যুদ্ধবৃতৈ রাবদ্ধ-বধেষিক্ষ্যামঃ পূর্ব্বে বপুশাসা যাপকাঃ সীম ভূঃ সীমান্তাঃ। চন্দ্রকোণঃ বিরাট * নগরো উত্তর ভূঃ সীমা, পশ্চিমে সপ্তক্ষীরা যাসুকঃ, পূর্ব্ব ভূঃ সীমা। উত্তরৈঃ সর্ব্বত্তারাসো অগ্রসরো দক্ষিণ ভূঃ সীমা। উক্ত চতুঃসীমা বচ্ছিন্নঃ কাননাশেষবিধ সুরাজ্যং শ্রীমাধব ব্রাহ্মণ পাল্যভূরস্ত। সবৃক্ষ ফলবতী ঋত্বিগার্থিকাভূঃ ঋত্বিগ্‌গতৈঃ কর্ম্মৈঃ কৃত সর্ব্বস্য বনকর ঋত্বিক্যর্ষৈঃ স্বস্তীশ্বরাণাম্বিক্‌কর্ম্ম সুসম্পাদনার্থং। ঘুড়াকা পাষাণিয়া যাসুক ভূষা উদিষয চঙ্গধুপিল ভূশ্বরক্ষ্মষব সাধু বাকলা বেতিল ভূশয়ক্ষণ ধৈর্য্যশীলঃ কর্ম্মশীলো বিজ্ঞো ধর্ম্মক্ষমাদ্যৈ স্বষ্টঃ

* তাম্রশাসনে বিরাট স্পষ্টপাঠ আছে।

তত্ত্বংযুঃ, প্রাজ্ঞোবিশুদ্ধ ক্ষিতিজ্ঞঃ সুশ্রাদ্ধ তর্পণ শ্রুতিজ্ঞো-বিষয়-ধ্বান্ত ক্ষয়জ্ঞঃ বিষয়েষু বিজ্ঞো মুখ্যো র্যপযজ্ঞে যুক্ত ঋক্ষে রথ্যাস্বসিদ্ধায় শ্রীসর্ব্বেশ্বর দেব শর্ম্মণঃ পুত্রায় কৌশিকায় কৌথুমশাখায়ৈ বিশ্বামিত্রাপ্লুবদ্ যমদগ্নিপ্রবরায় ধর্ম্মবল যশৌদার্য্য শীলায় উপাধ্যায়িনে পাল্য ঋত্বিকে শ্রীমন্মাধব দেবশর্ম্মণে স্বস্তি ধর্ম্ম নির্ব্বন্ধৈর্ব্বর্ষ শক পূর্ব্বকং ভূর্দ্দদানা রবি মন্দরসসংজ্ঞকে শকাব্দামিতে। ধৈর্য্যশীলো ব্রাহ্মণশ্চ পুণ্যবান্ সদ্ভির্ব্বিবদ্ধার্ণবঃ পৃথিবীশ্বরাম্বষ্ঠসঙ্গো ক্ষবপর্ব্বলাভিষেকশ্চ। কর্ম্মলব্ধা শুদ্ধাবৈদ্যা মহাপ্রাজ্ঞা ক্ষত্র ব্রহ্মবুধৈ র্ধীর কবি জয়দেব ধোয়িকাদি বীর ব্রহ্মক্ষত্রিয়ৈঃ প্রসিদ্ধঃ। ত্রৈলোক্যবশী ব্রহ্মমিব ব্রহ্মক্ষত্রিয়াণাঞ্চ হিংস্রং হিংসাং কুর্য্যাৎ বৈধ হিংসাদিভিঃ যজ্ঞৈঃ প্রজাণাং মঙ্গলঞ্চ। করোতি আবিষ্ক্রিয়াং ধনংমহি বিজয় পুরীঞ্চ বিকরণ, লক্ষ্মণাবতী যশোরেখাং। ধর্ম্ম গৌরব বর্দ্ধনকারী দ্বিজ ব্রাহ্মণানাং বিশ্বভুবনে লক্ষ্মণসেন রিহার্জ্জুনো অর্জ্জুনস্য সমঃশস্ত্রেষু শিক্ষা শীঘ্র কর্ম্মা মেঘ সমঃ, পীযুষ সমংবাক্যং, বিক্রম দক্ষঃ। ক্ষীরাব্ধিকুল জয়কারী সুহ্মমণিঃ সুবঙ্গাধীপো বীর বিশেষো বীর তেজস্বী সুন্দরঃ সুবুদ্ধি লক্ষ্মণ সেনকো দেবশর্ম্মা সুব্রাহ্মণকং শ্রীকৃষ্ণং সুস্মৃত্য পূজার্চ্চিস্তে সবিতুঃ পূজন পূর্ব্বকং বিস্মৃত্য স্বস্তি শ্রীবিষ্ণুং ওঁ হ্রীং ব্রহ্মণে নমঃ। বিষ্ণু বিষ্ণু বিশ্বমূর্ত্তি ত্রিমূর্ত্তি উপবিতনঃ সহস্র শীর্ষঃ পুরুষঃ সহস্রাক্ষো সহস্রপাৎ খ ভূমি সন্নিধিং শাস্তিঃ সাক্ষী শাস্তা। সুকর্ম্মা ব্রহ্মশক্তি বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণো বৈশ্ববর্ণো বৈদ্যবৃত্ত্যা ক্ষত্রিয় ব্রহ্মবৃত্তি ধর্ম্ম সাক্ষী ব্রহ্মেশ্বরঃ স্বমিত্র ব্রহ্মবিদাং আশ্রয়ঃ স্বধর্ম্ম ক্ষত্রিয় ধর্ম্মজ্ঞো ব্রাহ্মণৈর্ব্রাহ্ম সন্ন্যাসি ধর্ম্মৌষধৈ ত্রৈলোক্য লক্ষ্মীযুক্তঃ ধর্ম্মরাজ রাম রাঘব তুল্যো অশেষ বিজয় লক্ষ্মী

ব্রাহ্মণানাং কুলীন বন্ধু নিবাসঃ স্বধর্ম্মদেব বিপ্রাণাঞ্চ লক্ষ্মণো ব্রাহ্মণঃ ॥

পাঠোদ্ধারক

শ্রীগোপীচন্দ্র সেন গুপ্ত কবিরাজ।

সিরাজগঞ্জ, পাবনা।

বঙ্গানুবাদ।

সুহ্ম নামক দেশে, অম্বষ্ঠ নামক ব্রাহ্মণ বংশে শ্রীধল্ল সেন নামে, নৃপতিগণের ভূষণস্বরূপ, পঞ্চানন সদৃশ পূজ্য এক রাজা ছিলেন। যাঁহার শরীর ও অঙ্গুলি সকল সুন্দর, শ্বেতপদ্মের বর্ণবিশিষ্ট ছিল। যাঁহার গভীর ধ্বনি সমুদ্রের অপর পারে এবং যাঁহার সুযশঃ অতিথিরূপে দুগ্ধসমুদ্রের অপর তীরে উপনীত হইত। যিনি নানা রত্নে বিভূষিত, মহা মহা ক্ষত্রিয় যোদ্ধৃগণে বেষ্টিত ও আয়ুর্ব্বেদবেত্তাগণের একান্ত সহায় ছিলেন। এবং যিনি যজুর্ব্বেদকে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

তাঁহার বংশে নরপতি মন্মথ সেনের জন্ম হয়। তিনি পৃথিবীর অলঙ্কার ও সুহ্ম দেশের মণিস্বরূপ ছিলেন। মন্মথ সেন মত্তবৃষের ন্যায় একাকী ঝম্ ঝম্ শব্দে প্রীতির সহিত ক্ষীর সমুদ্রে পতিত হইতেন এবং তিনি একান্ত সৎকার্য্যাভিলাষী রাজা ছিলেন। মন্মথ সেনের বংশে প্রদ্যুম্ন সেন জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি সৎকার্য্যের সমুদ্র, বিশুদ্ধধর্ম্মা ও একান্ত নীতিপরায়ণ রাজা ছিলেন। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সহিষ্ণু, ক্ষমা ও

ক্রিয়াশীল রাজা প্রদ্যুম্ন সেন, স্বীয় সম্পত্তির পুষ্টি সাধন ও যজ্ঞাদি সৎকর্ম্মের দ্বারা নিতান্ত শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

প্রদ্যুম্ন সেনের পুত্র নৃপতিশ্রেষ্ঠ বীর সেন, অশেষ গুণের আধার ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতগণের সহিত বাস করিতেন। তাঁহার গুণরাশি পৃথিবীর সর্ব্বত্র ঘোষিত হইয়াছিল। তিনি একান্ত শত্রুহন্তা ছিলেন। বীর সেনের অপর নাম ধৃতি ও ধীর সেন। তাহার পুত্র সামন্ত সেন, তিনি নিতান্ত জ্ঞানবান্ সত্যপ্রতিজ্ঞ, সৎক্রিয়াশীল ও কলঙ্কবিহীন রাজা ছিলেন। সামন্ত সেন পৃথিবীকে বীরশূন্য করত শান্তিরূপ জলের দ্বারা ধৌত করিয়া স্বীয় অধীনস্থ করিয়াছিলেন। তিনি সূর্য্যাস্তের পরেও অনায়াসে লক্ষ্য বিদ্ধ (শিকার) করিতেন। তিনি রাত্রিতে রুধিরকণাকীর্ণধারবিশিষ্ট তরবারি গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে সূর্য্য ও চন্দ্রের ন্যায় শোভা ধারণ করত বীরগণের অন্বেষণ করিতেন। সামন্ত সেনের পুত্র হেমন্ত সেন শত্রুগণের ঊর্দ্ধ-বিক্ষিপ্ত শল্যাস্ত্র দ্বারা বিনষ্ট করত আপনাকে এবং সেনাগণকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিতেন। হেমন্ত সেন মগধে বাস করিয়া বসুমতী ভোগ করিয়াছিলেন।

হেমন্ত সেনের ঔরসে নরপতি বিজয় সেন জন্ম গ্রহণ করেন। বিজয় সেনের তুল্য বীর পৃথিবীতে কেহই ছিলেন না। বিজয় সেন চন্দ্রের ন্যায় যশোবান্ ছিলেন। তাঁহার মস্তকে মণি চন্দ্রের কলঙ্কের ন্যায় শোভা পাইত। সংগ্রাম সমুদ্রে তিনি ভীষণধ্বনি, বৃহস্পতিতুল্য বুদ্ধি, ইন্দ্র তুল্য অস্ত্র শিক্ষা ইত্যাদি অশেষ প্রকার শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় প্রদান এবং সৎলোকের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেন। বিজয় সেন বিধি-পোষণ-বশদিগের ঈশ্বর। সুকৃতি

ও সুধীগণের সত্যস্বরূপ ছিলেন। শিক্ষা, সন্ধ্যা ও ক্ষমাশীল বিজয় সেন সর্ব্বদা সত্য কথা বলিতেন ও তদীয় পূর্ব্ব পুরুষ নিতান্ত ক্রিয়াশীল রাজা প্রদ্যুম্ন সেনের অক্ষৌণীনাম যশঃসমুদয়কে সর্ব্বদা স্মরণ করিতেন।

বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল সেন। যিনি লব্ধলক্ষ্য, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বিশিষ্ট ও সকলের জ্ঞানদাতা ছিলেন। বল্লাল সেন স্বীয় রাজধানীতে থাকিয়া সর্ব্বদা যজ্ঞাদি সৎকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। তাঁহার অম্বরতুল্য বীরত্ব যশঃ ক্ষীরসমুদ্র তীরবর্ত্তী যোদ্ধৃগণেরও বীরত্বে বিঘ্ন উৎপাদন করিত। ধর্ম্মকার্য্যের অধীন তীর্থ-বিশ্বাসিব্যক্তিগণের তিনি ভূষণতুল্য ছিলেন। নরপতি বল্লালের শরীর অসুর বিনাশের একান্ত উপযুক্ত ছিল। তিনি নীচ জাতি, ক্ষুব্ধ পাপিগণের বন্ধু ছিলেন। তাঁহার যশঃ ও বল নূতন।

তিনি যজ্ঞ বৃত্তিতে সুরাসুর বিষ্ণুতুল্য ও উচ্চধর্ম্মা ছিলেন এবং যুদ্ধে নিশ্চয় জয়লাভ করিতেন। শুচি, শান্ত, সুশীল, ক্ষমা, দক্ষতা, যুদ্ধক্ষমতা, যুদ্ধবিধি প্রভৃতি সদ্‌গুণের বিঘর্ষণের দ্বারা তিনি সর্ব্বদা পৃথিবীর হিত ও উজ্জ্বল কুল সাধনে একান্ত যত্নবান্ ছিলেন। তাঁহার ক্রোধ নিতান্ত যুদ্ধ প্রবৃত্তির দ্বারা দুরস্থ শত্রু সৈন্যগণও তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিত এবং যজ্ঞাদি ক্ষমাবল ও ক্ষত্রিয়োচিত বিচক্ষণতা হইতে কাপালিক মূর্ত্তি মল্ল (এক প্রকার-শৈব ধর্ম্মাবলম্বীয় শ্রেণীবিশেষ) গণও তাঁহার একান্ত অনুগত ছিল। রাজা বল্লাল সেন নিতান্ত সুশীল ও ব্রহ্মণ্যষট্‌কর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন। "তাঁহার লক্ষ বিদ্বান্ মত্ত কুঞ্জর সম যম তুল্য যুদ্ধধর্ম্মে প্রাজ্ঞ ক্ষত্রিয় সৈন্যাধ্যক্ষ ছিল। গৌড়েশ্বর

বল্লাল, স্বীয় রাজত্বের শ্রীবৃদ্ধিসাধন, সুবিধানস্থাপন ও সুন্দর ভবনাদি নির্ম্মাণ বিষয়ে পৃথিবীর অন্যান্য রাজাদিগের হইতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার অসীম চক্রে কলঙ্কবিহীন নৃপতিগণও ক্ষণকালের মধ্যে প্রীতির সহিত করপ্রদানপূর্ব্বক তাঁহার বশ্যতা-স্বীকার করিতেন। তাঁহার লক্ষ্য দূরবর্ত্তী স্থান পর্য্যন্ত গমন করিত। তিনি ভীম সংগ্রাম ও তীক্ষ্ণ অনুসন্ধান দ্বারা কাশী-রাজের সমরসাধ এবং রাজ্য শাসনাদি ক্ষমতার ধ্বংস করিয়া-ছিলেন। তিনি পৃথিবীর মধ্যে বীর জ্ঞানবান, ব্রহ্মজ্ঞ ছিলেন। বিক্রমপুরে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণের সঙ্গে ক্ষত্রিয় ধর্ম্মে অবস্থিতি করিয়া তিনি স্বীয় মন্ত্র, ধর্ম্ম দ্বারা প্রাণতুল্য জ্ঞানে প্রাণিগণকে ধর্ম্মে রক্ষা করিতেন। তিনি এক মাত্র অসিকেই তাঁহার ঐশ্বর্য্য, দুর্ব্বৃত্তদিগকে বধ করাকেই সম্পত্তি, ধর্ম্মতে উন্নতি সত্যকে ক্ষুধা মনে করিতেন। তাঁহায় শঙ্খদেশ (কপাল) বহ্মা বিষ্ণু ও শিবের মূর্ত্তিবিশিষ্ট ছিল। তিনি ধর্ম্মে সূর্য্য ও বিধিতে প্রজাপতি তুল্য ছিলেন। গুণসাগির ক্রিয়াশীল বল্লাল সেন বিজ্ঞ, ধীর, সুব্রাহ্মণ সুশিষ্যগণের সহিত মিলিত ও ক্ষত্রিয়বলাভিষিক্ত হইয়া ত্রিসন্ধ্যা ব্রহ্ম কবচ আরাধনা করিতেন। তিনি বন্ধু ও ব্রাহ্মণ-গণের শত্রুদিগকে সর্ব্বদা বধ করিতেন। তিনি ব্রাহ্মণগণের মধ্যে শ্রেণীর ও মহোপম আচার, বিনয়, প্রতিষ্ঠা, তীর্থ দর্শন নিষ্ঠা, শান্তি, তপঃ এবং দান প্রভৃতি নবগুণসম্পন্ন কুলাচারের আদি নিয়ন্তা।

বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেনও লক্ষ্যকার্য্যে নিতান্ত সুখী হন। বিদ্ধ করিবার উপযুক্ত জন্তু বহু দূরে থাকিতেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দ্বারা তাহাকে বধ করেন। তিনি বীর এবং ঔষধিজ্ঞ

(চিকিৎসক)। তিনি সহজেই লক্ষ্য কার্য্য ও ক্ষত্রিয়দিগের সমুদয় কার্য্য বুঝিতে সক্ষম। রাজা লক্ষণ সেন সুশাসক, সুক্ষ্মধী, সুশীল, বিজ্ঞ, সুযশস্বী ও ধর্ম্মের নিতান্ত অধীন; ব্রহ্ম ধর্ম্মোন্নতি ক্ষমা ও লক্ষ্মীযুক্ত এবং অশেষ প্রজ্ঞাবান্। তিনি পরম সুধীর, ত্রিসন্ধ্যা ব্রহ্মকবচ, ব্রহ্মগায়ত্রী আরাধনা করেন। ব্রহ্ম ধৃতি সম্পন্ন অতিশয় ধার্ম্মিক অসংখ্য সুধী ব্রাহ্মণ সর্ব্বদাই তাঁহার সঙ্গে অবস্থিতি করেন। স্বধর্ম্মপুষ্টক বৈদ্যগণের চক্ষুস্বরূপ। তিনি সর্ব্বদা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের মূল যে কুল, বিশেষ মনোযোগের সহিত তাহারই উৎকর্ষসাধন করিতেন। তাঁহার সুখ্যাতি ঘনদ্যুতিবিশিষ্ট একমাত্র ক্ষমাই তাঁহার বৃত্তি। তিনি ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণধর্ম্ম প্রযুক্ত এবং সকল প্রকার মঙ্গলের হেতু স্বরূপ। রাজা লক্ষ্মণ সেন শুদ্ধপ্রতিজ্ঞ, একমাত্র বীরত্বই তাঁহার ব্রত। রক্ষক সৈন্যদিগের রক্ষা কার্য্যের সুব্যস্থা করিতে তিনি বিলক্ষণ পটু এবং কি প্রকারে রাজ্য রক্ষা করিতে হয়, তাহাতেও তাঁহার বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা আছে। তাঁহার নিজের কার্য্যের প্রতি তাঁহার বিশেষ মনোযোগ দেখিতে পাওয়া যায়। সুনাম ও যশের সহিত তাঁহার নিতান্ত ঘনিষ্ঠতা। তিনি বিশুদ্ধ নীতিজ্ঞ বসু (১) ও ব্রহ্মজ্ঞ। ধর্ম্ম কার্য্যাদিতে তিনি বিলক্ষণ সুখী হন। লক্ষ্মণ সেন সকল কার্য্যেই সুবিজ্ঞ। তিনি ক্ষত্রিয় নৃপতিগণের হইতে শ্রেষ্ঠ সাধু, কেলিবিহ্বল ও কৃতকর্ম্মা। তিনি নির্লিপ্ত বুদ্ধি, এক মাত্র ব্রাহ্মণধর্ম্মের সহিতই তাঁহার বিশেষ সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি ধর্ম্ম ব্রহ্ম প্রভৃতি সমুদয়

(১) ধব, ধ্রুব, সোম; বিষ্ণু, অনিল, প্রত্যুষ ও প্রভাত ইহাদিগকে বসু বলে।

বিদিত। গৌড়েশ্বর যশঃসিন্ধু লক্ষণ সেন ব্রাহ্মণমণ্ডলীর একমাত্র। চক্রবর্ত্তিস্বরূপ। মহাবীর ব্রাহ্মণ রঘুবংশীয় ব্রহ্মণের ন্যায় সম্প্রতি ভূতলে বিরাজমান। তিনি রসজ্ঞদিগের ক্ষুধাস্বরূপ, পৃথিবীতে রামচন্দ্র তুল্য। তাঁহার চক্ষু বিশাল এবং শ্মশ্রু (দাড়ি গোঁপ) সকল বাণ সংযুক্ত অর্থাৎ তীরের ন্যায়। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও সুধী শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের অধ্যক্ষ, সত্যপ্রতিজ্ঞ। সম্প্রতি তিনি বিক্রমপুরে গমন করত, মত্ত পরাক্রমশালী সৈন্যগণের দ্বারা স্বীয় পিতৃরাজধানীকে অধিকার করিয়া মহাসমারোহের সহিত যজুর্ব্বেদোক্ত যজ্ঞাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

ধর্ম্মজ্ঞ নৃপতি লক্ষ্মণ সেনের পুরোহিতের নিবাস মৎস্যবনে। দ্বারপালগণের দোষে সেই বনের এক জন তস্কর পৃথিবীর মধ্যে অতিশয় দুর্ব্বৃত্ত হইয়া উঠে। তাহাকে বিনাশ করিবার জন্য নৃশংস রাবণগুণসম্পন্ন, বিষয় প্রয়াসী, দক্ষ, সুযোদ্ধা ক্ষত্রিয় ও অম্বষ্ঠ সৈন্যগণ নিযুক্ত হয়। ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণের মধ্যে ক্ষত্রিয়ই বীরশ্রেষ্ঠ, পৃথিবী শাসনের উপযুক্ত শরীরবিশিষ্ট। জপ যজ্ঞ, ন্যাস লক্ষণাদিতে ব্রাহ্মণ শীঘ্রহস্ত ও সুবিজ্ঞ। ইষ্টবান ব্রাহ্মণেরা জপশ্রম দ্বারা দুর্ব্বৃত্তদিগকে হত, ধৃত ও আবদ্ধ করিয়া থাকেন এবং ব্রহ্মজ্ঞান স্বভাব দ্বারা দয়া বশতঃ কোন কোন সময়ে দুর্ব্বৃত্তগণকে ক্ষমা করেন। বপুজ্ঞ ব্রাহ্মণ জপ ও আশীর্ব্বাদ দ্বারা সকলেরই গুরু। সেই চৌব রাজ পুরোহিতের জপশ্রম দ্বারা প্রথমে আক্রান্ত হইয়া তৎপরে যুদ্ধে আবদ্ধ ও হত হয়, ইহা যুদ্ধস্থানের পশ্চিমসীমান্তবাসী সমুদয় যোদ্ধা ও জাপক; গণ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

অতএব চন্দ্রকোণ বিরাটনগর যাহার উত্তর সীমা, যে

ভূভাগের পশ্চিমে সপ্তক্ষীরা, বাম্বুক, চন্দ্রকোণ ও বিরাট নগরই যাহার পূর্ব্ব সীমা তারাস, অগ্রসর যে ভূমির দক্ষিণ সীমা, এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন কানন, অশেষবিধ সজল স্থল ভূমি শ্রীমাধব (২) ব্রাহ্মণের পাল্যভূমি হইল। মহারাজের ঋক্‌কর্ম্ম অর্থাৎ পৌরোহিত্য কার্য্য সম্পাদানার্থ সকল প্রকার পৌরহিত্য কার্য্যের দক্ষিণাস্বরূপ ঋত্বিক ঋষির সম্বন্ধে ঋত্বিগার্থিক ভূমি বলিয়া স্বীকৃত হইল। বুড়াকা পাষাণিকা, ষাম্বুক, ভূষা, উদিযুষ, চাঙ্গধূপিল, ভূশ্বর, ক্ষযব, সাধুবাকলা, বেতিল ও ভূশয় প্রভৃতি গ্রাম, ধৈর্য্যশীল কর্ম্মশীল, বিজ্ঞ, ধর্ম্ম ও ক্ষমাদিতে তুষ্ট, কুশলী, প্রাজ্ঞ, বিশুদ্ধ, ক্ষিতিজ্ঞ, সুশ্রাদ্ধতর্পণ ও শ্রুতিজ্ঞ বিষয়-মোহান্ধকারের ক্ষয়কারক, বিষয় কার্য্যে বিজ্ঞ, প্রধান, জপ যজ্ঞাদি যুক্ত, অধ্যাত্মসিদ্ধ শ্রীসর্ব্বেশ্বর দেব শর্ম্মার পুত্র, কৌশিক-গোত্র, কৌথুম শাখানুধ্যায়ী, বিশ্বামিত্র আপ্লুবৎ ও যমদগ্নি প্রবর শ্রীমান্ মাধব দেব শর্ম্মাকে ধর্ম্ম নির্ব্বন্ধ দ্বারা বর্য শক ও স্বস্তি (অর্থাৎ স্বীকৃত বাক্য) উচ্চারণপূর্ব্বক প্রদত্ত হইল।

ধৈর্য্যশীল, পুণ্যবান্ সৎলোকের দ্বারা বিবর্দ্ধিত অর্ণব সদৃশ, অম্বষ্ঠসংজ্ঞক ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের অভিষেক ও ক্ষত্রিয়ের ন্যায় শরীর, বলাদিযুক্ত, কর্ম্মলব্ধ, মহাপ্রাজ্ঞ বৈদ্যগণের ও ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণগণের এবং ধীর কবি জয়দেব ধোয়িকাদি বীর ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়গণের বিখ্যাত ব্রহ্মের তুল্য ত্রৈলোক্য-বিমুগ্ধকারণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য প্রভৃতির হিংসকের প্রতিহিংসক, যজ্ঞাদি দ্বারা প্রজাগণের মঙ্গলকারক, যশের রেখাস্বরূপ লক্ষণাবতী নাম্নী নগরীর নির্ম্মাতা ও তাহাতে নানাবিধ ধনরত্নের আবিষ্কারকর্ত্তা; ধর্ম্ম, দ্বিজ, ব্রাহ্মণ প্রভৃতির গৌরববর্দ্ধন-কারী, পৃথিবীতে অর্জ্জুনতুল্য,

অর্জ্জুনের ন্যায় যোদ্ধা, মেঘের ন্যায় শীঘ্রকর্ম্মা, অমৃতভাষী, বিক্রমদক্ষ ক্ষীরসমুদ্রতীরবিজয়ী, সুক্ষ্মদেশের মণি, সুবঙ্গের অধিপতি, বীরতেজবিশিষ্ট, বীরশ্রেষ্ঠ, সুন্দর, সুবুদ্ধিযুক্ত, শ্রীলক্ষ্মণ সেন দেবশর্ম্মা সুব্রাহ্মণ, শ্রীকৃষ্ণ ও স্বস্তি স্মরণ করতঃ, সূর্য্যদেবের পূজাপূর্ব্বক বিষ্ণুকে পূজা করিলেন ওঁ হ্রীঁ ব্রহ্মাকে নমস্কার। উপরিতন অর্থাৎ এই তাম্রশাসনের শীর্ষস্থ বিশ্বমূর্ত্তি ত্রিমূর্ত্তি বিষ্ণু যিনি সহস্র মস্তক, সহস্রচক্ষু, সহস্রবাহু, সহস্রপদবিশিষ্ট, যিনি আকাশ, পৃথিবী প্রভৃতি সর্ব্বত্র শান্তি, সাক্ষী ও শাস্তারূপে বিরাজমান রহিয়াছেন, তিনিই এই দান সম্বন্ধে শান্তি সাক্ষী ও শাস্তাস্বরূপ।

সুকর্ম্মা, ব্রহ্মশক্তিযুক্ত, বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ, বৈশ্যবৃত্তি দ্বারা বৈশ্যবর্ণ, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণের বৃত্তি ও ধর্ম্মের সাক্ষী, ব্রহ্মদেশের ঈশ্বর, স্বমিত্র ও ব্রহ্মবিদ্গণের আশ্রয়, স্বধর্ম্ম ও ক্ষত্রিয় ধর্ম্মজ্ঞ, ব্রহ্মসন্ন্যাস ধর্ম্ম ও ঔষধ বিশিষ্ট ব্রাহ্মণগণের সহিত বর্ত্তমান, ত্রৈলোক্যের লক্ষ্মীযুক্ত, যুধিষ্ঠির ও রামচন্দ্রের তুল্য, অশেষবিজয়ীলক্ষ্মী, ব্রাহ্মণ কুলীন বন্ধুগণের ও স্বধর্ম্ম, দেবতা, বেদজ্ঞগণের আশ্রয় এই লক্ষ্মণ ব্রাহ্মণ।

শ্রীদুর্গানাথ শর্ম্মা।

---

(২) এই মবির ব্রাহ্মণ হইতে বোধ হয় দত্ত ভূমির নাম মাধবনগর হইয়াছিল এবং তাহা হইতে কালে মাধাইনগর হইয়াছে।

হিন্দুরাজত্বে রাঢ়।

স্মরণাতীত কাল হইতে রাঢ় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত। সেই সকল রাজ্যের অধিপতিগণ প্রবল পরাক্রমশালী হইলে কাহারও অধীনতা স্বীকার করিতেন না, যত দিন পারিতেন তিনি ও তাঁহার বংশধরেরা স্বাধীন ভাবেই স্বাজত্ব করিতেন, দুর্ব্বল হইলে অন্যের অধীনতা স্বীকার করিয়া তাঁহাকে কর দিতেন, অথবা রাজ্যভ্রষ্ট হইতেন, তাঁহাদের বা তাঁহাদের রাজ্যাধিকারের পরিচয় দিতে প্রায় কিছুই থাকিত না। কোথা হইতে সেন বংশের কে আসিয়া যে সুহ্ম বা রাঢ়দেশে সর্ব্ব প্রথম আধিপত্য বিস্তার করেন তাহা নির্ণয় করা কঠিন। মহাভারত ও পুরাণাদিতে সমুদ্র সেন, চন্দ্র সেন প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। মাধাই নগরের তাম্র শাসন পত্রে শ্রীধল্ল সেনের উল্লেখ প্রথম দেখা যায়, তিনিই যে সেন বংশের আদিপুরুষ তাহা নিঃসংশয় চিত্তে বলিতে পারা যায় না। উহাতে সর্ব্ব সমেত নয় জনের নাম আছে। তন্মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তম পুরুষ প্রদ্যুম্ন সেন—তাঁহার পুত্র বীর সেন লক্ষ্মণ সেনের অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ। বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদি দৈবকার্য্যে পূর্ব্ববর্ত্তী ছয় পুরুষের নাম প্রায় উল্লেখ করিবার প্রয়োজন হয় বলিয়া নিষ্ঠাবান হিন্দুমাত্রকেই আপনার ঊর্দ্ধতন ছয় পুরুষের নাম স্মরণ রাখিতেই হয়। তদতিরিক্ত আরও এক পুরুষের নাম এই তালিকায় পাওয়া যায়। প্রদ্যুম্ন সেন মন্মথ সেনের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া লিখিত আছে, কিন্তু তাঁহারা পরস্পর কত পুরুষ অন্তর তাহা জানিবার উপায় নাই। নিম্নে সেন বংশের আর একখানি তালিকা দেওয়া হইল, তাহাতে বীর সেনের পরে

দুইটী নাম অজ্ঞাত আছে কিন্তু উপরি উদ্ধৃত তাম্র শাসন পত্রে তাহা খোলসা। ত্রিবেণীর পরিচয় সূত্রে লিখিত আছে—

প্রদ্যুম্নস্তু হ্রদাৎ যাম্যে সরস্বত্যাস্তথোত্তরে।

তদ্দক্ষিণ প্রয়াগস্তু গঙ্গাতো যমুনাগতা॥

শব্দ কল্পদ্রুম।

প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন "প্রদ্যুম্ন নগরাৎ যাম্যে" এই পাঠ পরিবর্ত্তন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র প্রদ্যুম্ন গঙ্গাতীরে আসিয়া যে নগর সংস্থাপিত করিয়াছিলেন তাহারই প্রমাণ চেষ্টা করিয়াছেন। পাণ্ডুয়ার অন্তর্গত মোড়পুরকে তিনি "মারপুর" বলিয়া তাহার পোষকতা করিয়াছেন। অধিকন্তু তিনি ঐ শ্লোকটী মহাভারত হইতে উদ্ধৃত বলিয়া কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসকেও জড়িত করিয়াছেন। কিন্তু মহাভারতে ঐ শ্লোক খুজিয়া মিলে না। যাহাই হউক কন্দর্পপুত্র যে আপন রাজধানীর নিকটবর্ত্তী গঙ্গা যমুনাদি পূতসলিলা নদী ছাড়িয়া এতাধিক দূরে নগর সংস্থাপিত করিবার প্রয়োজনানুভব করিয়াছিলেন এরূপ মনে হয় না। আর পাণ্ডু অপেক্ষা প্রদ্যুম্ন নামের অপভ্রংশে যে পাণ্ডুয়া নাম হইয়া থাকিবে এরূপ অনুমানও অসঙ্গত। ত্রিবেণীর উত্তরবর্ত্তী যে কোন স্থানেরই নাম প্রদ্যুম্নপুর থাকুক তাহা শ্রীধল্ল সেনের বংশধর প্রদ্যুম্ন বই আর কোন প্রদ্যুম্নের প্রতিষ্ঠিত নহে। শ্রীধল্ল সেন এবং প্রদ্যুম্ন সেনের মধ্যে যত পুরুষই ব্যবধান থাকুক কিছুতেই দুই তিন পুরুষের কম নহে। এরূপ স্থলে লক্ষ্মণ সেন হইতে শ্রীধল্ল সেনকে পূর্ব্ববর্ত্তী দ্বাদশ বা দশম পুরুষ ধরিলেও লক্ষ্মণ সেনের তিনশত বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ দশম শতাব্দীতে তাঁহার অস্তিত্ব কল্পনায় কোন আপত্তি হইতে পারে না। দশম শতাব্দীতে পাল রাজগণ গৌড়ে রাজত্ব করিতেন। সেন বংশীয়েরা পাল বংশীয়দের অধীন ছিলেন কি স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিতেন তাহা বলা যায় না। সংপ্রতি কাটোয়ার সন্নিহিত সীতাহাটীর নিকটে যে বল্লাল সেনের তাম্রশাসনপত্রী

পাওয়া গিয়াছে তাহাতে তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণ যে রাঢ়দেশে রাজত্ব করিতেন তাহা স্পষ্ট জানা যাইতেছে,—

তস্যাভ্যুদয়িনি সদাচারচর্য্যা নিরূঢ়ি
প্রৌঢ়াং রাঢ়াং অকলিতচরৈর্ভূষয়ন্তোহনুভাবৈঃ ॥ *

সেই চন্দ্রদেবের সমৃদ্ধিশালী বংশে রাজপুত্রগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যাঁহারা সদাচার চর্য্যের খ্যাতিতে প্রৌঢ় রাঢ়দেশকে অতুল প্রভাব দ্বারা ভূষিত করিয়াছিলেন। †

সেন-বংশীয় রাজগণ রাঢ়দেশে রাজত্ব করিতে করিতে গৌড়ের সিংহাসন আকর্ষণ করিয়াছিলেন। বল্লাল সেনের পিতা বিজয় সেনই সর্ব্ব প্রথম গৌড়ের পাল রাজাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছিলেন।

---

* সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা—১৩১৭ সাল ২৩৯ পৃঃ।

† জন্মভূমি অষ্টমখণ্ড।

* চিহ্নিত তালিকার মন্মথ সেন এবং প্রত্যুম্ন সেন শ্রীধল্ল সেনের বংশধর মাত্র পিতাপুত্র নহে। তদ্ব্যতীত অপর সকলে যথাক্রমে পিতাপুত্র। প্রথম তালিকাটী মাধাই নগরের তাম্রশাসন পত্রানুযায়ী। দ্বিতীয়টী ঐতিহাসিকচিত্র নামক মাসিকপত্রের ১৩১৭ সালের "লক্ষ্মণ সেন ও বক্তিয়ারের বাঙ্গালাজয়" প্রবন্ধানুযায়ী।

পাল-রাজগণ একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত একরকম নিরুপদ্রবেই রাজত্ব করিয়াছিলেন। কলিঙ্গদেশের অধিপতি সোম-বংশীয় মহাপরাক্রমশালী রাজেন্দ্র চোল বা কুলোত্তুঙ্গ চোল দেব দশম শতাব্দীতে বাঙ্গালাদেশ আক্রমণ করিয়া বঙ্গাধিপ গোবিন্দ চন্দ্রকে দক্ষিণ রাঢ়ের রণশূরকে এবং তৎপরে উত্তররাঢ়ের মহীপালকে পরাভূত করেন। *

বল্লাল সেনের পিতামহ স্বাধীন অবস্থাতেই হউক বা রাজেন্দ্র চোলের সামন্ত রাজারূপেই হউক প্রভূত পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র বিজয় সেন গৌড় অধিকার করিলেও নিরুপদ্রব হইতে পারেন নাই। পাল রাজগণ অনেক কাল গৌড়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন, সহসা তাহা কেন পরিত্যাগ করিবেন এই জন্য পাল ও সেন এতদুভয়ে মধ্যে মধ্যে সংঘর্ষ হইত।

বল্লালসেন ১১০৬ অব্দে গৌড়ের সিংহাসন লাভ করিয়া পাল বংশীয় কুমার পালের পুত্র গোপাল এবং তাঁহার পিতৃব্য মদন পালের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহে প্রবৃত্ত ছিলেন। খৃঃ ১১৩৮ অব্দের পর তিনি গৌড় রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছিলেন ? বিক্রম

* তিরুমলয় গিরির শিলালিপিতে এই যুদ্ধের বিবরণ লিখিত।

পুরই তাঁহার রাজধানী ছিল। বল্লালই ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থদিগের মধ্যে কুলীন মৌলিক প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। তিনি সময়ে সময়ে সরস্বতীর বিশ্রামস্থান নবদ্বীপে আসিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সহিত শাস্ত্রালাপে এবং গঙ্গাস্নানে আপনাকে পবিত্র বোধ করিতেন। এজন্য নবদ্বীপে তাঁহার দ্বারা প্রাসাদ নির্ম্মিত এবং একটী দীর্ঘিকা খনিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ এই স্থানে অবস্থিত করিবার কালে স্বীয় পুণ্যবতী জননী বিলাসবতী দেবীর গ্রহণকালে সুবর্ণাশ্বদানের দক্ষিণা স্বরূপ বাসুদেব শর্ম্মাকে বালিহিট্টা গ্রাম দান করিয়াছিলেন।

'দানসাগরগ্রন্থ' মহারাজা বল্লালসেনের এক অসাধারণ কীর্ত্তি। "সময় প্রকাশ" রচয়িতার মতে ১০৯৭ খৃষ্টাব্দে দানসাগর রচিত হয়। কিন্তু ১০৯০ শকে বা ১১৬৮ খৃষ্টাব্দে বল্লাল "অদ্ভূত সাগর" নামক গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করিয়া শেষ করিতে না পারায় পুত্র লক্ষ্মণসেনকে তাহা সমাপ্ত করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। যথাঃ।

> শকে খনবখেংব্দে আরেভেংদ্ভুত সাগরং।
> গৌড়েংদ্রকুংজরালানস্তংভবাহু মহীপতিঃ॥
> গ্রংথেংস্মিন্নসমাপ্ত এব তনয়ং সাম্রাজ্য রক্ষা মহা-
> দীক্ষাপর্বণি দীক্ষণান্নিজকৃতের্নিষ্পত্তিমভ্যর্থ্য সঃ।
> নানাদানচিতাংবুসংচলনতঃ সূর্য্যাত্মজাসংগমং
> গংগায়াং বিরচর্য্য নির্জ্জরপুরং ভার্য্যানুযাতোগতঃ॥

ভাণ্ডারকারের প্রবন্ধ।

ইহাতে বুঝায় যে বল্লাল গঙ্গাতীরবর্ত্তী নির্জ্জরপুরে গিয়া সস্ত্রীক

বসবাস করিয়াছিলেন *। ১০৯০ শকে বা ১১৬৮ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বর্গারোহণ করিলে তাঁহার সহধর্ম্মিণী সহমৃতা হইয়াছিলেন।

নবদ্বীপের এক মাইল উত্তর পূর্ব্বদিকে বল্লালের পুরাতন দীঘির অস্তিত্বের কথা ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের একখানি মানচিত্র দেখিয়া উপলব্ধি করা যায়। এখানে বল্লাল ঢিপি নামে একটী স্তূপের অস্তিত্বে † মনে হয় ইহাই তাঁহার দুর্গ ও বাসস্থানের ভগ্নাবশেষ। সম্ভবতঃ এইখানে নির্জ্জরপুর নামে গ্রাম ছিল। কেহ কেহ বলেন ১১৯৭ খৃষ্টাব্দে বল্লালের পরলোক প্রাপ্তির পূর্ব্ববর্ত্তী কোন সময়ে দানসাগর রচিত হইয়া থাকিবে। বল্লাল শৈবাচারী ছিলেন—বৈদিক ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে যথেষ্ট উৎসাহ দান করিতেন। বল্লাল আপন রাজ্য বঙ্গ রাঢ় বাগড়ি বরেন্দ্র ও মিথিলা এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেন।

বল্লালের অবসর গ্রহণের পর লক্ষ্মণসেনকেও পালবংশীয়দিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইয়াছিল। তিনি গৌড়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া দুর্গ দীর্ঘিকাদি এবং অনেক সুরম্য হর্ম্ম্য দ্বারা রাজধানীর শোভাসমৃদ্ধি বর্দ্ধিত করিয়া ছিলেন। তিনি আপন নামানুসারে তাঁহার রাজধানীর নাম রাখিয়াছিলেন লক্ষ্মণাবতী। তদ্ব্যতীত বিক্রমপুর ও নবদ্বীপেও তিনি অবস্থিতি করিতেন। নবদ্বীপে তিনি বিল্ব পুষ্করিণীর দক্ষিণে এক প্রাসাদ নির্ম্মিত করিয়া শেষাবস্থায় তথায় অবস্থিতি করিতেন। লক্ষ্মণসেন নিজ ভুজবলে বহু দেশ জয় করিয়াছিলেন, সুদূরবর্ত্তী কাশী কোশল প্রভৃতি স্থানে

* শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল সম্পাদিত গোবিন্দ চন্দ্র গীত নামক পুস্তকের ভূমিকা ৶৹ পৃষ্ঠা।

† নদীয়া কাহিনী—৯ পৃষ্ঠায় বল্লাল ঢিপির চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে।

অরুণাখ্যা সারথেশ্চ লেপনাৎ নৃপশেখরঃ।
তাম্রলিপ্তমতো লোকে গায়ন্তি পূর্ব্ববাসিনঃ ॥

বিশ্বকোষে ইহার ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে—যে সময়ে বৃন্দাবনে বাসুদেব রাসলীলা করিতেছিলেন সেই সময়ে তাঁহার ইচ্ছায় চন্দ্র ও সূর্য্যের স্তম্ভন হইয়াছিল। পরে সূর্য্যদেব সারথীকে বলিয়া ছিলেন—আমি ভারতে দিন করিব তুমি উদয়াচল হইতে শীঘ্র এস। সারথি রশ্মি লইয়া উত্থিত হইলে তাহাতে জ্যোৎস্না পতিত হইল। তখন তাম্রবর্ণ অরুণ দূরীভূত হইয়া সমুদ্র প্রান্তে লিপ্ত হইল। যে স্থানে লিপ্ত হইয়াছিল সেই স্থান তাম্রলিপ্ত নামে খ্যাত হয়।” ইহাতে ব্যাখ্যাতার আপনার টীকা টিপনি আছে। আবার কাহার মতে তাম্রধ্বজের নামানুসারে ইহার নাম তাম্রলিপ্ত। কিন্তু উপরিউক্ত কথাটীই বেশ সঙ্গত বলিয়া মনে লাগে। উহাতে তাম্র এবং লিপ্ত এতদুভয় শব্দের সঙ্গতি আছে।

তাম্রলিপ্তের সীমা সকল সময় একরূপ ছিল না। থাকা সম্ভবও নয়। কাব্যবিশেষে লিখিত আছে—

তাম্রলিপ্তো প্রদেশশ্চ বণিকস্য নিবাসভূঃ
দ্বাদশ যোজনৈর্যুক্তঃ রূপনদ্যা সমীপতঃ ॥

বণিকদিগের নিবাসভূমি তাম্রলিপ্ত ১২ যোজন (৪৮ ক্রোশ) রূপনারায়ণ নদের নিকটবর্ত্তী। রাজধানী বা রাজার নাম নাই।

শক্তি সঙ্গম তন্ত্রে লিখিত আছে—

তাম্রলিপ্ত প্রদেশে চ বর্গভীমা বিরাজতে।
গোবিন্দপুর প্রান্তে চ কালীসুরধুনিতটে ॥

বহু পুরাণে তাম্রলিপ্তের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।—

প্রাগ্‌জ্যোতিষাশ্চ মদ্রাশ্চ বিদেহস্তামলিপ্তকাঃ।
মল্লা মগধগোমন্তা প্রাচ্যা জনপদ স্মৃতা।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৫৭ অধ্যায়।

প্রাগ্‌জ্যোতিষাশ্চ মুণ্ডাশ্চ বিদেহাস্তাম্রলিপ্তকাঃ।
মালা মধগোবিন্দাঃ প্রাচ্য জনপদাস্মৃতাঃ॥

বায়ুপুরাণ ৪৬ অধ্যায়।

"কোশলিড্র তাম্রলিপ্তান সমুদ্রতট পুরীশ্চ
দেবরক্ষিতো রক্ষেষ্যতি।"

বিষ্ণুপুরাণ ৪র্থাংশ বঙ্গবাসী-সং ২৯২ পৃঃ।

"দেবরক্ষিত নামে এক ব্যক্তি কোশলীড় ও তাম্রলিপ্ত এবং সমুদ্রতীরবর্ত্তী জনপদ সমূহ রক্ষা করিবেন।

ইহাতেই বুঝিতে হইবে যে, তমলুকরাজবংশের যে বংশপত্রী আছে তন্মধ্যে ময়ূর-বংশীয় বলিয়া যে ময়ূরধ্বজ, তাম্রধ্বজ, হংসধ্বজ ও গরুড়ধ্বজ নামে চারিজন রাজার উল্লেখ পাওয়া যায় এবং তাহাতে যখন দেবরক্ষিতের নাম পাওয়া যাইতেছে না তখন তাঁহাকে "ধ্বজ"ধারী রাজগণের পূর্ব্ব বা পরবর্ত্তী বিবেচনা করিতে হয়। উক্ত বংশতালিকায় তাঁহাদিগকে লইয়া আজ পর্য্যন্ত ৫৭ জনের নাম আছে। ঐ চারিজন রাজার পরবর্ত্তী কোন রাজার দেব রক্ষিত নাম নাই। পুরাণগুলিতে তাম্রলিপ্তের নাম নানাস্থানেই দেখা যায় কিন্তু কুত্রাপি দেবরক্ষিত বই আর কাহার নাম পাওয়া যায় না। লুপ্তাস্তিত্ব "প্রদীপ" পত্রের সপ্তম ভাগে যে বর্ত্তমান রাজার জাতিতত্ত্ব লইয়া বাদপ্রতিবাদ চলিয়াছিল তাহাতে একপক্ষ তাঁহাকে অনার্য্য বংশসম্ভূত, পক্ষান্তরে আর্য্যকুলোদ্ভব বলিয়া

অনেক কথা কাটাকাটি করিয়াছিলেন। আমরা সে সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিতে চাই। "ধ্বজ"ধারী চারিজন বা পাঁচ হইতে ছত্রিশ পুরুষ এবং সাঁইত্রিশ হইতে বর্ত্তমান বংশধর পর্য্যন্ত যে পৃথক রাজবংশ তাহা কুর্বিনামা খানি আগাগোড়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। যে কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তিই এ কথা বলিবেন। বর্ত্তমান রাজবংশ কৈবর্ত্তজাতীয় তাহাও ঠিক—কিন্তু অনার্য্য নহে।* পাদটীকায় বিষ্ণুপুরাণের উদ্ধৃতাংশে বুঝা যায় যে, কৈবর্ত্ত সংকীর্ণ ক্ষত্রিয়। তবে আর গোলযোগ কেন—যেরূপ দিনকাল পড়িয়াছে, বঙ্গবাসীর প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় যোগেন্দ্র চন্দ্রের কল্যাণে শাস্ত্রগ্রন্থ এদেশে এখন সকল বাড়ীতেই প্রায় পাওয়া যায় কেবল একটু আলস্যত্যাগে অবসর মত দেখিলেই শাস্ত্রের সমস্ত তত্ত্বই জানিতে পারা যায়। এখন শাস্ত্র দেখিয়া সকল জাতিই মাথা তুলিয়া উঠিতেছে।

তালিকার লিখিত ৪৫ পুরুষ রামভূঞা ৯৭০ সাল বা ১৫৬১ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন দেখা যায়। এই ৪৫ পুরুষ মধ্যে কখন রাজ্যভাগ হয় নাই। কেবল তাঁহার পরলোক গমনের পর তাঁহার দুই পুত্র শ্রীমন্ত রায় ও ত্রিলোচন রায় তাহা করিয়াছিলেন এবং তদবধি তাহাই চলিয়া আসিতেছে। রাজবংশে রাজত্ব বিভাগের রীতি প্রচলিত ছিল না। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন দায়ভাগে সকল পুত্রের পিতৃধনে তুল্যাংশের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন।

---

* কৈবর্ত্ত কটু পুলিন্দ-ব্রহ্মনান্ রাজ্যে স্থাপয়িষ্যৎ
যং সাদ্যামিত্র ক্ষত্রজাতিম্।

কৈবর্ত্ত কটু পুলিন্দ ও মৎসদি সংকীর্ণ ক্ষত্রিয় জাতিকে রাজ্যে স্থাপিত করিবে। বিষ্ণুপুরাণ চতুর্থাংশ বঙ্গবাসী সংস্করণ ২৯২ পৃঃ।

রামভুঞার মৃত্যুকালে দায়ভাগ প্রচলিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। এদেশে দায়বিভাগের প্রচলন হইতেও অনুমান করা যায় যে তালিকার ৩৭ পুরুষ কালু ভুঞা পূর্ব্ববর্ত্তী রাজবংশের কেহ নহে, এমন কি এক জাতীয় বলিয়াও মনে হয় না, কৈবর্ত্ত (মাহিষ্য) বলিয়াই বিবেচনা করিতে হয়। কৈবর্ত্ত বহুকাল হইতে এদেশে অবস্থিতি করিয়া এদেশের আচারব্যবহার রীতিনীতির অনুকরণ করিয়া আসিতেছেন বলিয়া স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের ব্যবস্থার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদিগকে রাজ্যভাগে বাধ্য হইতে হইয়াছিল। ভারতের সর্ব্বত্র অদ্যাপি মিতাক্ষরা মতে দায়বিভাগ হইয়া থাকে। তদনুসারে রাজাদের জ্যেষ্ঠ পুত্রেরাই ধনাধিকার লাভ করেন। ভাঙ্গড় ভুঞার বংশধরগণ সংকীর্ণ ক্ষত্রিয় বলিয়া গণ্য হইলে উত্তরাধিকার সূত্রে রাজপুত্রগণের মধ্যে রাজ্য বিভক্ত হইতে পারিত না। ৪১ পুরুষ ভাঙ্গড় ভুঞা ৮১০ সালে বা ১৪০৩ খৃঃ অঃ লোকান্তর বাস করেন, কালু ভুঞা তাঁহার উর্দ্ধতন চারি পুরুষ মাত্র বা ১০০ বর্ষ পূর্ব্ববর্ত্তী কালের—সেই সময়ে এদেশে রাষ্ট্রবিপ্লব আরম্ভ হইয়াছিল। মুসলমানেরা হিন্দুর রাজত্ব ধ্বংশে ব্রতী হইয়াছিলেন, ৩৬ পুরুষ নিঃশঙ্ক রায়ের পত্নী তখন তমোলুকের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিতা। স্ত্রীলোকের রাজ্য পাইয়া কালু ভুঞা তাঁহার রাজ্য অনায়াসেই কাড়িয়া লইতে পারিয়াছিলেন। তমোলুক অঞ্চলে কৈবর্ত্তের বাস অদ্যাপি ¾ অংশেরও অধিক, সংখ্যাধিক হইলেই জাতীয় প্রাধান্য প্রতিপত্তি বেশী হয়। রাজা দুর্ব্বল বা স্ত্রীলোকের রাজ্য হইলে সামান্য চেষ্টাতেই তাহা কাড়িয়া লওয়া যায়। কালুরায়ের পক্ষে সে সুযোগ ষোল আনাই ঘটিয়াছিল। বিদ্যাধর রায় হইতে ৫৩ চন্দ্রাদেই পর্য্যন্ত রাজগণ গঙ্গাবংশীয় হউন বা

রায়বংশীয়ই হউন, তমলুকের সৌভাগ্য সম্পদ সকলই তাঁহাদের আমলে। তাঁহাদের অধিকারকালেই বাণিজ্যবৈভব—সমুদ্রগর্ভ হইতে বহুমূল্য রত্ন প্রবাল-মুক্তাদির উদ্ধার, তৎকালিক সমুদ্রতীর-বর্ত্তী তমলুকের বাণিজ্যপোতের দেশ দেশান্তর যাত্রাদি যাবতীয় ব্যাপার। সেই সময়েই তমোলুক রাজ্যের প্রসার বৃদ্ধি—পশ্চিমে উড়িষ্যা ও উত্তরে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত হইয়াছিল।

তমোলুকের বর্ত্তমান রাজবংশের জাতি সম্বন্ধে বেশী বলিতে হইলে তাহাতে তিক্ততা বই মধুরতার আশা করা যায় না। তাঁহাদের বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থাই তাহার বিশেষ পরিচায়ক। কৈবর্ত্ত সংকীর্ণ ক্ষত্রিয় হইলেও তাঁহারা এখন সেই ক্ষত্রিয় রূপেই কি সমাজে গণনীয়? রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণে কি তাঁহাদের যাজ্যক্রিয়া করিয়া থাকেন? দান পরিগ্রহ করেন? যদি না করেন তাহা হইলে কি বুঝিব না যে হিন্দুসমাজ তাঁহাদিগকে এই রূপেই গণ্য করিয়া আসিতেছিলেন, যখন এদেশে কৈবর্ত্ত জাতির প্রাদুর্ভাব হয়, সামান্য নহে—প্রবল প্রতাপান্বিত রাজার প্রাদুর্ভাব। রাজা কি না করিতে পারেন, জাতি সম্বন্ধে বল্লাল কি করিয়াছিলেন, এক বিশেষ সম্মানিত বৈশ্য জাতিকে অধঃপাতিত করিয়াছেন। যাহাকে বাড়াইবার ইচ্ছা তাহাকে বাড়াইয়াছেন। তমোলুকের প্রাচীন রাজগণও কি তাহা পারিতেন না, কেবল ধর্ম্মভয়ে তাহা করেন নাই। আরও এক কথা তমোলুক অঞ্চলে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের বাস অত্যল্প, এমন কি নাই বলিলেও চলে। তাহার কারণ তাঁহাদের অযাজ্য কৈবর্ত্ত জাতিতে দক্ষিণ দেশ পরিপূর্ণ। এই সকল বিষয় আলোচনা করিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, বহুকাল হইতে তাঁহারা এই অবস্থায় অবস্থিত। তবে এখন হিন্দু সমাজের যে

অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তথনকার কালে যদি রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের মতি গতি এরূপ থাকিত, তাহা হইলে কৈবর্ত্ত জাতি সমাজে আপনাদের উচ্চস্থান রক্ষায় সমর্থ হইতে পারিতেন। তবে এখনকার দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া দেখিলে মনে হয়, যদি তাঁহাদের বিশেষ চেষ্টাযত্ন থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা সফলকাম হইতে না পারিবেন কেন ?

খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে মেগাস্থিনিস এদেশে আসিয়া পাটলী-পুত্র নগরে চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় অবস্থিতিকালে যে সকল বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে সমুদ্রের উপকূল প্রদেশে তালাক্তি নামে এক রাজ্যের উল্লেখ করিয়াছেন, আধুনিক পাশ্চাত্য প্রত্নতাত্ত্বিকেরা তাহাকেই তমোলুক বলিয়া থাকেন। তমোলুক ও তন্নিকটবর্ত্তী কয়েকটী রাজ্যের রাজাদিগের সৈন্যবল ৫০ হাজার, তন্মধ্যে ৪ হাজার অশ্বারোহী এবং ৪ শত হস্তী ছিল। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে প্লিনী তাহার প্রতিধ্বনি মাত্র করিয়াছেন, তবে চীনীয় পরিব্রাজক ফাহিয়ান ৩৯০ খৃষ্টাব্দে ভারত ভ্রমণে আসিয়া তমোলুক সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন—তমোলুক সহর প্রায় ৩ মাইল, সমস্ত রাজ্যের পরিমাণ প্রায় দুইশত মাইল বা এক শত ক্রোশ। ইহাকে তিনি তমোলিপ্তি বলিয়া গিয়াছেন, সমুদ্র এবং রূপনারায়ণের তীরে অবস্থিত। পালী ভাষায় লিখিত সিংহলের মহাবংশে তামলিপ্তি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। তামলিপ্তি বিস্তৃত বাণিজ্যের স্থান। ফাহিয়ান এখানকার দশটী সংঘারামে সহস্রাধিক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এবং হিন্দুদের ৫০টী দেবালয় দেখিয়াছিলেন। নগরের নিকটেই রাজা অশোকের দ্বারা নির্ম্মিত একটী স্মৃতিস্তম্ভ ছিল। বৌদ্ধদিগের দ্বারা এই নগর যারপর নাই

সম্মানিত হইত। খৃষ্ট পূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীর অবসানকালে জম্বু-দ্বীপের রাজা ধর্ম্মাশোক সিংহলে এক রাজদূত পাঠাইয়াছিলেন তিনি তমোলুকের বাণিজ্যবন্দরে জাহাজারোহণ করিয়াছিলেন। ফাহিয়ান এবং হুয়েন্থসাংএর বর্ণনা পাঠে বোধ হয় যে, পঞ্চম ও সপ্তম শতাব্দীতে তমোলুক মহাসমৃদ্ধিশালী নগর ছিল।

তমোলুকের প্রাচীন রাজবংশধর মহেন্দ্র নারায়ণ বেংচিবে-ড়িয়ায় এবং সুরেন্দ্র নারায়ণ তমোলুকে থাকিয়া পৈতৃক জমিদারীর যৎকিঞ্চিৎ যাহা অবশিষ্ট আছে তাহারই উপস্বত্ব ভোগ করিতেছেন। ইংরাজরাজ এখানে, মেদিনীপুর সদরের অধীন এক মহকুমা সংস্থাপিত করিয়াছেন, তাহাতে একজন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট এবং একাধিক মুন্সেফ আছেন। সকল থানায় দুই জন করিয়া সবইনিস্পেক্টর, জমাদার ও কনষ্টেবল শান্তিরক্ষার কাজে ব্রতী। চারি পাঁচখানি গ্রামের উপর এক একটী পঞ্চাইত কমিটী আছে, তাহাতে প্রেসিডেণ্ট ও সেক্রেটরী (কলেকৃটিং মেম্বর) আরও দুইটী বা চারিটী মেম্বর আছেন, ইঁহারা শান্তিরক্ষার কার্য্যে পুলিশকে সাহায্য করেন এবং ট্যাক্স আদায় করিয়া গ্রাম্য চৌকিদারগণকে বেতন দেন।

তমোলুকে বর্গভীমা নামে এক দেবী আছেন, তিনি কত কালের, কেহ তাহা নিশ্চয় বলিতে পারে না। তাঁহার সম্বন্ধে দুইটী কিম্বদন্তী শুনিতে পাওয়া যায়—(১) পূর্ব্বে যে তাম্রধ্বজ রাজার কথা বলা হইয়াছে, তাঁহার বাড়ীতে এক ধীবর কন্যা প্রতিদিন মৎস্য যোগাইতে আসিত। সে বনের ভিতর দিয়া একদিন একটী ক্ষুদ্র পথ ধরিয়া মৎস্য দিতে আসিতেছিল, দেখিল একটী ছোট কুণ্ডে একটু জল আছে, ধীবর কন্যাদের স্বভাব

মৎস্য তাজা রাখিবার জন্য জল পাইলেই মাছের গায়ে ছড়াইয়া দেয়, কথিত ধীবর কন্যা তাহার মৎস্যগুলির উপর সেই কুণ্ডের জল ছড়াইয়া দিবামাত্র মৎস্যগুলি জীবিত হইল। রাজা তাম্রধ্বজ সে কথা শুনিয়া ধীবর পত্নীর সহিত সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া একটী বেদীর উপর এক দেবীমূর্ত্তি দেখিলেন এবং তাঁহার সেবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন, তিনিই দেবী বর্গভীমা।

দ্বিতীয় কিম্বদন্তী এই—বিখ্যাত ধনপতি সদাগর বাণিজ্য যাত্রাকালে পথিমধ্যে তমোলুকে এক ব্যক্তির হাতে স্বর্ণ ভৃঙ্গার (গাড়ু) দেখিয়া জিজ্ঞাসায় জানিলেন বনমধ্যে একটী ছোট কুণ্ড আছে তাহাতে পিত্তলের জিনিষ ডুবাইলে তাহা স্বর্ণময় হইয়া যায়। ধনপতি এই কথা শুনিয়া বাজারের সমস্ত পিত্তল কিনিয়া কুণ্ডে ডুবাইয়া রাখিলে তাহা স্বর্ণময় হইয়া যায়। সিংহলে পৌঁছিয়া সদাগর তাহা বিক্রয়ে বহু অর্থ লাভ করেন, প্রত্যাগমনের কালে তিনি দেবীর অতি উৎকৃষ্ট মন্দির প্রস্তুত করাইয়া দেন। সাধারণ লোকে বলে ইহা দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত। নব্বই ফিট উচ্চ বেদীর উপর এই মন্দির প্রস্তুত। মন্দিরের ভিতর হইতে দেখিলে মনে হয় যেন একখানি শ্বেত প্রস্তর খুদিয়া তাহার গঠন করা হইয়াছে, মন্দিরের গায়ে, মাথায় চতুর্দ্দিকে ইষ্টক দ্বারা রচিত দেওয়াল। প্রত্নতাত্ত্বিক সার্ উইলিয়ম হাণ্টার সাহেব বলেন—Among the objects of notice at Tamlook is a temple of great sanctity and of much architectural interest, dedicated to Barga Bhima তমোলুকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বর্গভীমার মন্দির—উহার রচনা কৌশল অতি সুন্দর।

মন্দিরটী অতি উচ্চ—বহুদূর হইতে ইহার চূড়া দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। মন্দিরের সম্মুখেই যজ্ঞমন্দির। প্রবাদ এইরূপ যে, একটী পতিপুত্রহীনা বৃদ্ধা সূতা কাটিয়া যে অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিয়াছিল তদ্দ্বারা ইহা গঠিত হইয়াছে। হিন্দুরমণী চিরদিন ধর্ম্মপ্রাণা। দেবীর মন্দির ও যজ্ঞমন্দির দুইটী একটী খিলানে সংযুক্ত তাহাকে "জগমোহন" বলে। জগমোহন নামক কোন ব্যক্তি দ্বারা তাহার নির্ম্মান হওয়া সম্ভব, তাহারই নামানুসারে উহার নামকরণ হইয়া থাকিবে। যজ্ঞমন্দিরের সম্মুখে বলিদান ও যাত্রাদি নাচ-গানের জন্য একটী দালান আছে। দক্ষিণে ভোগ রাঁধিবার ও অধিকারিগণের থাকিবার স্থান। মন্দিরের উত্তরে একটী কুণ্ড, তাহাতে স্নান করিলে দেহ নীরোগ, সুস্থ, স্বচ্ছন্দ হয়।

হিন্দুদ্বেষী কালাপাহাড় এখানে আসিয়া পরম পরিতোষ লাভ করেন এবং পারস্য ভাষায় একখানি দলিল লেখাইয়া দেবসম্পত্তি সাব্যস্ত করিয়া যান। সেবাইতগণের নিকট অদ্যাপি তাহা আছে। দুরন্ত অত্যাচারী বর্গী আসিয়াও দেবীর প্রতি কোন অত্যাচার করা দূরে থাকুক, যোড়শোপচারে পূজা ও বহু ধন রত্নাদি দিয়া যায়।

ভীমাদেবীব্যতীত জিষ্ণুহরি শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, রামচন্দ্র ও জগন্নাথ দেবের মূর্ত্তিও এখানে প্রতিষ্ঠিত আছেন। জিষ্ণুহরি বহু প্রাচীন দেবতা। রাজা তাম্রধ্বজ ইহার প্রতিষ্ঠাতা, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ উপলক্ষে অর্জ্জুন যজ্ঞীয়াশ্ব রক্ষার্থ নিযুক্ত হইয়া তাম্রলিপ্তে উপস্থিত হইলে, রাজা তাম্রধ্বজ পুত্রগণের সহিত মিলিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। অর্জ্জুন কিছুতেই জয়লাভে সমর্থ হইলেন না, ভীষণ যুদ্ধে তাঁহার কপোল দেশ হইতে ঘর্ম্মবারি নিসৃত হইয়া নদীর সৃষ্টি

করে, তজ্জন্য সেই নদীর নাম হয় "কপালমোচন"—সমস্ত নদী অপেক্ষা পুণ্যতোয়া। অর্জ্জুন কৃষ্ণকে আপন পরাভবের কারণ জিজ্ঞাসিলে তিনি বলেন, "তাম্রধ্বজ বড়ই ভগবদ্ভক্ত, তিনি সহজে পরাজিত হইবার নহেন"। তাঁহারা উভয়েই স্ব স্ব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাম্রধ্বজের সভাস্থ হইলে রাজা ও সভাস্থ সকলে বিস্মিত হয়েন, রাজা গললগ্নীকৃতবাসে তাঁহাদিগকে প্রণাম ও স্তব করিলে, স্তবে তুষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বর দিতে প্রস্তুত হইলেন, তাম্রধ্বজ প্রার্থনা করিলেন—যেন প্রতিদিন তাঁহাদের যুগলমূর্ত্তি দেখিতে পান। শ্রীকৃষ্ণ "তথাস্তু" বলিয়া প্রার্থনা পূর্ণ করিলে তাম্রধ্বজ যজ্ঞীয়াশ্ব ছাড়িয়া দিলেন, তাম্রধ্বজও তাঁহাদের দুইয়ের মূর্ত্তি রচনা করিয়া নাম দিলেন "জিষ্ণুহরি"। অদ্যাপি সেই মূর্ত্তি এবং তাম্রধ্বজের নির্ম্মিতমূর্ত্তি বিদ্যমান।

কপালমোচন সম্বন্ধে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের উক্তি, দেবাদিদেব মহাদেব দক্ষযজ্ঞে দক্ষের প্রাণবধ করিলে ব্রহ্মবধ হেতু দক্ষের মুণ্ড তাঁহার হস্তচ্যুত হইল না, ব্রহ্মপাতকের মোচন জন্য মহাদেব নানা তীর্থে ভ্রমণ ও নানা উপায় অবলম্বন করিলেন, কিছুতেই দক্ষমুণ্ড হস্তচ্যুত হইল না, তিনি অতি বিষণ্ণ মনে অবস্থিতি করেন দেখিয়া নারায়ণ পরামর্শ দিলেন,—

কপালমোচনং নাম যৎ সরঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
তদম্বুস্পর্শনান্মুক্তি নাত্র কার্য্যা বিচরণা ॥
কপালমোচনে স্নাত্বা মুখং দৃষ্ট্বা জগৎপতে।
বর্গভীমাং সমালোক্য পুনর্জ্জন্ম নবিদ্যতে ॥

কপালমোচন নামক এক সরোবর আছে, তাহার জল স্পর্শমাত্র মুক্তিলাভ হয়। কপালমোচনে স্নান করিয়া জগৎপতির মুখ দর্শন করিয়া বর্গভীমা দেখিলে পুনর্জ্জন্ম হয় না।

দেবাদিদেব, শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শ মতে কপালমোচনে স্নান করিলে তাঁহার হস্ত হইতে দক্ষমুণ্ড স্খলিত হয়। মহাপুণ্যপ্রদ কপালমোচন সরোবর এখন নাই, কালক্রমে তাহা রূপ-নারায়ণের উদরগত হইয়া থাকিবে।

তমোলুকমাহাত্ম্য শুনিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। অর্জ্জুন দ্বারাবতীর সভায় উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বদা কোন্ স্থানে বাস করেন, তাহা জানিবার জন্য আমার বড়ই কৌতূহল জন্মিয়াছে।" তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ উত্তর করেন, "তমোলিপ্ত" অপেক্ষা আমার প্রিয়তর স্থান আর নাই, লক্ষ্মী যেমন আমার বক্ষঃস্থল ত্যাগ করেন না, আমিও তেমন তমোলুক ত্যাগ করিতে পারি না। তুমি নিশ্চয় জানিও আমি যুগে যুগে আর আর সমস্ত তীর্থ ত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু তমোলুক তীর্থ কদাচ পরিত্যাগ করিব না।" তমোলুকের পক্ষে ইহা অতিশয় গৌরবের কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা দাঁড়ায় নাই—"বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং নগচ্ছতি" এই বাক্যেরই স্বার্থকতা দেখিতে পাওয়া যায়। সুবুদ্ধি পাঠক এসম্বন্ধে একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পরিবেন।

সপ্তগ্রাম। প্রাচীন রাঢ়ের সীমা সরহদ্দ সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত কিছু বলা হয় নাই, বলিবার সুযোগও ঘটে নাই, এখন বলিতে হইবে—রাঢ় বলিতে উত্তরে রাজমহল, পূর্ব্বদিকে ভাগীরথী, দক্ষিণে বঙ্গসাগর, পশ্চিমে জঙ্গলমহল, এখনকার বর্দ্ধমান বিভাগ। মোগল রাজত্বে লিখিত দিগ্বিজয় প্রকাশ গ্রন্থে লিখিত আছে—

গৌড়স্য পশ্চিমে ভাগে বীরদেশস্য পূর্ব্বতঃ।
দামোদরোত্তরে ভাগে রাঢ়দেশ প্রকীর্ত্তিতঃ।

ইহাকে উত্তর রাঢ়ের সীমা বলা যাইতে পারে, সমগ্র রাঢ় আরও বড়। রাঢ়দেশ যে উত্তর ও দক্ষিণ দুই ভাগে বিভক্ত তাহা তিরুমলয়গিরির লিখিত শিলা লিপিতেই প্রথম প্রকাশিত, সাধারণতঃ তখন দক্ষিণ রাঢ়কেই সুহ্মদেশ বলা হইত। মহারাজ বল্লাল সেনের তাম্রশাসন পত্রে দেখা যায়, অজয় নদের উত্তর— উত্তর রাঢ়, এবং দক্ষিণে দক্ষিণ রাঢ়। দ্বাদশ শতাব্দীতেও উত্তর দক্ষিণ রাঢ় অজয় নদ দ্বারা বিভক্ত ছিল এবং তদবধি এইরূপ বিভাগই বলবৎ। ভাগবতে যে সুহ্মবাসীকে পাষণ্ড বলা হইয়াছে, তাহাতে পাষণ্ড বলিতে বৌদ্ধ না বুঝাইয়া আমার বোধ হয় সুহ্মের আদিম নিবাসীকেই বুঝায়—যাহারা রাঢ় নামে প্রসিদ্ধ ছিল তাহা-দিগকেই বুঝাইত, সেই অসভ্য রাঢ় জাতি হইতেই রাঢ়ের নাম করণ হইয়াছে। খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে মহাবীর স্বামী এইদেশ মধ্যে ধর্ম্ম প্রচার করিতে আসিয়া তাহাদের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া-ছিলেন। এখনকার নীচ শ্রেণীস্থ লোকদিগকে এখনও রাঢ় চুয়াড় বলিয়া থাকে। কবিকঙ্কণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় হইা বেশ স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন,—

অতিনীচ কুলে জন্ম জাতিতে চোয়াড়।
কেহ না পরশ করে লোকে বলে রাঢ়॥

অন্যত্র—

ব্যাধ গো হিংসক রাঢ়, চৌদিকে পশুর হাড়,
শ্মশান সমান এই স্থান।
বলিগো বিনয়বানী, এই ঘরে ঠাকুরাণী
প্রবেশে উচিত হয় স্নান॥

কবিকঙ্কণ চণ্ডী।

রাঢ়ের পশ্চিমেই কলিঙ্গদেশ, অতি প্রাচীন কালে উড়িষ্যা কলিঙ্গের অন্তর্গত ছিল। অতঃপর বুঝিতে হইবে, দক্ষিণ রাঢ়ের উত্তরে অজয়, পূর্ব্বে ভাগীরথী, দক্ষিণে সমুদ্র, পশ্চিমে উড়িষ্যা বা কলিঙ্গ। যতদিন পর্য্যন্ত হুগলী পৃথক একটী জেলা বলিয়া পরিগণিত না হইয়াছে, ততদিন আমাদিগকে দক্ষিণ রাঢ়কেই হুগলী জ্ঞান করিয়া লইতে হইবে, কেন না তখন হুগলীর অস্তিত্ব ছিল না, ছিল কেবল দক্ষিণ রাঢ়ের। মুসলমান রাজত্বে হুগলীর পৃথক মূর্ত্তি প্রকটিত হয় নাই, রাঢ়দেশের মধ্যে যে কয়েকটী সরকার ছিল—সরিফাবাদ, সুলেমনাবাদ (সেলিমাবাদ) মান্দারণ ও সপ্তগ্রাম ইহাদের কিছু কিছু আধুনিক হুগলী জেলার অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে। কাজেই হুগলীর ইতিহাস লিখিতে বর্দ্ধমান ~~বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের~~ কথা না বলিলে উপায় নাই। তাহারই জন্য বর্দ্ধমান রাজ-বংশের ও মেদিনীপুরের রাজ-বংশের কথা লিখিতে হইবে।

শাস্ত্রে আছে—প্রিয়ব্রত রাজার সাত পুত্র—অগ্নিদ্র, মেধাতিথি, বপুষ্মান, জ্যোতিষ্মান, দ্যুতিমান, সবন ও ভব্য। পুরাণ বিশেষে এই সাতটীর কোন কোন নামের প্রকারান্তর আছে। তাঁহারা গৃহাশ্রমী না হইয়া নিভৃত নির্জ্জন গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থলে তপঃসাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ঋষিতপস্বীরা রাজ্যাধিকারের কি ধার ধারেন, তপশ্চর্য্যাই তাঁহাদের লক্ষ্য। অনুমান হয় যখন বলিরাজ পুত্র সুহ্ম অসভ্য রাঢ় জাতীয়ের দেশে সুহ্ম নামে রাজ্য সংস্থাপন করেন, সেই সময়ে তিনি এই সপ্তর্ষিসন্নিবিষ্ট পুণ্যভূমিকে আপনার রাজধানীর উপযুক্ত বোধে ইহাতেই আপনি অবস্থিতি করেন এবং সপ্তর্ষির সম্মানার্থে ইহার সপ্তগ্রাম নাম রক্ষা করিয়াছিলেন।

প্রবোধচন্দ্রোদয়ের দম্ভবাক্যে যে রাঢ় পুরীকে অত্যৈশ্চর্য্যশালিনী বলা হইয়াছে, তাহা সপ্তগ্রাম বই অন্য কোন নগরকে বুঝায় না। রাঢ়ে অনেক সামন্ত রাজা ছিলেন, তাঁহাদের রাজধানীগুলিও বিশেষ সমৃদ্ধিশালিনী ছিল, হিন্দুরাজত্বে রাঢ়দেশ ধনধান্যে পরিপূর্ণ লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বলিয়া কথিত হইত। সপ্তগ্রাম এখন বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ শ্বাপদ সমাকুল। কিছুদিন পূর্ব্বে সপ্তগ্রামের পথে চলিতে ভয় হইত, শার্দ্দূল ভল্লুকাদি শ্বাপদ জন্তু দিবাভাগে রাজপথে নির্ভয়ে ভ্রমণ করিত। খৃষ্টীয় শকের প্রথম শতাব্দীতে প্লীনি লিখিয়া গিয়াছেন—That the ships near the Godevari sailed from thence to cape Palimerus, thence to Tentigale opposite Fulta, thence to Tribeni—Dr. Crawfford's Hugli.

এখন ফল্‌তার পরপারে ধ্বজা। ত্রিধারায় প্রবাহিতা গঙ্গার শাখা সরস্বতীর উত্তরে ত্রিবেণী এবং দক্ষিণে সপ্তগ্রাম। সপ্তগ্রামের পূর্ব্বদিক্ দিয়া ভাগীরথী দক্ষিণগামিনী। সেকালে যেখানে সপ্তর্ষি তপস্যা করিতেন, সেখানে এখন বাসুদেবপুর, বাঁশবেড়িয়া, খামার পাড়া, কৃষ্ণপুর, শিবপুর, দেবানন্দপুর, ত্রিশবিঘা প্রভৃতি গ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়। রেভঃ লং সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন—Many years ago Satgao, the Royal Emporium of Bengal from the time of Pliny down to the arrival of the Portuguese in this country, has now scarcely a memorial of its greatness left.

অন্যতম পাশ্চাত্য প্রত্নতাত্ত্বিক উইল ফোর্ড লিখিয়াছেন—It is a famous place of worship and has formerly

the residence of the kings of the country and said have been a city of an immense size so as to have swallowed one hundred villages. ষ্টীনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা অপ্রকৃত বা আমাদের শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে।

এখন আমরা সপ্তগ্রামে কি দেখিতে পাই—গঙ্গাতীরে এক প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ—তাহার পশ্চিমে সরস্বতী ও অন্য তিন দিকে দুর্গপরিখা ও প্রকার চিহ্ন, একটী অতি পুরাতন ভগ্ন সেতু, জাফর খাঁর সমাধি মসজিদ, (যাহা সপ্তর্ষির সাধন গৃহ বা কোন দেবালয় বই) আর কিছু বলিয়া মনে করা যায় না। কিন্তু এখন জাফর খাঁর সমাধি বলিয়াই প্রসিদ্ধ, এবং কতকগুলি মসজিদের ভগ্নাবশেষ এবং কতকগুলি অতি প্রাচীন জলাশয় বই আর কিছু নেত্রগোচর হয় না।

মুসলমান রাজত্বেও সপ্তগ্রামের সুখ সমৃদ্ধি ছিল। কবিকঙ্কণ লিখিয়াছেন—

আর যত সফর তা বলিবারে নারি।
এ সব সহরে যত সদাগর বৈসে।
কত ডিঙ্গা লয়্যা তারা বাণিজ্যায় আইসে॥
সপ্তগ্রামের বণিক কোথায় না যায়।
ঘরে বসে সুখ মোক্ষ নানা ধন পায়॥
তীর্থ মধ্যে পুণ্যতীর্থ ক্ষিতি অনুপম।
সপ্তঋষির শাসনে বলায় সপ্তগ্রাম॥

কবিকঙ্কণ চণ্ডী।

কবি বিপ্রদাস পিপলাই ১৪১৭ সালে বা ১৪৯৬ খৃষ্টাব্দে রচিত মনসা-মঙ্গলে সপ্তগ্রামের পরিচয় দিয়াছেন—

ছত্রিশ আশ্রমে লোক, নাহি কোন দুঃখ শোক,
আনন্দে বঞ্চয়ে নিরন্তর।
বৈসে যত দ্বিজগণ, সর্ব্ব শাস্ত্রে বিচক্ষণ,
তেজোময় যেন দিবাকর॥
সর্ব্বতত্ত্ব জানে মর্ম্মে, বিশারদ গুরু ধর্ম্মে,
জ্ঞানগুরু দেবের গোচর।
পুরুষ মদন যেন, রমণী সাবিত্রী হেন,
আভরণ সব স্বর্ণময়।
তার রূপ গুণ যত, তাহা বা বর্ণিব কত,
হেরিতে নিমিষ বিলয়॥
অভিনব সুরপুরী, দেখি ঘর সারি সারি,
প্রতি ঘরে কনকের ঝারা।
নানা রত্ন অবিশাল, জ্যোতির্ম্ময় কাচ চাল,
রঙ্গে মুক্তা প্রলম্বিত ঝারা॥
মসিদ মোকাম ঘরে, সেলাম রাজায় করে,
কয়তা করয়ে নিত্য লোকে।
বন্দিয়া মনসাদেবী; দ্বিজ বিপ্রদাস কবি,
উদ্ধারিয়া ভকত সেবকে॥

কবি কৃষ্ণরামের ষষ্ঠীমঙ্গলে সপ্তগ্রামের পরিচয়—

সপ্তগ্রামে যে ধরণী তার নাহি তুল।
চালে চালে বৈসে লোক ভাগীরথী কূল॥
নিরবধি যজ্ঞ দান পুণ্যবান লোক।

অকাল মরণ নাহি, নাহি দুঃখ শোক ॥
শক্রজিৎ রাজার নাম, তার অধিকারী।
বিবরিয়ে যত গুণ বলিবারে নারি ॥
বিমল যশের শশী প্রতাপে তপন।
জিনিয়া অমরাপুরী তাহার ভবন ॥

শক্রজিৎ নামে হিন্দুরাজা সপ্তগ্রামে রাজত্ব করিতেন, ইহা উপরিউক্ত কবিতায় স্পষ্ট প্রতিপন্ন করিতেছে। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে শ্রীচৈতন্যপার্ষদ নিত্যানন্দ মহাপ্রভু কিছুদিন ত্রিবেণীর নিকট সপ্তগ্রামে উদ্ধারণ দত্ত মহাশয়ের বাটীতে অবস্থিতি করিয়াছিলেন।

উদ্ধারণ দত্ত ভাগ্যবন্তের মন্দিরে।
রহিলেন মহাপ্রভু ত্রিবেণীর তীরে ॥
কায়মন বাক্যে নিত্যানন্দের চরণ।
ভজিলেন অকৈতবে দত্ত উদ্ধারণ ॥

— চৈতন্য ভাগবৎ।

হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন মজুম্‌দার নামে দুই ভাই এই সময়ে সপ্তগ্রামের ইজারদার ছিলেন, তাঁহারা বার লক্ষ টাকা বার্ষিক রাজস্ব দিয়া বিশ লক্ষ টাকা আদায় পাইতেন। তৎকালে ইজারদারী প্রথা প্রচলিত ছিল। নিয়মিত সময়ের জন্য মহল মজকুর এবং পরগণাদি নিরিখ মত বিলি বন্দোবস্ত হইত।

হেনকালে মুলুকের ম্লেচ্ছ অধিকারী।
সপ্তগ্রাম মুলুকের সে হয় চৌধুরী ॥
হিরণ্য দাস মুলুক নিল মোকতা করিয়া।
তাঁর অধিকার গেল মরে সে দেখিয়া ॥

বার লক্ষ দেন রাজায় সাধেন বিশ লক্ষ।
সেহ তুড়ুক কিছু না পাঞা হৈল প্রতিপক্ষ॥
রাজঘরে কৈফিতি দিয়া উজির আনিল।
হিরণ্য মজুমদার পলাইল রঘুনাথেরে বান্ধিল॥

চৈতন্য চরিতামৃত, অন্ত্যলীলা।

ইহাতে এই বুঝা যায় যে, মুসলমান চৌধুরীর সহিত নবাব সরকারের যে রাজস্ব বন্দোবস্ত ছিল হিরণ্য মজুমদার তাহার বেশী দিতে স্বীকার করিয়া চৌধুরীর হাত হইতে সপ্তগ্রাম সরকারের রাজস্ব সংগ্রহের ভার লইয়াছিলেন। চৌধুরী নিজ স্বার্থ রক্ষার জন্য কৈফিয়ৎ দিয়া অর্থাৎ হিরণ্য মজুমদারের বিরুদ্ধে আবেদন দ্বারা উজিরকে সরজমিনে আনিয়া দেখাইল যে, হিরণ্য নবাব সরকারে যেরূপ এজাহার করিয়া রাজস্ব সংগ্রহের ভার লইয়াছিলেন তাহা মিথ্যা—নতুবা হিরণ্য গোবর্দ্ধন পলাইবেন কেন। রঘুনাথ গোবর্দ্ধন মজুমদারের পুত্র, কৃষ্ণ প্রেমে উন্মত্ত মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য দেবের পরম ভক্ত। ইনিই সুপ্রসিদ্ধ রঘুনাথ দাস নামে খ্যাত। এই রঘুনাথ দাসের পাঠ এখনও সপ্তগ্রামে আছে। প্রতিবৎসর এখানে মহোৎসব উপলক্ষে বহু বৈষ্ণবের সমাগম হয়। কৃষ্ণপুরে উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরেরও একটী পাঠ প্রতিষ্ঠিত, তথায় দু'একটী বিগ্রহ আছেন।* সেখানেও মেলা মহোৎসবে বহু লোকের সমাবেশ হইয়া থাকে।

আইন আকবরী পাঠে অবগত হওয়া যায়—সমগ্র সপ্তগ্রাম সরকারের রাজস্ব ছিল ৪১৮১১৮৲ টাকা, কেবল আরসাদটুলি এবং সপ্তগ্রামের রাজস্ব ৫৮৭২।০ টাকা। ঐই আরসাদটোলী হইতে বোধ হয় পরে আর্ষা পরগণার নাম হইয়া থাকিবে। কিন্তু সপ্তগ্রাম

সরকারের অধীন পরগণাগুলি অধিকাংশই গঙ্গার পর পারে। চব্বিশ পরগণা এবং নদীয়ার অনেকটা এই সরকারের অধীন ছিল। শান্তিপুর, মুড়াগাছা, কলিকাতা মোকুমা, বার্ব্বাকপুর প্রভৃতি সপ্তগ্রাম সরকারের অন্তর্গত ছিল, এখন সপ্তগ্রাম আর্ষা পরগণার ভিতর।

প্রাচীন রোমকেরা সপ্তগ্রামকে গাঞ্জেস রেজিয়া বলিতেন। তাঁহারা এখান হইতে কার্পাসসূত্রনির্ম্মিত সূক্ষ্ম বস্ত্র এবং নানা প্রকার ছিট ও কৌষেয় বাস ইউরোপের বাজারে লইয়া গিয়া বহুমূল্যে বিক্রয় করিতেন। তদতিরিক্ত সোরা, নীল, লাক্ষা প্রভৃতি এদেশের বহু পণ্যই পৃথিবীর নানা স্থানে নীত হইত, তজ্জন্য নানা দেশের লোক সর্ব্বদা সপ্তগ্রামে আসা যাওয়া করিত এবং পুণ্যভূমি বলিয়া অনেক যতি, ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসীর এখানে সমাগম হইত। এই সময়ে সপ্তগ্রাম খুব গুল্‌জার ছিল। পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে সর্ব্বাগ্রে পর্ত্তুগিজেরাই সপ্তগ্রামে বণিক বেশে প্রবেশ করিয়া সপ্তগ্রামের উচ্ছেদ সাধনের মূলীভূত হইয়াছিল। তাহার বিস্তৃত বিবরণ পশ্চাৎ লিপিবদ্ধ হইবে। ষোড়শ শতাব্দীর অন্ত্যকাল পর্য্যন্ত সপ্তগ্রাম সমৃদ্ধিশালী ছিল, তাহাও পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে।

ত্রিবেণী।—ইহার পবিত্রতা ও তীর্থত্ব শাস্ত্রবাক্য দ্বারা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন হইয়াছে। প্রয়াগ যুক্তবেণীর ন্যায় এখানেও বেণীমাধব নামে শিব আছেন, তাঁহার বর্ত্তমান মন্দির ও ঘাট, উড়িষ্যার রাজা মুকুন্দ দেবের নির্ম্মিত। পাশ্চাত্য রোম প্রভৃতি সুদূরবর্ত্তী দেশের বাণিজ্যপোত ত্রিবেণী দিয়া প্রাচীন পাটলীপুত্র পর্য্যন্ত যাতায়াত করিত। হুগলীর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সম্রাট ফেরোকসার নিকট বাণিজ্য সনন্দ প্রাপ্ত হইলে তাঁহারা সে সংবাদ

ত্রিবেণীতে অগ্রসর হইয়া পাইয়াছিলেন বলিয়া এইখানে বহু তোপ-ধ্বনি করিয়াছিলেন। ত্রিবেণীর ন্যায় পণ্ডিতপ্রধান স্থান হুগলী জেলার মধ্যে খানাকুল কৃষ্ণনগর বই আর ছিল না। সার্ উইলিয়ম জোন্সের সংস্কৃত ভাষার শিক্ষক ৺ জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের বাসস্থান ত্রিবেণী—তিনি শ্রুতিধর বলিয়া প্রসিদ্ধ। এখানে অনেক চতুষ্পাঠী ছিল।

নদীয়ায় নবদ্বীপ যেমন হুগলীতে ত্রিবেণী এবং খানাকুল কৃষ্ণ-নগর সেইরূপ। অনেকে ত্রিবেণী ও সপ্তগ্রামের অভেদ কল্পনা করিতেন। বঙ্গীয় কবিগণের পূর্ব্বোক্ত শ্লোকগুলিই তাহার প্রমাণ।

পাণ্ডুয়া।—হুগলী সহর হইতে ১৪ মাইল দূরে এই গ্রাম অবস্থিত। এখানে ই, আই, রেলপথের একটী ষ্টেশন আছে। পাণ্ডুয়া যে হিন্দুরাজার প্রতিষ্ঠিত নামেই তাহার পরিচয় দিতেছে। পাণ্ডু—সংস্কৃত শব্দ। প্রবাদ এইরূপ যে পাণ্ডু নামে কোন রাজা ইহার প্রতিষ্ঠাতা ইনি বুদ্ধদেবের পিতৃব্যপুত্র। পাণ্ডুয়ায় এখন অধিকাংশ মুসলমানই বাস করিয়া থাকে। বড় বড় অট্টালিকার ধ্বংসাবিশিষ্ট কতই স্তূপ যে আছে, তাহা বলা যায় না। রেল ষ্টেশন হইতে গ্রামের ভিতর পর্য্যন্ত সেই সকল স্তূপ যেন ডাকিয়া হাঁকিয়া হিন্দুর অতীত কীর্ত্তির পরিচয় দিতেছে। কত বড় বড় দীঘি, পুষ্করিণী তাহার পোষকতা করিতেছে, তাহাদের অধিকাংশই হিন্দুর খনিত। শাস্ত্রানুসারে হিন্দুকে উত্তর দক্ষিণে লম্বা জলাশয় খাত করিতে হয়। সমচতুষ্কোণ করিলেও যে ক্ষুদ্র খাতটীতে যূপ কাষ্ঠ স্থাপন করিতে হয়, সেই ক্ষুদ্র খাতটীকে চলিত কথায় রৈখাত বা রৈভাঁড়ার বলে, তাহা উত্তর দক্ষিণে লম্বা না করিলে প্রতিষ্ঠার কার্য্য পণ্ড হয়। পাণ্ডুয়ার পীরপুকুর তাহার সাক্ষ্য দিতেছে, ইহার

নাম পীরপুকুর হইলেও হিন্দুর খনিত না হইলে উত্তর দক্ষিণে লম্বা হইত না। মুসলমান তাহার নাম দিয়াছে পীরপুকুর, পূর্ব্বে ইহার অন্য কোন নাম ছিল। এই সকল কীর্ত্তি কলাপ এক দিনে হয় নাই, প্রতিষ্ঠিত হইতে যে কত কাল গিয়াছিল কে বলিয়া দিবে? হিন্দুর সেই সকল কীর্ত্তিকেতন আজ ধূলায় লুণ্ঠিত—ছিন্ন ভিন্ন। তাহারা হিন্দুর কত আদরের ধন, কতই যত্নে রক্ষিত হইত। প্রতিষ্ঠাতা পাণ্ডুশাক্যের পর হইতে কত রাজাই এথানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহাতে কত ক্রীড়া কৌতুক, কত আনন্দোৎসবের তরঙ্গ উঠিত। দুই সহস্রাধিক বর্ষকাল—অল্প নহে, এই সুদীর্ঘ সময় মধ্যে দুই একটী করিয়া কত কীর্ত্তিই সঞ্চিত হইয়াছিল, কত কাল সেই সকল কীর্ত্তিমান পুরুষেরা এই সকল বৈভব ভোগ করিয়াছিলেন, ভাবিলে চক্ষে জল আইসে। আজ সেই সকল কীর্ত্তিচিহ্ন খুঁজিয়া বাহির করিতে হইতেছে, ইহার অপেক্ষা আক্ষেপ-কথা কি আছে। হিন্দুর হৃদয় পাষাণময় তাই এথনও বিদীর্ণ হয় নাই।

পাণ্ডুশাক্যের বংশধরগণের মধ্যে পাণ্ডুদাস আমতার অধীন পেঁড়ো বসন্তপুরে রাজ্য স্থাপন করিয়া তথায় রাজত্ব করিতেন, আপন বংশের নাম রক্ষার জন্যই পাণ্ডুদাস ইহার নাম রাখিয়াছিলেন পাণ্ডুয়া—তাহার অপভ্রংশ পেঁড়ো। রাঢ়ীয় কুল পঞ্জী বিশেষ প্রামাণিক গ্রন্থ, তাহাতে লিখিত আছে—

আদিশূরো ভূশূরশ্চ ক্ষিতিশূরোঽবনীশূরঃ।
ধরণী শূরকশ্চাপি ধরাশূরো রণাশূরঃ॥
এতে সপ্তশূরাঃ প্রোক্তাঃ ক্রমশঃ সুতবর্ণিতাঃ।
বেদবাণাঙ্গশাকেতু নৃপোঽভূচ্চাদিশূরকঃ।
বসুকর্ম্মাঙ্গিকে শাকে গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ॥

শূরবংশীয় আদিশূর, তৎপুত্র ভূশূর, তৎপুত্র ক্ষিতিশূর, তৎপুত্র অবনীশূর, তৎপুত্র ধরণীশূর, তৎপুত্র ধরাশূর, তৎপুত্র রণশূর, এই সপ্তশূরবংশীয় রাজা। ভূশূরের পুত্র ক্ষিতিশূর ব্রাহ্মণদের গাঞী সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করেন। যথা—

ক্ষিতিশূরেণ রাজ্ঞাপি ভূশূরেণ সুতেনিচ।
ক্রিয়তে গাঞী সংজ্ঞানি তেষাং স্থান বিনির্ণয়েৎ॥

তিনিই রাঢ়ীয় ব্রাহ্মগণকে ৫৬ খানি এবং সপ্তশতীগণকে ২৮ খানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন।

এই জন্যই প্রবাদ বাক্য,—

পঞ্চগোত্র ছপ্পান্ন গাঁঞী।
এ ছাড়া বামুন নাই॥

সপ্তশতীরা এ দেশের পূর্ব্বাধিবাসিত ব্রাহ্মণ। যে সময়ের এই প্রবাদবাক্য, সে সময় সাতশতিরা তাঁহাদের সঙ্গে মিলিতে পারেন নাই। আজকাল সপ্তশতিরা তাঁহাদের সঙ্গে বেশ মিশিয়া গিয়াছেন।

ভূশূরের হস্ত হইতেই পাল-বংশীয়েরা পুণ্ড্রবর্দ্ধনের রাজ্যাধিকার কাড়িয়া লয়েন এবং ভূশূর সেখান হইতে আসিয়া দক্ষিণ রাঢ়ে অবস্থিতি করেন। তাঁহার সঙ্গে অনেক ব্রাহ্মণ এদেশে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই রাঢ়ীয় সংজ্ঞা হইয়াছিল। যাঁহারা বরেন্দ্র ভূমিতে রহিয়া যান, তাঁহারাই বারেন্দ্রাখ্যা পাইয়াছিলেন। ভূশূরের সঙ্গে যে সকল ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন তাঁহারা রাঢ়ের নানা স্থানে বসতি বিস্তার করেন। ক্ষিতিশূর তাঁহাদিগকে যে ছাপ্পান্ন খানি গ্রাম দিয়াছিলেন সেই সমস্ত গ্রাম প্রায় রাঢ় দেশের অন্তর্গত।

শূরবংশীয়েরা পাঁচ পুরুষ মাত্র রাঢ় দেশে রাজত্ব করিলে

দাক্ষিণাত্যের অধিপতি রাজেন্দ্র চোল রণশূরকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকার করেন। তিরুমলয় গিরির শিলা লিপিতে ইহাই খোদিত আছে। এই শিলালিপি দশম শতাব্দীতে খোদিত। কেহ কেহ বলেন—রাজেন্দ্র চোল ১০১৫ খৃষ্টাব্দে রণশূরকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। ইহা কেমন করিয়া সম্ভাবিতে পারে।

সপ্তগ্রামে মুসলমান রাজত্ব সংস্থাপিত হইবার দুইশত বৎসর পরে খৃঃ ১৪৭৮ অব্দে পাণ্ডুয়া মুসলমানদের হস্তগত হয়। * সেখানকার হিন্দুদেবমন্দিরগুলি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ধূলিসাৎ হয়, হিন্দুরাজা বিধ্বস্ত হইয়া মুসলমানগণের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হয়েন, অথবা অন্যত্র পলাইয়া আত্মরক্ষা করেন। তৎপরে পাণ্ডুয়ায় মুসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। পঙ্গপালের ন্যায় মুসলমান আসিয়া পাণ্ডুয়ায় বাস করিতে থাকে। পাণ্ডুয়ার ব্রাহ্মণ সজ্জন পলাইয়া নিকটবর্ত্তী ইলছোবা, মণ্ডলাই, পোটবা, বেলুন প্রভৃতি স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সময়েই পোটবায় রাজা নন্দ কুমার চৌধুরী রাজত্ব করিতেন। তাঁহার গড় ছিল, এখনও তাহার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি অনেক কুলীন ব্রাহ্মণকে পোটবায় স্থাপিত করিয়াছিলেন। পোটবার ঘটক-বংশ বহু কালের প্রতিষ্ঠিত, সমাজে তাঁহাদের মান-গৌরব যথেষ্ট আছে।

এখন পাণ্ডুয়ায় আছে কি? একটী পাঁচতলা মিনার বা স্তম্ভ, আর দুই তিনটী মসজিদ। মসজিদগুলি এখন ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যাওয়ায় হিন্দুকীর্ত্তিগুলি বাহির হইয়া পড়িয়াছে। অনেকে মনে

* সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা সন ১৩১৫ সাল—৩১ পৃষ্ঠ।

করেন হিন্দুরাজাদের নির্ম্মিত অট্টালিকার উপকরণগুলি লইয়া মিনারটী রচিত হইয়াছে। বাস্তবিক তাহা নহে, উহা হিন্দুরাজাদেরই নির্ম্মিত। মুসলমান এরূপ স্তম্ভ কোথাও নির্ম্মাণ করিয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। কাশীর বেণীমাধবের মন্দির ভাঙ্গিয়া তাহার উপকরণে যে মুসলমানের কীর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে দুটী মিনার থাকিলেও নীচে চতুষ্কোণাকারে ভজনাগার আছে, পাণ্ডুয়ার মিনারে তাহা নাই। নিম্নতল হইতেই উহা গোলাকার, ব্যাস ৬০ ফিট, ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইয়া পাঁচতোলার উপর ১৫ ফিট মাত্র। প্রত্যেক তলায় এক একটী ক্ষুদ্র দ্বার এবং তাহার সম্মুখে সংকীর্ণ বারন্দা। মিনারের উচ্চতা ১৩৬ ফিট ১৬১টী সিঁড়ি। * হিন্দু মুসলমানে এমন কোন যুদ্ধ বিগ্রহ হয় নাই যে তাহার জয়স্মৃতি রক্ষার জন্য এত বড় একটা স্তম্ভ রচনা করিতে হয়। সুপ্রসিদ্ধ সপ্তগ্রামবিজেতা জাফর খাঁর বিজয়স্মৃতি তাঁহার সমাধিটী মাত্র। সেকালের হিন্দু রাজারা প্রাতঃকালে উঠিয়া রাত্রি থাকিতে সূর্য্যদর্শন মানসে এক একটী ঐরূপ স্তম্ভ রচনা করিতেন। আরামবাগ এলাকায় মায়াপুর গ্রামের পাচ্ছাই দীঘির পশ্চিমে যে একটী ভগ্ন অট্টালিকার স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে তাহার উপর দুইটী ভগ্ন স্তম্ভ দুই তিন তালারও উচ্চ দেখা গিয়াছে। সেখানকার প্রবাদ—প্রতিদিন রাজা রাণী ও রাজার এক বিধবা কন্যার প্রতিদিন প্রাতে সূর্য্যদর্শন জন্য ঐ স্তম্ভ গঠিত হইয়াছিল। ভোলানাথ চন্দ্র মহাশয় জনশ্রুতির উপর নির্ভর

---

* ঐতিহাসিক চিত্র, ১৩১৫ সাল ৪৮৫ পৃষ্ঠা।

করিয়াই তাঁহার হিন্দুর দেশ ভ্রমণ নামক গ্রন্থে উহা মুসলমানের বলিয়া গিয়াছেন।

পাণ্ডুয়ার মিনারের সম্মুখে বাইশ দরজা মসজিদ, ইহাকেও একটী দেবমন্দির বলিয়া চিনিতে পারা যায়। উহার মধ্যে কৃষ্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত, কারুকার্য্য খচিত কয়েকটী স্তম্ভ শ্রেণীবদ্ধ রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে তদ্রূপ প্রস্তর রচিত আরও একটী বেদিকা আছে, দেখিলেই মনে হয় যেন বিগ্রহমূর্ত্তি এই মাত্র তাহা হইতে স্থানান্তরিত হইয়াছে। তাহাতে উঠিবার সোপানগুলিও সুন্দর প্রস্তর নির্ম্মিত। এই মসজিদের সম্মুখে সরকারী রাস্তার অপর দিকে একটী মসজিদ। তাহার অবস্থা ভাল নহে, নষ্ট হইবার মত হইলেও মুসলমানেরা এখনও তাহাতে নামাজ পড়ে। খোদিত লিপিযুক্ত এক শিলাখণ্ড কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইহা হইতে স্খলিত হইলে এক্ষণে তাহা সাহাসুফী নামক পীরের সমাধি পাশে রাখা হইয়াছে। এই সাহাসুফীই পাণ্ডুয়ার বিজেতা—উহার একদিকে একটী সূর্য্যমূর্ত্তি এবং অপর দিকে খোদিত লিপি, তাহাতে লিখিত আছে যে, খৃঃ ১৪৭৮ অব্দে সমসুদ্দিন ইউসুফ সাহের সেনাপতি কর্ত্তৃক পাণ্ডুয়ায় হিন্দুরাজত্বের বিলোপসাধন এবং হিন্দু দেবদেবীর বিগ্রহগুলির দুরবস্থা সংঘটিত হইয়াছে। মূর্ত্তিগুলি ভাঙ্গাচুরা হইয়া নানা রূপে নানা স্থানে রহিয়া গিয়াছে। অতি অল্প দিন হইল রাজাপুকুরের পঙ্কোদ্ধার কালে কয়েকটী হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি ভাগ্নাবস্থায় পাওয়া গিয়াছিল। রাজাপুকুরে এখনও অনেকে সিন্নি ভাষায়, যে যাহা কামনা করিয়া সিন্নি ভাষায়, তাহা পূর্ণ হইবার হইলে, সিন্নি ফিরিয়া আসে। হিন্দু-রাজার পুকুরে কিরূপে পীরের বজরকী আসিল, ইহা কি হিন্দু

দেবতার মাহাত্ম্য—না, পীরের জহুরা? রাজার পুকুরে এক কুম্ভীর আছে, তাহাকে ডাকিলে আসে, পায়রা, মুরগী দিলে তাহা ধরিয়া খায়। গড় মান্দারণেও এইরূপ একটা কুম্ভীর আছে, পূর্ব্বে দুইটা ছিল—একটা মরিয়াছে, ইহাদের নাম ছিল "সাদারী মাদারী"।

পাণ্ডুয়ার পরিসর প্রায় চারি ক্রোশ, পূর্ব্বে এখানে সাত শত ঘর আয়মাদারের বাস ছিল, এখন ২০।২৫ ঘর মাত্র অবশিষ্ট। কিছু দিন পূর্ব্বে মুন্সেফী ইঁহাদের একচেটে ছিল। নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানেরা অতি উৎকৃষ্ট কাগজ প্রস্তত করিত। পূর্ব্বে এখানে একটী মুন্সেফী আদালত ছিল এখন একটী পুলীশ ষ্টেশন ও সবরেজেষ্ট্রী আপিশ মাত্র আছে।

ভূরিশ্রেষ্ঠ বা ভুরস্থট—ইহার রাজধানীও পাণ্ডুয়া, অনুমান হয় ভূরিশ্রেষ্ঠ পূর্ব্বে একটী প্রসিদ্ধ বাণিজ্য বন্দর ছিল, ইহা দামোদর তীরে অবস্থিত, এখনও দে-ভুরস্থট নামক গ্রাম তাহার পরিচয় দিতেছে। অধুনা যেমন আমতা পর্য্যন্ত দামোদরে জোয়ারের জল যায়, সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে তাহা যে ভুরস্থট পর্য্যন্ত যাইত সে পক্ষে সন্দেহ করা চলে না। শ্রেষ্ঠী শব্দের অর্থ বণিক, যে স্থানে বহু বণিকের বসতি তাহার নাম ভূরিশ্রেষ্ঠ। ভূরিশ্রেষ্ঠের অপভ্রংশে যে ভুরস্থট নামের উৎপত্তি তাহা বলাই বাহুল্য, কেন না এখন পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে উহাকে ভূরিশ্রেষ্ঠই বলিয়া থাকেন। এই ভুরস্থট মুসলমানদের আমলে একটী পরগণা হইয়াছিল। পাণ্ডুয়া শব্দের অপভ্রংশে পেঁড়ো—হুগলীর সন্নিহিত পাণ্ডুয়ারও চলিত ভাষায় ঐ নাম হইয়াছে। বুদ্ধ দেবের পিতৃব্য

অধিকার পূর্ব্বক বসন্তপুরের নিকট রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন এবং আপন বংশের নাম রক্ষার জন্য তাহার নাম রাখেন পাণ্ডুয়া। দশম শতাব্দীতে পাণ্ডুদাস এথানে রাজত্ব করিতেন। তাঁহারই অনুরোধে বলরাম নামক এক ব্রাহ্মণের পুত্র শ্রীধর ভট্ট ন্যায়-কন্দলীর টীকা রচনা করেন। এই সময়ে গৌড়ে পাল রাজগণ রাজত্ব করিতেন। পাণ্ডুদাস তাঁহাদের অধীনে ছিলেন কি স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেন, বলা যায় না। তাঁহার রাজ্য পাণ্ডুয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, সম্ভবতঃ তিনি কাহাকেও কর দিতেন না। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও ভুরসুট স্বাধীন রাজ্য ছিল। বর্দ্ধমানের মহারাজা কীর্ত্তিচন্দ্র উক্ত রাজ্য অধিকার করিয়া মুসলমান রাজ্যের অন্তর্গত করেন। * তখন পাণ্ডুয়ায় পাণ্ডুদাসের বংশধরেরা রাজত্ব করিতেন না। আনুমানিক খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে ভরদ্বাজ গোত্রীয় মুখোপাধ্যায় উপাধিধারী মদন নামক ব্রাহ্মণের বংশধরেরা ভুরসুটে রাজত্ব করিতেন। মদনের পুত্র রাঘব, রাঘবের পুত্র দেবানন্দ, দেবানন্দের পুত্র প্রয়াগ, প্রয়াগের পুত্র জগদীশ, জগদীশের পুত্র গোপাল, গোপালের পুত্র রামনারায়ণ, রামনারায়ণের পুত্র রাম-

---

* Kirtti Chandra Rai inherited the ancestral Znmindari and added to it the Perganas of Chetwa, Bhursut, Barda and Manohar Sahi. He was bold and adventurous and fought with the Rajás of Chandrakona and Barda, and dispossessed them of their petty kingdoms.—Hunters Statistical account of Bengal Page 141.

কান্ত, † রামকান্তের পুত্র নরেন্দ্রনারায়ণ, নরেন্দ্রনারায়ণের পুত্র বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ কবি ভারতচন্দ্র রায়। বর্দ্ধমানের মহারাজা কীর্ত্তিচন্দ্র বাহাদুরের সহিত মনান্তর সূত্রে তিনি রাজা নরেন্দ্রনারায়ণের দুর্গ আক্রমণ করিয়া তাঁহার ধন সম্পত্তি লুণ্ঠন করেন। তদবধি ভুরসুট মুসলমানের অধিকারে আইসে। কবি ভারতচন্দ্র স্বীয় অন্নদামঙ্গলে এইরূপ পিতৃপরিচয় দিয়াছেন,—

ভুরসুট পরগণায়, নৃপতি নরেন্দ্ররায়,
মুখটী বিখ্যাত দেশে দেশে।
ভারত তনয় তাঁর, অন্নদা-মঙ্গল সার,
কহে কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে॥

অন্নদা-মঙ্গল।

নরেন্দ্রনারায়ণকে দিয়াই ভুরসুট পরগণার রাজপাট উঠিয়া যায়। তাঁহার বংশধরেরা গৃহস্থ ব্রাহ্মণরূপে অদ্যাপি পেঁড়ো বসন্তপুরে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে কালিপদ রায় নামক এক ব্যক্তি কিয়দ্দিন হইল লোকান্তরিত হইয়াছেন, তিনি হাওড়ায় মোক্তারী করিতেন।

পেঁড়ো বসন্তপুরের নিকট "গলে" নামে এক গ্রাম আছে। ভূরিশ্রেষ্ঠ সংকালে বাণিজ্যবৈভবে বৈভবান্বিত তখন তথায় গলে প্রস্তুত হইত বলিয়া ইহার নাম গলে হইয়া থাকিবে।

সিঙ্গুর—এই গ্রামখানি শ্রীরামপুর মহকুমার অন্তর্গত। এখানে তারকেশ্বর রেলপথের একটি ষ্টেশন আছে। সিংহলের মহাবংশ নামক পালী ভাষায় লিখিত ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে দক্ষিণ রাঢ়ের সিংহবাহু নামক রাজার পুত্র বিজয় তথায় উপস্থিত

† ইনিই সর্ব্ব প্রথম রাজ্যাধিকার স্থাপিত করেন।

হইয়া রাজ্য স্থাপন করেন। সিংহবাহুর রাজধানী ছিল সিংহপুর। উহা সিংহরণ নদীর তীরে—অনেকেই অনুমান করিয়া থাকেন যে সিঙ্গুরই সিংহবাহুর রাজধানী ছিল, এখানে একটী নদীর চিহ্নও দেখিতে পাওয়া যায়, সম্ভবতঃ তাহাই সিংহরণের স্মৃতি এখনও রক্ষা করিতেছে—কিন্তু আর পারে না। সুপ্রসিদ্ধ কবি কালিদাস সিংহপুর হইতে সিংহলে গমন করিয়া সেখানকার রাজ-কবি কুমার দাসের রচিত

সিয়, তাঁবরা, সিয় তাঁবরা, সিয় সেবনী।
সিয়-সমুরা নিদিন লেবাতন সেবেনী॥

এই শ্লোকের দুই পাদ পূরণ করিয়া তিনি বারাঙ্গনাহস্তে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় অনুমান করেন—

বন কোবরা তল নোতনা রোনট্‌বণী।
মন দেদরাপণ গলবা গিয়ে সুবেণী॥

বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মতে ইহা যদি ষষ্ঠ শতাব্দীর বাঙ্গালা হয়, তাহা হইলে হুগলী জেলা সংস্কৃত ও প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের মহামূল্যমণি প্রসব করিয়াছিল বলিয়া চিরস্মরণীয় হইতে পারিবে। কিন্তু ইহা এখনও অনেক আলোচনার বিষয়ীভূত। এই সকল বিষয় বাঙ্গালা সাহিত্যে লিপিবদ্ধ থাকিলে উত্তরকালে ইহার প্রকৃত তথ্য প্রকাশিত হইতে পারিবে।

সিঙ্গুরে এখনও গড় আছে—গড়খাতে জল আছে—বড় বড় অট্টালিকার ভগ্ন স্তূপও না আছে এমন নহে। দশশালা বন্দোবস্তের কিয়দ্দিন পরে এখানকার জমিদার ৺দ্বারকানাথ সিংহের নামও পাওয়া যায়*। তাঁহার অনেক জমিদারী ছিল, সংকীর্ত্তিও আছে। স্বর্গীয় শ্রীনাথ বাবু নবাব বাবু নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। বর্ত্তমান বংশধর

শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বর্ম্মণ। শিয়াড়শোলের মালিয়া উপাধিধারী জমিদার বংশ পূর্ব্বে এই গ্রামেই বাস করিতেন। এখানে ও এখানকার নিকটবর্ত্তী গ্রামগুলিতে অনেক সৎব্রাহ্মণের বাস আছে—একটী উচ্চ শ্রেণীর স্কুল, ডাকঘর ও পুলিশ ষ্টেশন গ্রামের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে।

উজ্জয়িনী, উজানি—জেলা বর্দ্ধমানের মধ্যে মঙ্গলকোট থানার অন্তর্গত অজয়তীরবর্ত্তী কো-গ্রাম প্রাচীন উজানি নগর। এখানে বিক্রমকেশরী নামে রাজা রাজত্ব করিতেন। ধনপতি দত্ত নামে এক সদাগর রাজার আদেশানুসারে সিংহলে বাণিজ্যার্থে গিয়া তথায় বন্দী হয়েন, দ্বাদশবর্ষ পরে তাঁহার পুত্র শ্রীমন্ত সদাগর পণ্যদ্রব্য লইয়া সিংহলে গিয়া পিতার উদ্ধার সাধন করেন। প্রায় চারিশত বর্ষ হইল বঙ্গের অমর কবি দামুন্যানিবাসী কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী স্বীয় চণ্ডীকাব্যে তাহা সুললিতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি উজানির পরিচয়চ্ছলে লিখিয়াছেন—

উজানি নগর, অতি মনোহর,
বিক্রমকেশরী রাজা।
করে শিব পূজা, উজানির রাজা,
কৃপা কৈলা দশভূজা॥
যেন রঘু রাজা, তেন পালে প্রজা,
কর্ণের সমান দাতা।
যুধিষ্ঠির বাণী, শুকদেব জ্ঞানী,
তাহারে প্রসন্ন মাতা॥

---

* The principal purchasers of the lats sold on the Board were Dwarka Nath Singh of Singur, Chhaku Singh of

উজানির কথা, গড় চারি ভিতা,
চৌদিকে বেউড় বাঁশ।
রাজার সামন্ত, নাহি পায় অন্ত,
যদি ভ্রমে একমাস॥
মহা ধনুর্দ্ধর, দিব্য কলেবর,
নারদ সমান গান।
শুনে অবিরত, পুরাণ ভারত,
দ্বিজে দেয় হেম দান॥

কবিকঙ্কণ চণ্ডী।

কবিকঙ্কণ কিঞ্চিদূন চারিশত বর্ষের কবি—তাঁহার চণ্ডী কাব্যে যে সকল বিষয়ের বর্ণনা আছে, তাহা তাঁহার সমকালিক। তাঁহার চণ্ডী রচনার বহু পূর্ব্ব হইতে মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি দেবীর ব্রত কথায় শ্রীমন্ত সদাগরের উপাখ্যান চলিয়া আসিতেছে। কবিকঙ্কণ তাহাই অবলম্বন করিয়া আপনার লিপিকৌশলগুণে অপূর্ব্ব কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। ধনপতি ও শ্রীমন্ত সদাগরের সময় নিরূপণ করিতে হইলে একটী বৃহৎ প্রবন্ধের অবতারণা করিতে হয়। মোটামুটী এই বুঝিতে পারা যায়—যে যৎকালে এখানে শৈব ধর্ম্মের যথেষ্ট প্রভুতা প্রতিপত্তি ছিল, তৎকালে রাজা বিক্রমকেশরীর প্রাদুর্ভাব। শৈব ধর্ম্মের আধিপত্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা কালে অর্থাৎ যে সময় সেনরাজগণ এদেশে আধিপত্য করিতেন সে সময়ে মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতকথা বা অন্য যে কোন ব্রতকথা কবিকঙ্কণের অবলম্বন হউক তাহাতে ধনপতির বা তৎপুত্রের সিংহল যাত্রার বিবরণ ছিল—সিংহল যাত্রার পথ কবির স্বকপোলকল্পিত। ধনপতি যে পথে সিংহল যাত্রা করিয়াছিলেন

সে পথ ত্রিবেণী হইতে সরস্বতী নদী দিয়া। এখনও তাহার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীরামপুর মহকুমার চণ্ডীতলার অপর পারে বুইতার সরস্বতী তীরে স্থাপিতা চণ্ডী হইতেই সম্ভবতঃ চণ্ডীতলা গ্রামের নাম। শ্রীমন্ত সদাগর প্রতিদিন যে চণ্ডীর পূজা করিতেন তাহার নিদর্শন বুইতাগ্রামের চণ্ডীই প্রতিপন্ন করিতেছেন। সরস্বতী তীরবর্ত্তী বুইতাগ্রামে শ্রীমন্ত সদাগরের ঘটস্থাপিত চণ্ডী আছেন। সেই চণ্ডীর ঘট একটী প্রকাণ্ড বৃক্ষমূলে এরূপভাবে প্রতিষ্ঠিত যে বৃক্ষের শিকড়গুলি ঘটটিকে আবৃত করিয়া যেন একটী ক্ষুদ্র গৃহমধ্যে রাখিয়াছে—রোদ শিশির ও জল লাগিতে পায় না। পূজক ব্রাহ্মণ ফুল চন্দন জল দিতে পারেন এরূপ ফাক আছে। দেবীর সেবার জন্য অনেক জমি ছিল। অদ্যাপি সকলে তাঁহাকে শ্রীমন্ত সদাগরের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া জানে। তৎকালে সরস্বতী নদী দিয়াই সমুদ্রযাত্রার পথ ছিল। সরস্বতী তখন বিপুলাঙ্গী—বড় বড় অর্ণবপোত অনায়াসেই বক্ষে ধারণ করিতে পারিত। প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য প্রত্নতাত্ত্বিক টলেমী বলেন—সেকালে জলপথে আসিতে হইলে ফলতা হইয়া ত্রিবেণীতে আসিতে হইত। কারণ সরস্বতীর প্রসার খুব ছিল, তাহা দিয়া যখন ত্রিবেণী ও সপ্তগ্রামের পথে জাহাজ চলিত তখন সেই পথই সোজা ও সুগম ছিল। কেন আর জলপথের পথিকেরা কালিকাতার নিকট দিয়া ঘুরিয়া যাইবে। কবিকঙ্কণ যখন তাঁহার চণ্ডীকাব্য লিখিয়াছিলেন তখন সরস্বতী স্বল্পতোয়া হইয়া গিয়াছিল—ত্রিবেণী হইতে জগদ্দল খড়দহ বৈদ্যবাটীর পথ প্রকাশ পাইয়াছিল, সুতরাং তাঁহাকে মনে করিতে

উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমকেশরী বৌদ্ধদিগের তান্ত্রিকধর্ম্ম আশ্রয়ের সমসময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। উজ্জয়িনীতে এখনও বড় বড় অট্টালিকার ভগ্নাবশিষ্ট স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়—স্থানটী দেখিলেই মনে হয়—এককালে বিপুল বিভবান্বিত ছিল। তৎ-কালে সমাজে বণিকগণের প্রভূত প্রতিষ্ঠা দেখা যায়। রাজা বিক্রমকেশরী ধনপতি সদাগরের সহিত পাশা খেলিতেন তাঁহাকে ভ্রাতৃ সম্বোধন করিতেন ও আলিঙ্গন দিতেন,—

পাত্রের ইঙ্গিত রাজা বুঝিলা অন্তরে।
ধনপতি ভায়া যাও গৌড় নগরে॥

কবিকঙ্কণ চণ্ডী।

অন্যত্র—তুমি গেলা পরবাস, দুঃখ পাইলে বারমাস,
দূরে গেল পাশার কৌতুক।
দেখিতে লাগয়ে সাধ, কত কর্ম্ম গেল বাদ,
শারীশুক দিল এত দুঃখ॥

অন্যত্র—লক্ষ তঙ্কা দিল ধন, দিল নানা আভরণ,
বিদায় চাহিল সদাগর॥
সম্ভ্রমে উঠিয়া রাজা দিল আলিঙ্গন।
ভাই বলে কোল দিল পাত্রমিত্রগণ॥

ঐ ঐ

প্রাচীন রাঢ়ের বাণিজ্যতত্ত্ব কবিকঙ্কণের চণ্ডী পাঠে অবগত হইতে পারা যায়। বঙ্গবাসী সমুদ্রযাত্রায় ভয় করিত না। রাজা বিক্রমকেশরী একদিন পুরাণে শুনিলেন,—

পাঠকে পুরাণে কহে জ্যৈষ্ঠের মহিমা।

যেই জন চন্দনে করয়ে শিব পূজা।
কত জন্ম অবনী মণ্ডলে হয় রাজা॥
শিবের মন্দিরে যেবা করে শঙ্খধ্বনি।
অভিপ্রায় বুঝি তার শিব হয় ঋণী॥
চামর ঢুলায় যেবা হরি সন্নিধানে।
স্বর্গলোকে চলি যায় চড়িয়া বিমানে॥

কবিকঙ্কণ চণ্ডী

রাজা ভাণ্ডারীকে শঙ্খ চন্দন আনিতে বলিলেন, ভাণ্ডারী যৎকিঞ্চিৎ চন্দন দিয়া ভাণ্ডারের অবস্থা জানাইলেন,—

অবধান কর রায়, নিবেদি তোমার পায়,
চন্দন নাহিক এক তোলা।
কত সাধু ছিল ঋণী, এবে সবে হৈল ধনী,
সম্পদে মাতিয়া হৈল ভোলা॥
বিংশতি বৎসর হৈল, রঘুপতি দত্ত মৈল,
ডিঙ্গা ভরে আনিত চন্দন।
আর কত সদাগর, তিলেক না ছাড়ে ঘর,
না পায় চন্দন অন্বেষণ॥
হাতীশালে হাতী মরে, মাহুত হুতাশ করে,
লবঙ্গ নাহিক জায়ফলে।
সৈন্ধব বিহনে ঘোড়া, নিত্য মরে জোড়া জোড়া,
শঙ্খ নাহি বাজে পূজাকালে॥
ভাণ্ডারে নাহিক লীলা, বসান নিকর শিলা,

যতেক চামর ছিল, সব পুরতান হৈল,
যেন উড়ে সিমুলের তুলা ॥
চামর পামর ভোট, সগল্লাত গজ ঘোট,
এক দ্রব্য নাহিক ভাণ্ডারে।
শঙ্খ পরিবার তরে, রামাগণ সাধ করে,
পিত্তল ভূষণ পরে করে ॥

ঐ ঐ

তৎকালিক বাণিজ্যের অবস্থা ব্যবস্থা অনেকটা উপরিউক্ত কবিতায় বুঝিতে পারা যায়, বিদেশীয় পণ্যের আবশ্যকতাও জানা যায়। সাত্ত্বিক হিন্দুর যাহা নিতান্ত না হইলেই চলে না তাহারই কথা উহাতে আছে। সাটিন, কিংখাপের কথা উহাতে থাকিবে কেন, দেশেই তাহা মিলিত, শুধু তাহাই নহে, বিদেশের অভাবও মিটাইত। সদাগর যে যে দ্রব্য এদেশ হইতে বিনিময়ার্থ সিংহলে লইয়া গিয়াছিলেন, তাহা আমরা কবির ভাষায় শুনাইবার জন্য কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতেই সিংহলের বাণিজ্য দ্রব্যজাতের পরিচয় পাওয়া যাইবে।

কুরঙ্গ বদলে তুরঙ্গ পাব,
নারিকেল বদলে শঙ্খ।
বিড়ঙ্গ বদলে লবঙ্গ পাব,
শুণ্ঠীর বদলে টঙ্ক ॥
প্লবঙ্গ বদলে মাতঙ্গ পাব,
পায়রার বদলে শুয়া।
গাছ ফল বদলে জায়ফল পাব,
বহেড়ার বদলে গুয়া ॥

পাটশণ বদলে চামর পাব,
কাচের বদলে নীলা।
লবণ বদলে সৈন্ধব পাব,
জোয়ানী বদলে জিরা॥
আকন্দ বদলে মাকন্দ পাব,
ধুতির বদলে গড়া।
শুকুতা বদলে মুকুতা পাব,
ভেড়ার বদলে ঘোড়া॥
হরিতাল বদলে গোরচনা পাব,
শুলফার বদলে মেথী।
আফিঙ্গ বদলে হিঙ্গ পাব,
জোড়ের বদলে ধুতি॥
চিনির বদলে দানা কর্পূর,
আলতার বদলে মাটি।
সগন্নথে গঙ্গার কম্বল পরি,
বদল করিব পাটী॥
যব খড়িয়া সার্ষপ মসুর,
তিল মুগ লইয়া ছোলা।
কিনিয়া বহুতর অন্যান্য সফর,
বদল পাত্যাছি গোলা॥
মাষ মসুরী তণ্ডুল বদরী
বরবটী পাটুন চিনা।
বদলে শকটে ঘৃত তৈল ঘটে

ইহাতে বাণিজ্য দ্রব্যের বিশেষ পরিচয় মিলিতেছে। এ দেশের উৎপন্ন পণ্য এবং বিদেশের পণ্য বেশ চিনিয়া লওয়া যাইতেছে।

মান্দারণ বা গড় মান্দারণ।—এই জেলার আরামবাগ মহকুমার চারিক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। মধ্যে প্রায় আড়াই ক্রোশ বিস্তৃত ভিকদাসের মাঠ এবং গোঘাট, কাঁটালী প্রভৃতি গ্রাম। নবাসনে যে ত্রিকোণমিতিক জরিপ স্তম্ভ আছে, সেখান হইতে মান্দারণের পশ্চিমদিক পর্য্যন্ত দুর্গপ্রাকার কোথাও দুতলা, কোথাও তিনতলা সমান উচ্চ, এইরূপ প্রাকার প্রায় তিন মাইল হইবে। ইহার ভিতর মান্দারণের প্রাচীন প্রাসাদ ও ভগ্নস্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। দেখিলেই মনে হয়, ইহা কত কাল পূর্ব্বে, কত প্রবল প্রতাপান্বিত হিন্দু নরপতির কর্ম্মক্ষেত্র ছিল। এখন তাহার নিদর্শন আর কিছুই নাই। সংকীর্ণকায় স্বচ্ছ-সলিল আমোদর এখনও পূর্ব্বের ন্যায় ধ্বংসাবশিষ্ট দুর্গমূল ধৌত করিয়া ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে, সলিল-শীকরবাহী সমীরণ পূর্ব্বের ন্যায় আজিও সঞ্চারিত হইতেছে, কিন্তু যে সকল প্রতাপশালী মহাপুরুষের অঙ্গগ্লানি ঘুচাইয়া শরীর শীতল করিত, সমর-শ্রমে শান্তি দিত, যে সকল লাবণ্যবতী রাজললনার কুন্তলদাম স্থানভ্রষ্ট করিয়া অংশে পার্শ্বে প্রক্ষিপ্ত করিত, আজ তাহা অরণ্যচারী পশু পক্ষীর শরীর সেবা করিতেছে।

কোন অজ্ঞাত সময়ে সা ইস্মাইল গাজি নামক এক মুসলমান গৌড় হইতে আসিয়া মান্দারণের হিন্দু রাজাকে পরাভূত করিয়া এদেশে আধিপত্য বিস্তার করেন। তাঁহার সমাধির উপর সে শিলালিপি আছে তাহাতে ৯০০ হিজিরা লিখিত আছে। ইহা খৃঃ ১৪৯৫

অব্দের সমকাল। বাঙ্গালার ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে আবিসনীয় দাসদিগের দ্বারা গৌড়ের নবাব ফতেসাহার হত্যাকালে তাঁহার উজির খাঁ জেহান এবং প্রধান সেনাপতি আন্দিয়েল কয়েকজন বিদ্রোহী হিন্দু রাজাকে বশীভূত করিবার জন্য গৌড় হইতে অনুপস্থিত ছিলেন। অনুমান হয় মান্দারণের হিন্দুরাজাও তন্মধ্যে একজন ছিলেন, সা ইস্মাইল গাজি তাঁহাদেরই সঙ্গে আসিয়া মান্দারণ অধিকার করিয়া থাকিবেন।*

সেই ভগ্ন স্তূপের পাদদেশে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইষ্টকের ভিত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কত কালের কে বলিতে পারে? নির্ম্মম কাল তাহার পরিচয় রাখে না। তবে অনুমান করিতে পারা যায় যে, মহাভারতের সভাপর্ব্বে ভীমসেনের দিগ্বিজয় পরিচয়ে বঙ্গদেশের চন্দ্রসেন, সমুদ্রসেন প্রভৃতি যে রাজাদের উল্লেখ আছে, ইহা সেইরূপ কোন রাজার রাজধানী ছিল।

মন্দার অর্থে স্বর্গীয় তরু বিশেষ—তাহা হইতেই মন্দারণ বা মান্দারণ নামের উৎপত্তি। হাণ্টার সাহেব বলেন সরকার মান্দারণ বীরভূম। প্রকৃত প্রস্তাবে যে তাহা নহে ইহার অনেক প্রমাণ আছে। সরকার মান্দারণের অধীন চেতুয়া বরদা মণ্ডলঘাট প্রভৃতি পরগণা স্বত্বে কেমন করিয়া উহা বীরভূম বা তাহার কোন স্থান হইতে পারে। সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার দুর্গেশনন্দিনীকে মান্দারণের গড়ে বসাইয়া

---

* It happened at this pariod that both the Vizier Khan Jahan, and Malk Andiel, the Commander in Chief, were detached from the capital to wage war against some refractory Rajas, and there were no troops left in the city but the Piaks. Stewart's History of Bengal page 117.

ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করিয়া গিয়াছেন ; ইহার ঐতিহাসিকত্ব রক্ষা করিয়াছে কেবল ভগ্নাবশিষ্ট দুর্গে, রাজা মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহের নামে—আর শৈলেশ্বর শিবে। তাহা ব্যতীত বীরেন্দ্র সিংহাদি রাজা তাঁহার স্বকপোলকল্পিত প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহাদের আর কাহার ঐতিহাসিকত্ব কিছুই নাই। কেমন করিয়া থাকিবে, সরকার মান্দারণে তখন মুসলমান ফৌজদার ছিলেন, মোগল-সেনাপতি রাজা তোডরমল পাঠান দলপতি দাউদখাঁর অনুসরণে মান্দারণে আসিয়া কিয়দ্দিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তাহার পর সেখান হইতে মেদিনীপুর—মেদিনীপুর হইতে ফিরিয়া আসিয়া চেতুয়ায় গিয়া অপেক্ষা করেন *। সুতরাং তৎকালে বীরেন্দ্রসিংহ নামক কোন ব্যক্তির হাতে মান্দারণ দুর্গ সমর্পিত থাকিলে ইতিহাসে নিশ্চিত তাঁহার উল্লেখ থাকিত। মান্দারণ হইতে জন, বীমস্ যে শিলালিপি সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা পারস্য ভাষায় লিখিত এবং মুসলমান ফৌজদারের পরিচয়েই পূর্ণ, হিন্দুর নাম গন্ধও তাহাতে নাই—মান্দারণের একটী তোরণে পারস্য ভাষায় লিখিত আছে—বিঘাভর জমিন, কুলাভরধান। "এক কুলা ধান এক বিঘা জমির রাজস্ব।" মান্দারণের ভগ্ন অট্টালিকা স্তূপ খনন করিলে হিন্দু রাজত্বের অনেক নিদর্শন পাওয়া যাইতে পারে। মান্দারণ দেখিলে মনে হয়—উড়িষ্যা ও দক্ষিণাত্যের বিজয় প্রয়াসী রাজাদের আক্রমণ নিবারণার্থ কোন হিন্দু রাজার দ্বারা রাজপ্রাসাদ ও দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং তাহা নিরাপদ রাখিবার জন্য তাহাদের চতুর্দ্দিকে অত্যুচ্চ প্রাকার ও গভীর পরিখা খনিত হইয়াছিল। মুসলমান রাজত্বে সরকার মান্দারণের রাজস্ব ছিল ২০৲,৩৫৲,৮৫৲ টাকা।

† Stewart's History of Bengal.

মান্দারণ গোঘাট থানার অন্তর্গত এবং এখানে অধিকাংশ মুসলমানেরই বাস আছে। তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন আয়মাদার আছেন। এই মান্দারণ হইতে ধর্ম্মমঙ্গল প্রণেতা খেলারাম চক্রবর্ত্তীর জন্মভূমি পশ্চিমপাড়া এবং মাণিক গাঙ্গুলীর জন্মস্থান বেলডিহা বা বালটে বেশীদূর নহে—পশ্চিমপাড়া এক ক্রোশ এবং বালডিহা দুই ক্রোশের বেশী হইবে না।

সপ্তাতপুর।—ত্রিবেণীর তিন ক্রোশ দূরে সপ্তাতপুর নামে এক জনপদ ছিল। বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত ইন্দ্রহাস (ইন্দাস) গ্রামে এক ব্রাহ্মণ রাজা বাস করিতেন। তাঁহার বংশধর কৃষ্ণচাঁদ ইন্দাস হইতে আসিয়া সপ্তাতপুরে রাজ্য স্থাপন করেন। তিনি ও তাঁহার বংশধরেরা সপ্তাতপুরকে অতি ঐশ্বর্য্য ও শ্রীসৌন্দর্য্যশালী করিয়া ছিলেন। কৃষ্ণচাঁদের পুত্র সুখচাঁদ সুখচাঁদের পুত্র গোপীচাঁদ, গোপীচাঁদের পুত্র হরিচাঁদ, হরিচাঁদের পুত্র নবচাঁদ এই পাঁচ পুরুষের পর আর কাহারও নাম পাওয়া যায় না। ইহাতেই মনে হয় নবচাঁদকে দিয়াই রাজবংশের পরিসমাপ্তি হয়। এই রাজবংশ সপ্তগ্রাম পর্য্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

প্রদ্যুম্নপুর।—বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরের প্রায় ৯ মাইল দূরে এই গ্রাম। এখন ইহা পুত্নমপুর নামে খ্যাত। জলেশ্বর ঠাকুর নামে এক ব্রাহ্মণ তপঃসিদ্ধ হইয়া এখানে এক পর্ণকুটীরে বাস করিতেন। তিনি হরপার্ব্বতীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া ভিক্ষালব্ধ অর্থে একটী দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। দেবসেবার জন্য দেশের রাজা তাঁহাকে একটী পরগণা দান করেন। জলেশ্বর ঠাকুরের [illegible]

দুয়েই বাস করিতেন। তাঁহার পুত্রের নাম প্রত্যুম্ন—প্রত্যুম্ন অতি বলশালী ছিলেন। তিনি স্বীয় বাহুবলে নিকটবর্ত্তী দেশ অধিকার পূর্ব্বক রাজোপাধি গ্রহণ করিয়া প্রত্যুম্নপুর নামক গ্রাম ও তাহাতে রাজধানী সংস্থাপিত করেন। প্রদ্যুম্নের পুত্রের নাম অজয়, তাঁহার পুত্রের নাম কানাইলাল। তিনি এক দির্ঘিকা খনন করাইয়া তাহার নাম রাখেন কানাইসায়র। কানাই সায়র এখনও রাজা কানাইলালের নাম রক্ষা করিতেছে। প্রবাদ এইরূপ যে, বিষ্ণুপুরের নিকটবর্ত্তী ছাতনা রাজবংশের কেহ কেহ জলেশ্বর ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। প্রত্যুম্নপুর এখন একটী গ্রাম মাত্রে পরিণত হইয়াছে—কানাইসায়র ব্যতীত রাজধানীর পরিচয় দিতে আর কিছুই নাই। জয়পুরের পার্শ্ববর্ত্তী ঢোলসমুদ্র নামক সুবিস্তৃত সায়রের তীরে প্রত্যুম্ন রাজার গ্রীষ্মাবাস ছিল।

লাউগ্রাম।—লাউগ্রামে বহুকাল পূর্ব্বে এক হিন্দুরাজা রাজত্ব করিতেন। এখান হইতেই বিষ্ণুপুর রাজ্যের উদ্ভব। হাণ্টার সাহেব তাঁহার রুরাল-বেঙ্গল পুস্তকে বিষ্ণুপুর রাজবংশের উৎপত্তি সম্বন্ধে যেরূপ লিখিয়াছেন আমরা কিন্তু বিষ্ণুপুর রাজবংশের এক শাখা-সম্ভূত বংশধর কুচিয়াকোলের জমিদার ৺রাধাবল্লভ সিংহ মহাশয়ের নিকট যেরূপ শুনিয়াছি তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেছি,—খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে এক দরিদ্র ক্ষত্রিয় সস্ত্রীক জগন্নাথতীর্থ দর্শনে যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে লাউগ্রামে আসিয়া ক্ষত্রিয়পত্নীর প্রসব-বেদনা উপস্থিত হইলে প্রসূতি এবং প্রসূতব্য

† Ain-i- Akbari

সন্তানের মায়া-মোহ ত্যাগ করিয়া পিতা শ্রীক্ষেত্রে চলিয়া যান। ক্ষত্রিয়পত্নী অসহায় অবস্থায় এক পুত্র-সন্তান প্রসব করিলেন এবং এক বাগ্দীর গৃহে অবস্থিতি করিয়া প্রসূত সন্তান প্রতিপালন করিত লাগিলেন। পুত্রটী একটু বড় হইলে গ্রামবাসী এক ব্রাহ্মণ তাহাকে ভৃত্যত্বে নিযুক্ত করেন এবং তাহার জননীও ব্রাহ্মণ-গৃহে দাসিবৃত্তি অবলম্বনে কালাতিপাত করিতে থাকেন। বালকের নাম ছিল রঘু বা রঘুনাথ। লাউগ্রামের নিকটেই বন—রঘু প্রতিদিন সেই বনে গোরু চরাইতে যাইত, মধ্যাহ্নকালে প্রভুর বাড়ীতে আসিয়া আহারাদির পর আবার গোরু লইয়া বনে যাইত। বনে বাঘ ভাল্লুকের ভয় ছিল বলিয়া সে একটু বেলা থাকিতে গোরু লইয়া বাড়ী আসিত। একদিন বালকের বাড়ী ফিরিবার নিয়মিত কাল অতীত হইলে তাঁহার গোরুগুলি বাড়ী ফিরিল কিন্তু বালক ফিরিল না দেখিয়া ব্রাহ্মণের মনে ভয় হইল—ভাবিলেন বাঘ ভাল্লুকে হয়ত বালক রঘুকে মারিয়া ফেলিয়াছে। ভৃত্য হইলেও রঘু ব্রাহ্মণের পরিজনবর্গের ন্যায় হইয়া উঠিয়াছিল, সকলেই তাহাকে স্নেহ-যত্ন করিত। ব্রাহ্মণ নিশ্চিন্ত থাকিতে না পারিয়া ভাবিতে ভাবিতে বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—বালক একটী শালতরুমূলে নিদ্রা যাইতেছে, আর একটী বৃহৎ গোক্ষুরা সর্প তাহার মুখের উপর যে সূর্য্য-কিরণ পড়িয়াছিল তাহার উত্তাপ হইতে বালককে রক্ষা করিবার জন্য তাহার কুলার ন্যায় বিস্তৃত ফণা ধরিয়া আছে—দেখিয়া ব্রাহ্মণ মনে ভাবিলেন তবে এই সর্পের দংশনেই রঘু প্রাণ হারাইয়াছে। ব্রাহ্মণকে দেখিয়া সর্প সরিয়া গেল। ব্রাহ্মণ নিকটস্থ হইয়া দেখিল বালক ঘুমাইতেছে। তিনি তাহাকে জাগাইলে সে প্রভুকে দেখিয়া ব্যস্তসমস্ত হইয়া

ইতস্ততঃ গোরু খুজিতে গেল। ব্রাহ্মণ বলিলেন—"গোরু ঘরে গিয়াছে তোমাকে না দেখিয়া তোমার মা কাঁদিতেছেন, চল ঘরে যাই।" রঘু আপনার অসাবধানতা জন্য বড়ই দুঃখিত হইয়া কুণ্ঠিতভাবে প্রভুর পশ্চাদ্গামী হইল। উভয়ে বাড়ী পৌছিলে ব্রাহ্মণ রঘুর মাকে বলিলেন—"তোমাদিগকে একটী সত্যপাশে বদ্ধ হইতে হইবে।"

রঘুর মা বলিল—"কি সত্য বলুন।"

ব্রাহ্মণ। তোমার রঘু যদি রাজা হয় তাহা হইলে আমাকে পুরোহিত করিবে?

রঘুর মা বলিলেন—এমন কপাল হবে, আমার রঘু রাজা হবে—এমন কি কপাল করে এসেছি ঠাকুর।

ব্রাহ্মণ। আচ্ছা, সে কথায় কাজ কি—তোমরা অঙ্গীকার কর।

রঘুর মা উত্তর করিল—হাঁ রঘু আমার রাজা হ'লে আপনি পুরোহিত হবেন।

ব্রাহ্মণ। কেমন রে রঘু—তুই কি বলিস্?

রঘু। আজ্ঞে হাঁ—আপনিই পুরোহিত হবেন।

তখন রঘুর বয়স ১৩।১৪ বসৎর—ঐদিন হইতে রঘুর রাখালী ঘুচিল, সে খায়দায় বেড়াইয়া বেড়ায়, ব্রাহ্মণ তাহাকে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় দিলেন—রঘু একটু লেখাপড়া শিখিল। লাউগ্রামের রাজার সদাব্রত ছিল, শীতকাল হইলে অনেক সন্ন্যাসী গঙ্গাসাগর ও জগন্নাথ তীর্থ যাইবার জন্য রাজার সদাব্রতে অতিথি হইলে রাজা তাহাদিগকে আহারাদি ও লোটা কম্বল দান করিতেন। রঘু ক্ষত্রিয়-সন্তান হইলেও তাহার বাগ্দী অপবাদ ঘুচে নাই। উগ্রাম ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের বাগ্দীচুয়াড়েরা তাহাকে আপনা-

দের সজাতীয়-বোধে স্নেহযত্ন করিত। বাগ্দী জাতীয়েরা মদ ভাঙের বড় প্রিয়, রাজার অন্নসত্রে যে সকল সাধু-সন্ন্যাসী খাওয়াদাওয়া করিত তাহাদের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া রঘু গাঁজা সিদ্ধি খাইত। ক্রমে রাজার মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র বড় অত্যাচারী হইয়া উঠিল, এবং সাধু-সন্ন্যাসীকে আশ্রয় দেওয়া বন্ধ করিয়া দিল—সাধু সকলে বাগ্দীদের সঙ্গে মিলিয়া রাজপুত্রকে রাজ্যচ্যুত করিল এবং রঘুকে রাজ্য দিল। রঘু কিছুদিন লাউগ্রামে রাজত্ব করিয়া বিষ্ণুপুরের পত্তন এবং তথায় রাজধানী সংস্থাপিত করিলেন। রঘু আদিমল্ল নামে প্রসিদ্ধ হইল।

শ্যামালোক বা শোণ্ডালুক।—আরামবাগের পুড়শুড়া পুলীশ-ষ্টেশনের অন্তর্গত এই গ্রাম। এখানে একহিন্দু রাজা বহুকাল পূর্ব্বে রাজত্ব করিতেন। লোকে এখন তাঁহাকে মুণ্ডই রাজা বলে এবং একটী ভূখণ্ডকে তাঁহার বাস্তুভূমি বলিয়া দেখাইয়া দেয়। মুণ্ডই রাজার কি নাম ছিল তাহা জানা যায় নাই। তাঁহার এক কন্যা ছিলেন তাহার নাম মল্লিকা—তাঁহার প্রতিষ্ঠিত পুষ্করিণী এখন মল্কে নামে খ্যাত। পুকুরটীই তাঁহার নাম রক্ষা করিতেছে কিন্তু আর পারে না, ভরাট হইয়া ধান্যক্ষেত্রে পরিণত হইবার মত হইয়াছে। বর্ষাবসানে তাহাতে জল থাকে না। মল্কের উত্তর দিকে-রাজার বাড়ী ছিল। সেখানে এখন যে সকল নালা ডোবা হইয়াছে তাহাতে মৎস্যাদি ধরিবার সময় কেহ কেহ সুবর্ণ মুদ্রা, সোনার বাইট পাইয়া থাকে।

রামনগর।—আরামবাগের দুই ক্রোশ দক্ষিণে শাল্লেপুর রামনগর গ্রামে এইরূপ একটী গড় ও স্তূপকে লোকে শালিবাহন রাজার বাড়ী বলিয়া দেখায়।

শ্যামবাটী—গ্রামে আয়ুবল বাহুবল নামে দুই রাজার কথাও শুনিতে পাওয়া যায়।

সাত দেউলিয়া আজাপুর।—বৰ্দ্ধমান মেমারীর দক্ষিণ আজাপুর গ্রামে একটী দেউল ও অনেক ধ্বংসাবশিষ্ট বাড়ীর চিহ্ন আছে। প্রবাদ এইরূপ যে এখানকার রাজা মাতৃঋণ শোধিবার জন্য সাতটী দেউল মাতৃনামে উৎসর্গ করিয়া বলিয়াছিলেন—"আমি মাতৃঋণে মুক্ত হইলাম" বলিবা মাত্র ছয়টী দেউল ভূমিসাৎ হইল দেখিয়া রাজা বলিলেন—"না না মাতৃঋণ শোধ হইবার নহে" বলিবা মাত্র দেউলটী একটু ঝুঁকিয়া রহিল। আজি পর্য্যন্ত সেইরূপেই আছে। এইজন্য গ্রামটীর নাম সাত দেউলে আজাপুর।* রাঢ়দেশে এরূপ প্রবাদ বিশিষ্ট অনেক পতিত ডাঙ্গা ও অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

সাতরাগড়।—দক্ষিণ রাঢ়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কত রাজাই যে ছিল, কত রাজাই যে এখানে রাজত্ব করিয়াছিলেন খুঁজিয়া বাহির করা বড় কঠিন। মেদিনীপুর জেলায় এক ব্রাহ্মণ জমিদার ছিলেন, তখনকার কালে জমীদার আখ্যাটী আজিকালিকার মত প্রচলিত ছিল না—একটু প্রশস্ত ভূমির অধিকার থাকিলেই তিনি রাজা। এখানকার পূৰ্ব্ববৰ্ত্তী রাজবংশ বৰ্ত্তমান থাকিতে থাকিতেই আনুমানিক ১৭২২ খৃষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামে জনৈক রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণ এক মধ্যশ্রেণী ব্রাহ্মণের কন্যাকে বিবাহ করিয়া এখানে অবস্থিতি করেন এবং আপনার চেষ্টা, যত্ন ও অধ্যবসায় বলে পূৰ্ব্বোক্ত জমিদার বা রাজার হস্ত হইতে সাতরাগড় রাজ্যের

* Seven temples at Ajapur—Bengal Magazine vol. II.

স্বত্বাধিকার গ্রহণ করেন। মুসলমান নবাব তাঁহাকে রাজা উপাধি দিয়াছিলেন। রাজা গিরিশচন্দ্রের বংশধরেরা এখনও কিন্তু মধ্যশ্রেণী ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত।

ময়না গড়।—মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত এই স্থান, তমলুক হইতে ১৩।১৪ মাইল। এখানে বাহুবলীন্দ্র উপাধিধারী এক কৈবর্ত্ত জমিদার এখন আছেন। রাজা ধর্ম্মপাল যখন গৌড়েশ্বর, তখন কর্ণ সেন নামে এক সামন্ত রাজা বীরভূমের অন্তর্গত ত্রিষষ্ঠীর গড়ে রাজত্ব করিতেন। গৌড়েশ্বরের শ্যালকের নাম মহাম্মদ, তিনিই তাঁহার মহাপাত্র বা প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। মহম্মদ সোমঘোষ নামক এক প্রজাকে রাজস্ব আদায় জন্য কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন। একদিন ভ্রমণে বহির্গত হইয়া গৌড়েশ্বর তাহাকে দেখিতে পাইয়া কারাবাসের হেতু জিজ্ঞাসিলে, সোমঘোষ রাজসমীপে আপনার কারাবাসের কারণ জানাইল, রাজা কৃপা করিয়া তাহাকে বীরভূমের রাজা কর্ণসেনের নিকট এই পরওয়ানা দিয়া সপরিবারে পাঠাইয়া দিলেন যে, ত্রিষষ্ঠীর গড়ে থাকিয়া দেখিবে, সন সন কর্ণসেন রাজস্ব পাঠাইতে বিলম্ব করিয়া না বাকী ফেলে। সোমঘোষ সৈন্য সামন্ত লইয়া রাজাজ্ঞা পালন জন্য ত্রিষষ্ঠীর গড়ে আসিয়া যথেষ্ট সমাদর পাইলেন এবং সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম ইছাই ঘোষ। সে ক্রমে বড় হইয়া অতি দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিল। ইছাই কালীমন্ত্রে দীক্ষিত, কালিপদ সেবা করিয়া সে কাহাকেও মানে গণে না। কালীর কৃপায় সে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইল, আপনার প্রাসাদ, ঢেকুর নামে গড়, বাড়ী সমস্ত প্রস্তুত করিয়া কর্ণসেনের রাজ্য

কাড়িয়া লইল। কর্ণসেন গৌড়ে গিয়া সকল কথাই গৌড়েশ্বরের স্থগোচর করিয়া কান্দিতে লাগিলেন। গৌড়েশ্বর সোমঘোষকে পত্র দিয়া ডাকিয়া পাঠাইলেন। ঘোষের পুত্র ইছাই পত্রবাহক ভাটকে মারিয়া ধরিয়া দূর করিয়া দিল। সোম পুত্রকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিল, পিতার অনুরোধে ইছাই শেষে ভাটকে কিছু বক্‌শিশও দিল। ভাট গিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গৌড়েশ্বরকে সকল কথাই জানাইল। গৌড়েশ্বর ইছাই ঘোষের দণ্ডবিধানার্থ বারভূঞা সঙ্গে লইয়া বীরভূম যাত্রা করিলেন, কিন্তু যুদ্ধে কর্ণসেনের ছয় পুত্র প্রাণ হারাইল, গৌড়েশ্বর পরাভূত হইয়া কর্ণসেনকে সঙ্গে লইয়া গৌড়ে উপস্থিত হইলেন, তথায় আপন শ্যালিকা রঞ্জাবতীর সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়া দক্ষিণ ময়নাগড় রাজ্যের অধিপতি করিয়া পাঠাইলেন। রাণী রঞ্জাবতী বহু তপস্যায় ধর্ম্মরাজকে প্রসন্ন করিলেন, ধর্ম্মের কৃপায় তাঁহার যে পুত্র জন্মিল তাঁহার নাম হইল লাউসেন। ধর্ম্মের বরে লাউসেন বিপুল বিক্রমশালী বীর হইয়া উঠিলেন, ধর্ম্মরাজ তাঁহার সহায়, আপদে বিপদে তিনি তাঁহাকে রক্ষা করিতেন। লাউসেন দ্বারাই ইছাই ঘোষের নিধন সাধন হয়। লাউসেন গৌড়ে গিয়া অনেক অসাধারণ কার্য্য দ্বারা প্রতিষ্ঠান্বিত হয়েন। গৌড় হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি ময়না নগরে ভাগ করিয়া ঘরবাড়ী, গড়, প্রাকারাদি নির্ম্মাণ করাইয়া প্রতিষ্ঠিত হয়েন। এখনও তাঁহাদের চিহ্ন আছে। যাত্রাসিদ্ধি নামে ধর্ম্মরাজও আছেন। লাউসেন বহুদূর পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন, ইহা খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর ঘটনা। যখন গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপালের সহিত এই অপূর্ব্ব কাহিনীর সংস্রব আছে, তখন নাই বা হইবে

কেন? হাণ্টারাদি প্রত্ন-তাত্ত্বিকেরা এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলেন নাই।

লাউসেন ময়না নগরের চতুর্দ্দিকে গড় খাত করেন। সেই শত বিঘাব্যাপী গড়ের মধ্যে লাউসেনের রাজবাটী ছিল, এখনও তাহার ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে লাউসেনের ইষ্ট পূজা করিবার আসন আছে। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত পাষাণময়ী রঙ্কিণী নাম্নী কালী এবং লোকেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ এখনও সেখানে দেখিতে পাওয়া যায়। লাউসেনের যখন কোন বিপৎ-পাত হইত, তখনই তিনি ধর্ম্মের অনুগ্রহ লাভার্থ দেবী কালীকার স্তব করিয়া সেই বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিতেন। লাউ-সেনের স্বর্গারোহণের পর তাঁহার পুত্র চিত্রসেন ময়নার অধিপত্য লাভ করেন। তাহার পর লাউসেনের বংশধরগণের কোন কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। তাঁহারা ক্ষত্রিয় ছিলেন *।

এই জেলার সাবং নামক স্থানে রাজা গোবর্দ্ধন বাহুবলীন্দ্র এক জমিদার ছিলেন। তিনি স্বীয় ভুজবলে ময়না পরগণার অধিকার লাভ করেন। মহারাষ্ট্রীয় নরপতি মহারাজা দেবরাজ বাহাদুর তাঁহার বাহুবলের এবং সঙ্গীতজ্ঞানের পরিচয় পাইয়া "রাজা বাহুবলীন্দ্র" উপাধি দান করেন তাঁহার পরলোক প্রাপ্তির পর তৎপুত্র রাজা পরমানন্দ বাহুবলীন্দ্র সাবং হইতে উঠিয়া ময়না গড়ে রাজধানী স্থাপন এবং লাউসেনের গড়ের মধ্যেই বাস করেন। পরমানন্দের পুত্র মহাদেবেন্দ্র, তাঁহার পুত্র গোকুলানন্দ, তৎপুত্র

* ক্ষেত্রি বংশে কর্ণসেন—ময়না ঈশ্বর।
সেতার হয়েছে জায়া মোর প্রিয়তর॥
মাণিক গাঙ্গুলী—৩৭ পৃঃ।

কৃপানন্দ, তাঁহার পুত্র জগদানন্দ, তাঁহার পুত্র ব্রজানন্দ, তাঁহার পুত্র আনন্দানন্দ, তাঁহার পুত্র রাধাশ্যামানন্দ, তাঁহার তিন পুত্র—শ্রীযুক্ত প্রেমানন্দ বাহুবলীন্দ্র, শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ বাহুবলীন্দ্র এবং শ্রীযুক্ত পূর্ণানন্দ বাহুবলীন্দ্র। ইঁহারা জাতিতে কৈবর্ত্ত। ইঁহাদের কোন পূর্ব্বপুরুষ তমোলুকের রাজার সহিত যুদ্ধ করিয়া তমোলুক পরগণার শ্রীরামপুর ও আরও নয় খানি গ্রাম স্বাধিকারভুক্ত করিয়া লয়েন। রাজা ব্রজানন্দের অধিকার কালে এতদঞ্চলে ভয়ানক বন্যা ও অন্নকষ্ট হওয়ায় প্রজারক্ষার জন্য তাঁহাকে বাধ্য হইয়া সাবং এবং ময়না পরগণার কিয়দংশ বিক্রয় করিতে হয়। এখন যাহা অবশিষ্ট আছে তাহার বার্ষিক উপস্বত্ব প্রায় ২০ হাজার টাকা। এই বংশীয় রাজাদের অনেক সংকীর্ত্তি আছে। রাজ্যের যেখানে সেখানে জলাশয় খনন, দেবতা প্রতিষ্ঠা, ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মোত্তর দান, রাস্তা ঘাট নির্ম্মাণ ইত্যাদি হিন্দু রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য সকল কাজেরই অনুষ্ঠান ছিল।

বীরভূম অঞ্চলে ইছাই ঘোষের কথাও এইরূপ যখন শুনিতে পাওয়া যায় তখন ঘটনা মিথ্যা নহে। সেখানেও ইছাইয়ের ঢেকুর নামে গড় এখনও আছে। তবে ঘনরাম রূপরাম প্রভৃতি ধর্ম্ম-মঙ্গল প্রণেতৃগণ আপনাদের কাব্যকে সৌন্দর্য্যশালী করিবার জন্য অলঙ্কারাদি দ্বারা ভূষিত করিয়াছেন। ফলে ময়না গড়ের বিষয় ধর্ম্মমঙ্গল হইতে আর কিছু অবগত হইতে পারা যায় না। কেহ কেহ অনুমান করেন লাউসেনের ময়না, এ ময়না নহে, বাঁকুড়া জেলার সনদ ময়নাপুর। প্রকৃত প্রস্তাবে, তাহা নহে। ময়না হইতে গৌড় যাইবার যে পথের পরিচয় আছে, তাহাতে এই ময়না গড় বই সনদ ময়নাপুরকে কিছুতেই বুঝায় না,—

কাশীজোড়া কৃষ্ণপুরে কতদূরে রাখি।
বেগবন্ত ধায় চোর যেন বাজপাখী॥

কাশীজোড়া কৃষ্ণপুর তমোলুক মহকুমায়। কাশীজোড়া সন্দ ময়নাপুরের পথে নহে।

হরিপাল।—হুগলী জেলার মধ্যে একটী প্রসিদ্ধ গণ্ডগ্রাম। ইহা সাতাইশটী পল্লীতে বিভক্ত। এখানে একটী উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী স্কুল, একটী বড় রকমের সাব পোষ্টাফিস, একটী সবরেজেষ্টী আফিস এবং একটী পুলিশ থানা আছে। ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন এদেশে বণিকবৃত্তি করিতেন, তখন রাজবল হাটে তাঁহাদের যে একটী এজেন্সী সংস্থাপিত হয়, তাহা খৃঃ ১৭৯০ অব্দে এখানে উঠিয়া আইসে। এজেন্সীতে একজন ইংরাজ এজেণ্ট এবং ইংরাজ ডাক্তার থাকিতেন। এজেণ্টের অধীনে কতকগুলি সরকার ও গোমস্তা থাকিয়া সোণামুখী, পাত্রসায়ের প্রভৃতি দূরবর্ত্তী স্থানের তন্তুবায়গণকে দাদন দিয়া সূতার ও তসর এবং গরদের কাপড় বুনাইয়া লইত। খৃঃ ১৮২৭ অব্দ পর্য্যন্ত হুগলীর কালেক্টার সাহেবের হাতে এজেন্সীর কাজ ছিল, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বণিকবেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজবেশ ধারণ করিলে ওয়াটসন কোম্পানী কিছুদিন তাঁহাদের কুঠিগুলি চালাইয়া বন্ধ করিয়া দেন। হরিপালে অনেক আঢ্য ব্যক্তির বাস। প্রসিদ্ধ বস্ত্রব্যবসায়ী ৺রামা চরণ ভড় মৃতকল্প কৌশিকী নদীর সংস্কার জন্য ত্রিশ হাজার টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। হুগলী জেলার বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ বকাউল্লা সাহেবের বাস এই গ্রামে। তৎপুত্র শ্রীযুক্ত মৌলবি বজলাল করিম কলিকাতার অন্যতম প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, এখন অবসর প্রাপ্ত। কলিকাতার ডেপুটী

কালেক্টর শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ ভড় এম্. এ, এই গ্রামের অধিবাসী। তিনি হরিপালে একটী সুন্দর সলিলশালিনী পুষ্করিণী খাত করাইয়া গ্রামবাসীর জলকষ্ট নিবারণ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ সতীশ চন্দ্র ভড় বি, এল সম্প্রতি ব্যারিষ্টরী পরীক্ষা দিবার জন্য বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত আরও অনেক কৃতবিদ্য লোক এখানে বাস করেন। এখানে এক ঘর জমিদার আছেন তাঁহারা বহু ভূসম্পত্তির অধিকারী। যথাস্থানে তাঁহাদের পরিচয় প্রদত্ত হইবে। হরিপালের পুরাকাহিনী পশ্চাৎ বর্ণিত হইতেছে।

হরিপাল কৌশিকী নদীতীরে অবস্থিত। কৌশিকী মজিয়া গিয়াছিল, এখন ইহার কথঞ্চিৎ সংস্কার হইয়াছে। হরিপাল যে সাতাইশটী পটিতে বিভক্ত, তাহাদের এক একটী পটিকে এক একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম বলিলেও বলা যায়। কারণ পটিগুলির নাম পৃথক, রাজস্ব পৃথক্, স্বত্বাধিকারীও পৃথক। ঐ সকল পটির মধ্যে এখন যে পটিটী হরিপাল নামে খ্যাত, তাহার পূর্ব্ব নাম সিমলা বা সামুলা, অন্যান্য পটির মধ্যে অনেকগুলিরই পূর্ব্ব নাম পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ইংরাজ রাজত্বের পূর্ব্বাবধি এই সিমলা নামক পটিতে অনেক তন্তুবায়ের বাস, তাহাদের দ্বারা অতি সুন্দর কার্পাস-সূত্র-নির্ম্মিত বস্ত্র প্রস্তুত হইত সেই সকল বস্ত্র সিমুলাই কাপড় বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। অনেকে মনে করিতে পারেন বিখ্যাত সিমুলাই ধুতি কলিকাতা সিমলায় প্রস্তুত বস্ত্র গত। তাহা নহে। এখানে মুষ্টিমেয় তন্তুবায়ের বাস থাকিলেও তাঁহারা জাতীয় বৃত্তিজীবী নহেন।

হুগলীর বর্ত্তমান হরিপালের সিমুলিয়া পটিতে হরিপাল নামে

রাজা হরিপাল যে গৌড়েশ্বরের সামন্ত রাজা তাহা মাণিকরাম স্পষ্ট লিখিয়াছেন যথা—

করি তুচ্ছ হরিপাল খদ্যোৎ সমান।
কৃতার্থ হইব মনে কন্যা দিবে দান॥
চিরকাল তোমার সে বাপের চাকর।
সিমুল পাঠান তাকে সাধিবারে কর॥
প্রজা-লোক যত ছিল অনুগত শেষে।
কপাল দিলেক বিজু রাজা হলো দেশে॥
একুনে হইল আজ একুশ বছর।
সিমুল ইলাম খায় দেই নাই কর॥

মাণিক গাঙ্গুলী। ১৩৭ পৃঃ।

গঙ্গাভাট সিমুল আসিল—তৎকালে সিমুল বড়ই সমৃদ্ধিশালী ছিল—ভাটমুখে তাহার পরিচয়—

সাক্ষাৎ সোনার লঙ্কা সিমুল নগর।
ব্রাহ্মণী বেষ্টিত তায় যেমন সাগর॥

ভট্টপ্রবর গৌড় হইতে দশদিনে আসিয়া সিমুল নগরে উপনীত হইলেন।

গোবিন্দ বাজার, তবে হৈয়া পার,
পাইল গোমতী হাট।
সিমুল নগরে, দিন দশ পরে,
উপনীত হইল ভাট॥
নগরের শোভা, স্বর্গ সম কিবা,
দেখে মনে মোহ পায়।
শ্রীধর্ম্ম চরণ, করিয়া স্মরণ,
দ্বিজ শ্রীমাণিক গায়॥

প্রকৃত প্রস্তাবে গৌড় হইতে হাঁটা-পথে হরিপাল আসিতে দশ দিনই লাগে। ভাট মনে করিয়াছিলেন এ বিবাহে কোন বাধা-বিঘ্নের সম্ভাবনা নাই—হরিপাল আগ্রহ সহকারে গৌড়েশ্বরকে কন্যা দান করিয়া আপনাকে সার্থক জ্ঞান করিবেন। ভাটের সম্বর্দ্ধনার ক্রটীও হইল না, কিন্তু রাজকন্যা কানড়া কুলদেবতা রঙ্কিণীর সেবা-দাসী, দেবী তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া প্রত্যাদেশ করিয়াছিলেন যে ময়নার রাজা লাউসেন তাঁহার পতি হইবেন। রাজকন্যা কানড়া মনে মনে তাঁহাকেই পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। ভাট রাজকন্যা কানড়ার নিকট গৌড়েশ্বরকে নবীন-নধর পুরুষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। কানড়া যেমন-তেমন রাজকন্যা নহেন, ভাটের সঙ্গে গৌড়েশ্বর যে দ্রব্য সম্ভার পাঠাইয়াছিলেন কানড়া তাহার বাহকগণকে গোপনে দেবী রঙ্কিণীর দিব্য দিয়া গৌড়েশ্বরের পরিচয় জিজ্ঞাসিলে তাহারা কিছুই গোপন করিল না, গৌড়েশ্বর যে অতি বৃদ্ধ, উঠিতে বসিতে তাঁহার অবলম্বন আবশ্যক একথা জানাইলে কানড়া আপন দাসী ধুমসীকে দিয়া ভাটকে অন্তঃপুরে ডাকিয়া পাঠাইলেন, এবং নাপিতকে আনাইয়া তাঁহার মাথা পাঁচচুলে করিয়া তদুপার ঘোল ঢালাইয়া এবং তাঁহার গালে চুণ কালি দিয়া সিমুলের বাজার পার করিয়া দিলেন—এতদুপলক্ষে মাণিকরাম লিখিতেছেন—

> ধুমসী উঠিয়া রেগে ধরে গিয়া ভাটে।
> ঠকঠকে গণ্ডা চারি ঠোনা মারে ঠোঁটে॥
> কানড়া কুপিয়া কয় কুহুযোগ বাণী।
> বাসুলী পূজিব আজি ভাটে দিয়া বলি॥
> মিথ্যা কথা বলে মোর মজাতে যৌবন।

উচিত ইহার শাস্তি নির্ঘাত মারণ॥
বচন বলিতে অগ্নি বরিষয়ে মুণ্ডে।
গণ্ডা চারি লাথি চড় পড়ি গেল ভুণ্ডে॥
ধুম ধুম ধুমসীর কিলের পরিপাটী।
দশহাত কেঁপে গেল সিমুলের মাটী॥
ভূতলে পড়িয়া ভাট ভাবে ভূতনাথে।
চটচাট চাপড় সে গত চারি ভিতে॥
জামা-জোড়া পটুক পাগড়ী গেল উড়ে।
সিনিহার সুচেল সকলি নিল কেড়ে।
লঘু ডেকে নাপিত করায় পাঁচ চুল্যা।
সহর বাহির করে শিরে ঘোল ঢেল্যা॥
পাঁচচুল্যা করিয়া মাথায় ঢালে ঘোল।
বাজার বাহির করে বাজাইয়া ঢোল॥ ১৪০ পৃঃ॥

ভাট গৌড়ে ফিরিয়া-গিয়া আপনার লাঞ্ছনা নিগ্রহের কথা সমস্তই বলিল। গৌড়েশ্বর ক্রোধে অধীর হইয়া নবলক্ষ সৈন্য সজ্জার আজ্ঞা দিলেন এবং অবিলম্বে আসিয়া সিমুল আক্রমণ করিলেন। রাজা হরিপাল কন্যাকে দাসী ধুমসীর সহিত ফেলিয়া বাস ডিঙ্গার গড়ে প্রস্থান করিলেন। ঘনরাম বলেন –

পরিবার লৈয়া রাজা নৌকা আসি চড়ে।
প্রাণ লৈয়া পলাইল বাসডিঙ্গা গড়ে॥ ১৯৯ পৃঃ॥

বাস-ডিঙ্গা যে বাসুড়ী পরে কবি আপনিই তাহা খোলসা করিয়া বলিয়াছেন—

বাসুড়িয়া গড়ে গিয়া শীঘ্র দাও থানা।
হরিপাল রাজা পাছে রাত্রে দেয় হানা॥

মাণিকরাম বাসডিঙ্গা নাম না করিয়া একবারেই বাস্কুড়ীর কথা বলিয়াছেন—

তনয়ার বচনে তরাস হলো তায়।
গড় ছেড়ে গোল হয়ে গোপনে পলায়॥
হয় নাশ হবেক রাজার সনে হট।
বাস্কুড়ের গড়ে এসে বান্ধিলেক জট॥ ১৪২ পৃঃ॥

এই বাস্কুড়ে এখন বাস্কুড়ী নামে পরিচিত এবং দামোদর নদের প্রায় এক ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত। সহায়শূন্য পিতার পলায়নে কানড়া প্রাণপণে অভীষ্ট-দেবীর নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি প্রত্যক্ষ হইয়া বলিলেন—"লোহার গণ্ডা প্রস্তুত হইতেছে, সে গণ্ডা লাউসেন বই অন্য কেহ কাটিতে পারিবে না। তুমি গৌড়েশ্বরকে বলিয়া পাঠাও—যে এক চোটে গণ্ডা ছেদ করিতে পারিবে সেই আমার পতি হইবে। গৌড়েশ্বরের সে শক্তি নাই, সে অসমর্থ হইয়া আপনিই লাউসেনকে আনাইবে, লাউসেন গণ্ডা ছেদ করিলে তুমি তাহাকে পতিত্বে বরণ করিবে।"

তাহাই হইল—গৌড়েশ্বর রাজকন্যার প্রতিজ্ঞা শুনিয়া প্রমাদ গণিলেন। আপনি অনেক চেষ্টাতেও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না, অমাত্যগণ সকলেই চেষ্টা করিয়া হারি মানিল, মন্ত্রী মহামুদা লাউসেনের মাতুল, অথচ ঘোর শত্রু, কিছুতেই তাঁহার অনিষ্ট সাধনে সমর্থ নহে, এজন্য তিনি ইহাকেই তাহার সুযোগ মনে করিয়া গৌড়েশ্বরকে পরামর্শ দিলেন ময়না হইতে লাউসেনকে ডাকিয়া পাঠান হউক। গৌড়েশ্বর মন্ত্রীর উপদেশানুবর্ত্তী—তৎক্ষণাৎ লাউসেনকে আনিতে লোক গেল। হরিপাল হইতে পাঁচদিনে দূত ময়নায় পৌঁছিয়া তাঁহাকে পত্র দিল, হরিপাল হইতে ময়না ৪।৫

দিনেই যাওয়া যায়। লাউসেন আসিবার সময় পথে দামোদর নদ পার হইয়াছিলেন ;—

কাশীজোড়া পশ্চাৎ পবনগতি ধায়।
দামোদর সম্মুখে দাখিল হৈল রায়॥
একে একে পথের কতেক লব নাম।
সিমুলা সমীপে এলো রাজার মোকাম॥

ঘনরাম ২০৫ পৃঃ।

কবি পথের পরিচয়ে ভুল করেন নাই, ময়নাগড় হইতে হরিপাল আসিবার ইহাই প্রকৃত পথ। কাশীজোড়া পরগণা তমোলুকের উত্তর, সেথান হইতে আসিতে সম্ভবতঃ লাউসেন আমতার উত্তরে দামোদর পার হইয়াছিলেন। লাউসেন সিমুলে আসিয়া গৌড়েশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করিলে গৌড়াধিপতি তাঁহাকে লোহার গণ্ডাচ্ছেদ করিবার জন্ম অনুরোধ করিবামাত্র লাউসেন গণ্ডা কাটিয়া গৌড়েশ্বরের অনুরোধ রক্ষা করিলেন, বাসড়ির গড় হইতে রাজা হরিপালকে গ্রেপ্তার করিয়াও আনিলেন, এবং গৌড়েশ্বরকে বরমাল্য দিবার জন্ম কানাড়াকে যথোচিত অনুরোধও করিলেন, কিন্তু কানাড়া কিছুতেই সম্মত হইলেন না, তিনি লাউসেনকেই পতিত্বে বরণ করিলেন, এই সংবাদ পাইয়া গৌড়েশ্বর কানড়াকে পাইবার জন্ম যুদ্ধের ঘোষণা দিলেন, তুমুল যুদ্ধ—সেই যুদ্ধে দেবী ভগবতী স্বয়ং উপস্থিত হইলেন, কানড়া দেবীর কৃপায় জয় লাভ করিলেন, দেবী স্বয়ং কানাড়ার সহিত লাউসেনের বিবাহ সম্পাদন করাইলেন, রাজা হরিপাল কন্যা উৎসর্গ করিলেন, গৌড়েশ্বর অপ্রতিভ হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। কবিদ্বয় এই বৃহৎ ব্যাপারের যেরূপ বর্ণনা করিয়া বাসুড়ী হইতে সিমুল যাইবার পথে যে যে স্থানের

নাম করিয়াছেন সে সমস্ত স্থান অদ্যাপি বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়।

হরিপাল রাজার রাজ্য ষোল ক্রোশব্যাপী ;—

সহরের লোক সব হলো হুলুস্থূল।
প্রমাদে পড়িয়া কেহ নাহি বান্ধে চুল ॥
ধন কড়ি ধান্য কেহ রাখে মাটি খুঁড়ে।
সভয় সকল লোকে ষোল ক্রোশ জুড়ে ॥

ঘনরাম ১৯৯ পৃঃ।

এই ষোল ক্রোশ মধ্যে হরিপালের পাঁচটী গড় ছিল যথা ;—বাহির গড়, পাথর গড়, লোহার গড়, তাঁমার গড় এবং ভিতর গড়।

রাজার মোকামে সবে দেখে শূন্যাকার।
চীল উড়ে গগনে বাহির গড় পার ॥

ঘনরাম ২১৪ পৃঃ।

বাহির গড় এক্ষণে বাহির-গড়া নামে একটী পৃথক গ্রাম, জাঙ্গিপাড়া কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত। এখন সেখানে রাজা বিষ্ণু দাসের বংশধরেরা বাস করেন।

ভিতর গড়ের দ্বারে রাখ বসাইয়া।
বাড়ায়ে বীরের আশ এসো পিছুইয়া ॥

ঐ ২১৫ পৃঃ।

তড়বড়ি ত্বরায় পাথর গড় পায়।
মার মার বলি বীর তাড়াইহা যায় ॥
বিপরীত গর্জ্জন গমনে বহে ঝড়।
প্রাণ লয়ে ধুমসী লোহার পায় গড় ॥

সমর দুরন্ত কালু যায় তাড়াতাড়ি।
ধুমসী ভাঁমার গড়ে ধায় তড়বড়ি॥
পাঁচ গড় পেরুলে তথাপি দেয় তাড়া।
ধুমসী খুমসী ফিরে ধরে ঢাল খাঁড়া॥

ঘনরাম ১১৫ পৃঃ।

এই সকল গড় এখন ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে পরিণত হইয়াছে। হরিপাল সন্নিহিত বাহিরখণ্ড নামক গ্রাম রাজা হরিপালের বাড়ীর বাহিরের খণ্ড। হরিপাল গ্রামের নিকটবর্ত্তী বন্দীপুর গ্রাম পূর্ব্বে রাজা হরিপালের বন্দীশালা ছিল;—

তখন বান্ধিয়া দাসী থুইল বন্দীশালে।
খেতে খেতে অজ্ঞান গরল গলে গালে॥

ঐ ঐ

বাসুড়ীর গড় হরিপাল হইতে চারি ক্রোশ মাত্র পশ্চিমে—এক প্রহরের পথ। কবি ঠিকই বলিয়াছেন;—

এত শুনে লাউসেন সচঞ্চল চিত।
হরিপালে ধরে লয়ে গমনে ত্বরিত॥
পার হয়ে কর্জ্জনা কর্ম্মুক বৃকদরে।
সাত দণ্ডে উপনীত সিমুল নগরে।

মাণিক গাঙ্গুলী ১৪৯ পৃঃ।

মাণিক গাঙ্গুলী বলিয়াছেন সিমুলনগর ব্রাহ্মণী নদীর তীরে;—

বীর কালু আগুয়ান বার ডোম চলে।
বায়ুগতি উপনীত ব্রাহ্মণীর কূলে॥

ঘনরাম বলেন বিমলা নদীর তীরে সিমুল নগর ;—

দিবস রজনী চলে নাহি রহে স্থির।
সিমুলা সমীপে গেলা বিমলার তীর ॥

১৯৮ পৃঃ।

কবি দুইজন দুইটী পৃথক নদীর তীরে সিমুল নগরের অবস্থিতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে হরিপাল গ্রামের নিকট দিয়া দুইটী নদী প্রবাহিত ছিল, একটীর কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ইহার নাম কৌশিকী, এই নদী উত্তর দক্ষিণে প্রবাহিতা, আর একটী নদী এই গ্রামের কিছুদূর উত্তর দিক দিয়া পূর্ব্ব পশ্চিমে প্রবাহিতা, যাহাকে ধর্ম্মমঙ্গল প্রণেতা সহদেব চক্রবর্ত্তী দামোদর বলিয়া গিয়াছেন ;—

বন্দীপুরে বন্দিব ঠাকুর শ্যমরায়।
দামোদর যাহার দক্ষিণে বয়্যা যায়।

বস্তুতঃ ইহাই প্রাচীন দামোদর। দামোদর বর্ত্তমান খাতে প্রবাহিত হইবার পূর্ব্বে যে পথে প্রবাহিত হইত তাহা পাড়াম্ব, সাহাবাজার, দ্বীপা, দ্বারহাটা, হাওড়ার জগৎবল্লভপুর প্রভৃতি গ্রাম দিয়া—বন্দীপুরের দক্ষিণ দিয়া যে নদী প্রবাহিতা তাহাই হরিপাল গ্রামের কিছুদূর উত্তর দিয়া পূর্ব্বমুখে চলিয়া গিয়াছে, সম্ভবতঃ উহাই ব্রাহ্মণী বা বিমলা নামে প্রসিদ্ধ ছিল, কালে ঐ নাম লুপ্ত হইয়াছে।

হরিপাল রাজার প্রতিষ্ঠিত দেবীমূর্ত্তি অদ্যাপি হরিপাল গ্রামে দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার বর্ত্তমান নাম চণ্ডাল-কন্যা বিশালাক্ষী। বিশালাক্ষীর নামান্তর রঙ্কিণী। তাঁহার চতুর্দ্দিকে চণ্ডাল-পল্লী ছিল, দেবী শ্মশানালয়বাসিনী ছিলেন। চণ্ডালেরা সেকালের হিন্দু-

রাজাদের আমলে সৈনিকের কাজ করিত। অনেকদিন পূর্ব্বে চণ্ডাল দলপতি পুত্রের বিবাহ দিয়া বর-কন্যা গৃহে আনিবার পূর্ব্বে দেবীকে প্রণাম করাইবার জন্য দেবী-মণ্ডপে উপস্থিত হইয়া দেখিল সঙ্গে কিছুমাত্র নাই যে প্রণামী দেয়, অগত্যা বরকন্যাকে সেইখানে রাখিয়া পয়সা আনিতে বাড়ী যায়, ফিরিয়া আসিয়া দেখে কন্যা নাই—দেবীর শ্রীমুখাগ্রে চেলীর সাটীর দশি ঝুলিতেছে। চণ্ডাল দলপতি কাতরভাবে দেবীর নিকট প্রার্থনা জানাইল—"মা কন্যাকে দেন।" প্রত্যাদেশ হইল—"আমি কন্যাকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছি, অদ্যাবধি সকলে যেন আমাকে চণ্ডাল-কন্যা বিশালাক্ষী বলে।" তজ্জন্য সকলেই তাঁহাকে এই নামে অভিহিত করিয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে তাঁহার নিকট নরবলি হইত। তাহা বন্ধ হইবার সম্বন্ধেও একটী চিরাগত কিম্বদন্তী আছে। বর্ত্তমান পুরোহিতের প্রপিতামহ মহাদেব চক্রবর্ত্তী একদিন দেবীর পূজা করিতে যাইতেছিলেন এমন সময় তাঁহার শিশু-পুত্র তাঁহার সঙ্গে যাইতে চাহিলে তিনি তাহাকে নিষেধ করিয়া চলিয়া যান। শিশু-পুত্র যে তাঁহার অনুসরণ করিল তাহা তিনি জানিলেন না। মহাদেব দেবীর পূজা করিলেন, নিত্য যেমন একটী করিয়া শিশু-পুত্র বলির জন্য আসে সেদিনও তেমনি আসিল, ঘাতক কর্ম্মকার প্রতিদিনের ন্যায় এদিনও শিশুকে স্নান করাইয়া আনিয়া পুরোহিতকে দিলে তিনি উৎসর্গ করিয়া দিলেন এবং কর্ম্মকার খড়্গাঘাতে তাহার মস্তক ছেদন করিল। পুরোহিত-ব্রাহ্মণ বাড়ী আসিয়া পত্নীর নিকট পুত্রের অনুসন্ধান করায় জানিলেন—পুত্র তাঁহার সঙ্গেই গিয়াছিল। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী প্রমাদ গণিলেন, উভয়েই দেবীর নিকট গিয়া কাঁদিতে লাগিলেন—"মা আমাদের পুত্র আনিয়া দাও।" পুত্র

কর্ম্মকার-হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ-দম্পতির কাতর ক্রন্দনে দেবী প্রসন্ন হইয়া দৈববাণীতে বলিলেন—

"বালক হাট-চালায় খেলা করিতেছে সেখানে খুজিলেই পাইবে। অতঃপর আর এখানে নরবলি হইবে না।"

ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী হাটে আসিয়া তাঁহাদের পুত্রকে দেখিতে পাইয়া কোলে লইলেন, সেই অবধি নরবলি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ইহা শত বর্ষের অধিক কালের কথা নহে।

মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গলের যে ভূমিকা সাহিত্য পরিষদে প্রকাশিত হইয়াছে তাহার লেখক এই হরিপাল গ্রামকে পাণ্ডুয়ার নিকট সিমলা গড় বলিয়াছেন, তাহা কতটা সঙ্গত পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন।

দ্বারহাট্টা—হরিপাল হইতে ইহা দুই আড়াই ক্রোশ মাত্র। এখানে ওলন্দাজ ও দিনেমারদের বাণিজ্য-কুঠী ছিল, তাঁহারাও সরকার গোমস্তা দ্বারা দূরবর্ত্তী স্থান হইতে কার্পাসসূত্রনির্ম্মিত সূক্ষ্ম বস্ত্র এবং নানাপ্রকার রেসমী কাপড় আমদানি করিয়া নানা স্থানে পাঠাইতেন, তাঁহাদের দ্বারা নীলকুঠীও চলিত।

আগাই গড়—আরাম-বাগ মহকুমার কুমারগঞ্জ গ্রামের নিকটবর্ত্তী আগাই নামক গ্রামে একটী চতুর্দ্দিকে পরিখাবেষ্টিত গড়ের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এখানেও রাজা ছিলেন, তাঁহার রাজ্যও ছিল। কিন্তু আজি আগাই সামান্য পল্লী মাত্রে পরিণত। পূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যগৌরবের কিছুমাত্র নাই।

রসুলপুর—হুগলী জেলার পুড়শুড়া হইতে প্রায় ৩।৪ মাইল উত্তরে দামোদর তীরে অবস্থিত। ইহার পূর্ব্ব নাম ভগীরথ পুর। প্রায় ছয় সাত শত বৎসর পূর্ব্বে জয়হরি চক্রবর্ত্তী নামে এক

ব্রাহ্মণ এখানে রাজত্ব করিতেন, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে কে কতকাল রাজ্য করিয়াছিলেন তাঁহার কোন নিদর্শন নাই। সাধারণে এখনও বামুন রাজার নাম করিয়া থাকে। এই রাজার গড়, বাড়ী তাঁহার অন্তঃপুর মধ্যস্থিত জয়হরি (অধুনা জলহরি নামে খ্যাত) পুষ্করিণী এবং বিধবা কন্যা লীলাবতীর প্রতিষ্ঠিত লীলাপুকুর অদ্যাপি তাঁহাদের স্মৃতিরক্ষা করিতেছে। জয়হরি চক্রবর্ত্তীর কুলদেবতা বিশালাক্ষীও এখন রসুলপুরগ্রামে আছেন। রাজা জয়হরি স্বধর্ম্ম নিষ্ঠ সদ্‌ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহার পুত্র ছিল না।

সাধারণে বলে সা মনসুর নামে এক ফকির এখানে আসিয়া একটী বিড়ালের গলায় গোমাংস (কাহার মতে গোহাড়) বাঁধিয়া রাজার ভোজনকালে রাজান্তঃপুর মধ্যে ছাড়িয়া দিলে বিড়াল রাজার ভোজন পাত্র মুখ দ্বারা স্পর্শ করায় রাজা আপনাকে স্বধর্ম্মভ্রষ্ট জ্ঞানে সপরিবারে জয়হরি পুষ্করিণীর জলে ডুবিয়া প্রাণ-ত্যাগ করেন। বস্তুতঃ এরূপ ঘটনা নিতান্ত অসম্ভব। হিন্দুরাজা আপনার ধর্ম্মতত্ত্ব ভালই বুঝিতেন, প্রায়শ্চিত্ত করিলেও এরূপ অনৈচ্ছিক বা অজ্ঞানকৃত অপরাধে মুক্তিলাভ ঘটিত, তাহা না করিয়া তিনি যে আত্মহত্যারূপ গুরুতর অপরাধে লিপ্ত হইবেন ইহা বালকেও বিশ্বাস করিতে পারে না। আমরা কয়েকটী প্রাচীন ব্রাহ্মণের নিকট শুনিয়াছি সা মনসুর ফকির থাকিলেও তিনি রাজ্য-লালসার বশবর্ত্তী না হইলে এমন কাজ করিতে কথনও প্রবৃত্ত হইতেন না। প্রকৃত প্রস্তাবে সাঁ মনসুর সৈন্য সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইয়া জয়হরির রাজ্য আক্রমণ করিলে জয়হরি আপনার সৈন্যবল লইয়া শত্রুর সম্মুখীন হইবার জন্য বাহির হয়েন, যাইবার কালে রাণী ও তাঁহার কন্যা লীলাবতীকে বলিয়া যান যে

আমি সঙ্গে কয়েকটি পায়রা লইয়া চলিলাম, যতক্ষণ জীবিত থাকিয়া যুদ্ধ করিব ততক্ষণ পায়রাগুলিকে যত্নে রক্ষা করিব, আমার মৃত্যু হইলে পায়রা উড়িবে। তখন তোমাদের যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিবে। গড়ের পূর্ব্বদিকে যে ময়দান অকর্ষিত অবস্থায় বহুদিন পর্য্যন্ত ছিল, সেই ময়দানে সা মনসুরের সহিত জয়হরির যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে রাজা প্রাণত্যাগ করিলে পায়রা কয়েকটী উড়িয়া গড়ের দিকে চলিয়া যায়। তাহা দেখিয়া রাণী ও রাজকন্যা জয়হরি পুষ্করিণীর জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করেন। ইহাতেই বামুন রাজার রাজ্য সা মনসুরের হস্তগত হয়। সা মনসুরের আরও তিন ভ্রাতা এদেশে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন পীরত্ব পাইয়া আঁকড়ি শ্রীরামপুরে অবস্থিতি করিতেন। পাড়াস্থ সাহাবাজারের পীর গোলামালি সাহেব এক ভ্রাতা, আর এক ভ্রাতা মায়াপুরের বাবা গয়েস পীর। রাজ্যলাভ করিয়া সা মনসুর আপনার একজন শিষ্যকে রসুলপুরে স্থাপিত করেন, তিনি নবাব সরকার হইতে খাঁ চৌধুরী উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। কয়েক পুরুষ পরে কেবল মাত্র চৌধুরী উপাধি থাকে। উপস্থিত যাঁহারা গড়ের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে ডাক্তার শ্রীযুক্ত গোলাম হোসেন চৌধুরীর প্রপিতামহের পিতৃব্য বর্দ্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ নামক স্থানের চৌধুরী বংশীয় এক ব্যক্তি সা মনসুরের চেলার বংশধরের কন্যাকে বিবাহ করিয়া শ্বশুরের অপুত্রত্ব প্রযুক্ত এইখানেই বসবাস করেন এবং তাঁহার বিষয়-বৈভবের উত্তরাধিকারী হয়েন। ডাক্তার গোলাম হোসেন চৌধুরী বলেন তিনি সা মনসুরের চেলা হইতে ২৪।২৫ পুরুষ অধস্তন, তাহা হইলে রাজা জয়হরি চক্রবর্ত্তীর রাজত্বকাল বর্ত্তমান সময়ের প্রায় সাড়ে ছয়শত বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী অর্থাৎ খৃষ্টীয় শকের

১১৭৫।৮০ বলিয়া স্থির করিতে পারা যায়। ফলে তখনও সপ্তগ্রাম পাণ্ডুয়া, দ্বারবাসিনী প্রভৃতি প্রাচীন স্থানে হিন্দু রাজা রাজত্ব করিতেন। ইহা কতকটা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়, এজন্য আমাদের মনে হয় যে সা মনসুরের চেলা চৌধুরী বংশীয় বর্ত্তমান বংশধর হইতে ২৪।২৫ পুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তী হওয়া নিতান্ত অসম্ভব ১৬।১৭ পুরুষ হওয়া অসঙ্গত নহে।

গড়ের মধ্যে একটী স্থানের নাম আছে গর্দান হানা– বোধ হয় এইস্থানে গুরুতর অপরাধীগণের কণ্ঠচ্ছেদরূপ দণ্ড সম্পাদিত হইত। নামেই বুঝা যাইতেছে মুসলমান-রাজত্বে উহার নামকরণ হইয়া থাকিবে। মায়াপুরের বিবরণে ইহার অনেকটা খোলসা বলা যাইতে পারিবে।

রাজা জয়হরির রাজবাটীর যে ভগ্নস্তূপ আছে তাহা হইতে এখন যে সকল ইষ্টক বাহির হয় সেই সকল ইষ্টক লৌহদণ্ডের আঘাতেও চূর্ণ হয় না। দেখিতেও এখনকার ইটের ন্যায় নহে।

বাসুড়ী—ইহার প্রাচীন নাম বাসডিঙ্গা বা বাসুড়িয়া, [illegible]রে নদের প্রায় দুই মাইল পূর্ব্বদিকবর্ত্তী – থানা জাঙ্গিপাড়া কৃষ্ণনগরের এলাকায়। আনুমানিক খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে এখানে বেনুরায় নামক এক হিন্দু রাজা রাজত্ব করিতেন। গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপাল তাঁহার বৈবাহিক। ধর্ম্মপালের পুত্র, বেনুরায়ের কন্যা, ধর্ম্মমঙ্গল প্রণেতা মাণিক গাঙ্গুলীর মতে ভানুমতীর এবং ঘনরামের মতে বিমলার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।

> "বেনুরায় অভিধান বাসুড্যায় বাস।
> ধর্ম্মশীল ধনে ধন্য ধরায় প্রকাশ॥
> বিমলা বনিতা তার বৈদগ্ধী অতি।
> সুশীলা সতত চিন্তা সংকৃতা সুমতি॥"

বেনুরায়ের পরলোক প্রাপ্তিতে তাঁহার

প্রজাপীড়ন আরম্ভ করিলে প্রজাগণ রাজ্য ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। রাজ্য প্রজাশূন্য হইল, অবিবাহিতা ভগ্নী রঞ্জাবতীকে লইয়া মাহুদ্দা গৌড়নগরে আপন জ্যেষ্ঠ ভগ্নিপতি গৌড়েশ্বরের আশ্রয় লইলেন, কালক্রমে তিনি গৌড়েশ্বরের প্রধান মন্ত্রিত্ব পাইয়া প্রভূত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিলেন। বাসুড়ীর গড় রাজা হরিপালের হস্তগত হইল। হরিপাল গৌড়েশ্বরের একজন সামন্ত রাজা—তাঁহার রাজধানীর নাম শিমুল, তাঁহার নামানুসারে পরে শিমুল নগরের নাম হয় "হরিপাল"। উহা অধুনা এই জেলার একটী থানা এবং তারকেশ্বর রেলপথের একটী ষ্টেশন। হরিপাল নামক প্রবন্ধে তাহার বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। বাসুড়ীর নিকটবর্ত্তী পিয়াশাড়া গ্রামে একঘর জমিদার আছেন। এখন তাঁহাদের অবস্থা আর পূর্ব্ববৎ নাই। ৺আনন্দরাম ও ৺বাহিরদাস সরকারের নাম আজিও অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদের প্রতাপে এককালে বাঘে বলদে একঘাটে জল খাইত।

কাইতি।—বর্দ্ধমান জেলার রায়না থানার অন্তর্গত এই গ্রাম। প্রবাদ এই যে এখানে বাণ রাজার রাজধানী ছিল। কাইতির চতুর্দ্দিকে গোলাকারে অগ্নিগড় বেষ্টিত ছিল। গ্রামের চতুর্দ্দিকে ৩।৪ হাত মৃত্তিকা খনন করিলে অঙ্গার প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বাণ রাজার প্রতিষ্ঠিত বাণেশ্বর নামে শিব এখনও এখানে আছেন। গ্রামের বাহিরে উষাপোতা নামে এক বিস্তৃত ডাঙ্গা আছে। এখানে উষাপতি অনিরুদ্ধের সহিত বাণ রাজার যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। আলমপুর নামক নিকটবর্ত্তী একটী গ্রামে এক প্রকাণ্ড অকর্ষিত তৃণময় ময়দানে বাণরাজার দুর্গাদির চিহ্ন এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

কাইতি গ্রামে অনাবৃষ্টি জন্য কখন অজন্মা হইবার কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। দিনাজপুরেও নাকি এইরূপ এক স্থানে বাণ রাজার রাজধানী ও দুর্গাদির চিহ্ন আছে বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। বর্দ্ধমান জেলার এই কাইতি গ্রাম বা দিনাজপুরের বাণ রাজার গড়ের মধ্যে, প্রকৃত প্রস্তাবে কোনটী বাণ রাজার বাসভূমি ছিল তাহার অনুসন্ধান হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। বাণ রাজার সময় দ্বাপরের শেষে কলিযুগের প্রারম্ভে—অতএব ইহা অল্পদিনের কথা নহে। কুরুক্ষেত্রে কুরুপাণ্ডবগণের সুপ্রসিদ্ধ যুদ্ধের অতি অল্পকাল মধ্যেই ঊষাহরণ ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল।

ভঞ্জভূম।—ভূমিজ শব্দ হইতে ভঞ্জভূম নামের উৎপত্তি। ইহা অতি পূর্ব্বে ভূমিজ জাতীয় রাজাদের রাজত্ব ছিল। তাঁহারা বহুকাল এই রাজত্ব ভোগ করিলে বংশলোপ প্রযুক্তই হউক বা যুদ্ধে হারিয়াই হউক থরিয়া-মাজিদের হস্তগত হয়। মাজিরাও কিছুদিন ইহাতে রাজত্ব করে। তাহাদের বংশের শেষ রাজা সুরত সিংহের রাজত্বকালে গৌড়ের মুসলমান নবাব সুলেমান উড়িষ্যার রাজা মুকুন্দ দেবের রাজ্য আক্রমণ জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। সুরত সিংহ মুকুন্দদেবের একজন সামন্ত রাজা ছিলেন। মুকুন্দদেব মুসলমানদের সহিত সংগ্রাম জন্য তাঁহার সাহায্য চাহিয়া পাঠাইলে সুরত সিংহ তাঁহার দেওয়ান ও সেনাপতি লক্ষ্মণ সিংহকে সৈন্য সঙ্গে পাঠাইয়া দেন। লক্ষ্মণ সিংহ প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ করিয়া মুসলমানদিগকে দূরীকৃত করিয়া দিলে মুকুন্দদেব তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে মেদিনীপুরের রাজা করিয়া একদল সাহসী ও সমর্থ সৈন্য দেন। ভঞ্জভূমের অপর নাম মেদিনীপুর। লক্ষ্মণ সিংহ উড়িষ্যা হইতে ফিরিয়া-আসিয়া সুরত সিংহের

গড়সরদার বলরামপুরের জমিদার এবং নায়েব গড়সরদার নারায়ণগড়ের জমিদার এই তিন জনে ষড়যন্ত্র করিয়া সুরত সিংহকে হত্যা করে এবং তিন জনে তাঁহার রাজ্য ভাগ করিয়া লয়। কেদার ও থরকপুরের রাজারাও সুরত সিংহের অধীন ছিল অর্থাৎ তাঁহাদের রাজ্য ভঞ্জভূমের অন্তর্গত ছিল—মেদিনীপুর প্রবন্ধে লক্ষণ সিংহের বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া হইবে।

গড় ভবানীপুর।—ইহা হওড়ার অন্তর্গত সিংটী শিবপুর থানার অন্তর্গত একটী গ্রাম, আমতা ইইতে ৫।৬ মাইল দূরে অবস্থিত। মুসলমানদের আমলে প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে এক বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ রাজা এথানে রাজত্ব করিতেন। এই রাজ্য প্রতিষ্ঠাতার নাম উমেশচন্দ্র—তিনি স্বয়ং রাজোপাধি গ্রহণ করিলে মুসলমান নবাব কোন আপত্তি করেন নাই। রাজা নবাবকে বার্ষিক একটী স্বর্ণমুদ্রা, কয়েকটী খাসী ছাগল এবং এক মন ছাতু মাত্র দিয়া রাজত্ব ভোগ করিতেন। মুসলমান রাজত্বে হিন্দু রাজাগণ সকলেই যে এরূপ স্বল্প কর দিয়া অব্যাহতি পাইতেন তাহা নহে, তবে গড় ভবানীপুর সম্বন্ধে এইটী পৃথক বন্দোবস্ত বলিতে হইবে। মুসলমান রাজত্বে নবাবেরা হিন্দু জমিদারদের হাতে রাজত্ব দিয়া আপনারা বড় কিছু দেখিতেন শুনিতেন না, বার্ষিক রাজস্ব পাইলেই সন্তুষ্ট থাকিতেন। রাজ্যশাসন সম্বন্ধে বড় একটা খোজ খবরও রাখিতেন না। হিন্দু রাজা যাহা করিতেন তাহাই হইত। প্রজারাও অতি নিরীহ ছিল, চাসবাস করিত এবং জাতীয় বৃত্তিতেই সুখে কালযাপন করিত। রামজীবন স্মার্ত্তবাগীশ নামে জনৈক সুপণ্ডিত ব্যাসোক্ত ব্রাহ্মণ তাঁহার সভাপণ্ডিত ছিলেন। উমেশচন্দ্রের পুত্রের নাম গৌরীচরণ, তিনি পিতৃগুণে গুণবান বা

শক্তি সামর্থ্যশালী না থাকায় রাজ্যাধিকারে বঞ্চিত হয়েন। রাজ-লক্ষ্মী কৈবর্ত্ত জাতীয় রামকিশোর রায়কে আশ্রয় করিলে অদ্যাপি তাঁহার বংশধরেরা গড় ভবানীপুরের জমিদার। তাঁহার আদি বাস তাজপুর। তিনি জেলার কালেক্টরী করিয়া পশ্চাৎ সরকারী উকিল হয়েন এবং প্রভূত জমিদারী অর্জ্জণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম নসীরাম, পিতামহের নাম গয়ারাম।

রামকিশোরের তিন ভ্রাতা—রামপ্রসাদ, রামদেব ও রামজীবন, সর্ব্ব কনিষ্ঠের প্রপৌত্র মাননীয় শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ রায় এম, এ, বি, এল কলিকাতা হাইকোর্টের সুপ্রতিষ্ঠ প্লীডার, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য এবং সিণ্ডিকেটের মেম্বর, আইন ও গণিতের পরীক্ষক। তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত মন্মথ-নাথ রায় এম, এ; বি, এল, হাইকোর্টের উকিল, গণিতশাস্ত্রে রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তিপ্রাপ্ত। এক্ষণে তাঁহারা কলিকাতা ভবানী-পুরে অবস্থিতি করেন।

রামকিশোর রায়ের পুত্র নন্দকুমার, রামকুমার ও ব্রজনাথ। মধ্যম রামকুমার পারিবারিক কলহপ্রযুক্ত শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে তাজপুর হইতে গড়ভবানীপুরে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার চারি পুত্র—সারদাপ্রসন্ন, গঙ্গাপ্রসন্ন, কৃষ্ণপ্রসন্ন এবং রামপ্রসন্ন। গঙ্গাপ্রসন্ন নিঃসন্তান। বিস্তৃতিভয়ে সারদাপ্রসন্ন ও কৃষ্ণপ্রসন্নের বংশ-ধরগণের নাম লিখিত হইল না। রামপ্রসন্নের চারি পুত্র—পুণ্ডরিকাক্ষ এম, এ, নলিনাক্ষ, বটকৃষ্ণ ও সত্যবান। প্রথমের উপস্থিত এক পুত্র—কমলেন্দু।

নারায়ণ গড়।—মেদিনীপুর জেলায়। এখানে এক হিন্দু রাজা রাজত্ব করিতেন। তাঁহারই নামানুসারে ইহার নাম নারায়ণ

গড়। বি, এন, রেল-পথের পার্শ্বে এখনও ইহা আপনার নাম বজায় করিয়া রহিয়াছে। চারিশত বর্ষেরও অধিক কাল হইল কাশীশ্বর নামে এক ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী গঙ্গাতীরবর্ত্তিনী কোন পল্লী হইতে আসিয়া এখানে আপন আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থিতি করেন। কাশীশ্বর অতি সুন্দর পুরুষ ছিলেন। যখন তিনি এখানে আইসেন তখন দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন কিনা জানা যায় না। তাঁহার আগমনকালে এখানে দস্যু তস্করের ভয় বড় বেশী ছিল। গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী এখানে আসিয়া এক পরমা সুন্দরী ব্রাহ্মণ কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া গৃহী হইলেন। রূপের কুহকে পড়িয়া কাশীশ্বর সংসারের ফাঁস গলায় লইলেন—ভগবৎ চিন্তার সুগম পথ পরিত্যাগ করিলেন। কাশীশ্বরের একটী পুত্র জন্মিল তাহার নাম শ্রীচরণ, শ্রীচরণের বিবাহ হইল, তিনিও গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পুত্র নারায়ণ। কাশীশ্বরের অনেক শিষ্য সেবক ছিলেন — তাঁহার পুত্র শ্রীচরণ জমিদারী কিনিতে আরম্ভ করিলেন। নারায়ণ পৈতৃক সম্পত্তির যথেষ্ট উন্নতি দ্বারা রাজা উপাধি গ্রহণ করিলেন। ক্রমে নারায়ণ শর্ম্মা একজন দুর্দ্দান্ত রাজা হইয়া নিকটবর্ত্তী জমিদারদের জমিদারী কড়িয়া লইতে লাগিলেন। নারায়ণগড় তাহার রাজধানী হইল। তিনি রাজা হইয়া গড় খাত করিলেন, সৈন্য রাখিলেন, রাজৈশ্বর্য্যের কোন ত্রুটি রহিল না। অদ্যাপি তাঁহার খনিত গড় ও তাহার পরিখার চিহ্ন আছে। নারায়ণের পুত্রের নাম রাজা অম্বিকাপ্রসাদ, তাঁহার পুত্রের নাম ঈশ্বরপ্রসাদ, মধ্যে কয়েক পুরুষের নাম পাওয়া যায় নাই। শেষোক্ত রাজা জগন্নাথ প্রসাদ লোকান্তরবাসী হইলে তাঁহার রাণী—রাণী পার্ব্বতীদেবী কয়েক বৎসর রাজত্ব করেন,

মেদিনীপুর অঞ্চলের নানা স্থানে যে সকল কৈবর্ত্ত রাজা এই সময় প্রবল হইয়া উঠেন, তাঁহাদের মধ্যে তমোলুকের কৈবর্ত্ত রাজার সহিত নাড়াজোলের সৎগোপ রাজা মিলিয়া নারায়ণগড় আক্রমণ করিলে রাণী পার্ব্বতীদেবী পলায়নে প্রাণ-রক্ষা করেন। পশ্চাৎ তথায় কৈবর্ত্তের প্রাধান্য লোপ পায়, এবং সদ্‌গোপের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন উহা মহামহিমান্বিত ইংরাজ রাজের শাসনাধীন। চিরদিন কাহার সমান যায় না। এইরূপই চলিয়া আসিতেছে—একের উত্থান, অন্যের পতন, আবার উত্থিতের পতন, অবনতের উত্থান ইহাই সংসারের নিয়ম। যিনি ইহা বুঝিয়া অত্যাচার উৎপীড়ন ত্যাগ করিয়া শান্তভাবে চলেন তিনিই বুদ্ধিমান ও বিবেচক তাহার সন্দেহ নাই। তাঁহারই অভ্যুদয় দীর্ঘস্থায়ী হয়, ইহাই চিরন্তন পদ্ধতি।

দ্বারবাসিনী।—থানা পোলবার অন্তর্গত এই গ্রাম, এখানে বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলপথের একটী ষ্টেশন, একটী উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজী স্কুল, ডাকঘর ও পুলিশ-ফাঁড়ি আছে। দ্বার-বাসিনী একটী প্রসিদ্ধ গণ্ডগ্রাম, এখানে অনেক অবস্থাপন্ন লোকের বাস। একটী স্বচ্ছ-সলিলশালিনী স্রোতস্বতী ইহার নিকট দিয়া প্রবাহিতা, তাহার নিকটেই দ্বারবাসিনী গ্রামের প্রতিষ্ঠাতা রাজা দ্বারপালের প্রাসাদ প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ স্তূপাকারে দৃষ্টি-গোচর হয়। প্রবাদ এইরূপ যে, গৌড়েশ্বর মহীপাল রাজার তৃতীয় পুত্র দ্বারপাল শ্রদ্ধাবান হিন্দু ছিলেন বলিয়া বৌদ্ধ পিতার বিরাগ-ভাজন হওয়ায় এই স্থানে আসিয়া রাজ্য স্থাপন করেন। যোগ সিদ্ধ তান্ত্রিক গুরুর কৃপায় তাঁহার অন্তঃপুরবর্ত্তিনী একটী পুষ্করিণীর জলের মৃতসঞ্জীবনী শক্তি জন্মিয়াছিল। সেই গুরুকে দিয়া

রাজা দ্বারপাল দ্বারবাসিনী নামে এক দেবী প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এখন বীরভূম মল্লারপুরের নিকট অবস্থিতা। রাজার বংশধরেরা অনেক দিন দ্বারবাসিনীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। পাণ্ডুয়া বিজেতা সাহ—সুফি সৈন্য সামান্ত লইয়া দ্বারবাসিনী আক্রমণ করিলে দ্বারপালের তদানীন্তত বংশধর তুমুল যুদ্ধে যবনসৈন্য বিধ্বস্ত করেন। মুসলমানেরা জয়লাভে সমর্থ না হইয়া অনুসন্ধানে জানিলেন যে, রাজার অন্তঃপুর মধ্যে একটী পুষ্করিণী আছে, তাহার জলস্পর্শে মৃত ব্যক্তি জীবনলাভ করে, তদ্ব্যতীত রুগ্ন ব্যক্তি ব্যাধিমুক্ত ও সুস্থ স্বচ্ছন্দ হয়। মুসলমান সেনাপতি এক ফকিরের শরণাপন্ন হইলে তিনি রোগী সাজিয়া হিন্দু সন্ন্যাসীর বেশে রোগমুক্তির জন্য রাজার নিকটস্থ হইয়া প্রার্থনা জানাইলেন, রাজা প্রতারকের প্রবঞ্চনাজালে পড়িয়া তাঁহাকে স্নান করিবার অনুমতি দিলেন। ছদ্মবেশধারী ফকির স্নান করিতে যাইবার কালে ক্ষুদ্র গোমাংস একখণ্ড মুখগহ্বরে লুকায়িত করিয়া পুষ্করিণীর জলে মাংসখণ্ড ত্যাগ করিয়া উঠিয়া আইসেন। এই অপবিত্রতাদোষে পুষ্করিণী জলের সঞ্জীবনী শক্তি নষ্ট হয়। মুসলমান সেনাপতির যুদ্ধে যে সকল সৈনিক প্রাণ হারাইত সঞ্জীবনী পুষ্করিণীর জলে তাহাদের দেহ ফেলিলেই তাহারা জীবিত হইয়া পর দিন আবার যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইত, মুসলমান সৈন্য ক্ষয় করিত, অত.পর আর তাহা হইতে পারিল না। দুই এক দিনের যুদ্ধেই হিন্দু রাজার সৈন্যবল হীন হইয়া পড়িল, রাজা পরাভূত ও নিহত হইলেন। মুসলমান সৈন্য দ্বারবাসিনী অধিকার করিল। তদবধি দ্বারবাসিনী হইতে হিন্দু রাজত্ব বিলুপ্ত হইল। ইহা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর কথা। প্রবাদ এইরূপ যে, এখানে সংগোপ বাস করিলে

যে কোন রকমে হউক দৈবধন প্রাপ্ত হয় এ গ্রামে এজন্য সংগোপ বাস করিতে পায় না, প্রবাদ কতদূর দৃঢ়ভিত্তিক বলা যায় না। পূর্ব্বে দ্বারবাসিনীর জনসংখ্যা ছিল ২৭০০, খৃঃ ১৮৬৩ অব্দের জুলাই হইতে নবেম্বরের মধ্যে ম্যালেরিয়া জ্বরে ১৯০০ লোকের মৃত্যু আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কুকুর শৃগালের দৌরাত্ম্যে গ্রামের ভিতর দিয়া পথ চলিবার উপায় ছিল না। তাহারা শব-মাংস ভোজনে এতই ভয়ানক হইয়াছিল যে, সজীব মনুষ্যকেও দংশনোদ্যত হইত। গ্রামের পথে ঘাটে মাঠে যেখানে সেখানে মনুষ্যের শিরোকঙ্কাল স্তূপীকৃত। গ্রামপ্রান্তে মাঠের মধ্যে ২।৩ বৎসর পরেও রাশীকৃত নরমুণ্ড প্রায় ৫।৬ হাত উচ্চ হইয়া থাকিতে দেখা গিয়াছে। ম্যালেরিয়ায় দ্বারবাসিনীর প্রভূত প্রজাক্ষয় করিয়াছে। যাহাদের বিদেশে আশ্রয় মিলিয়াছিল তাহারাই পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইতে পারিয়াছিল।

দ্বারবাসিনী উত্তরপাড়ার স্বনামধন্য জমিদার ৺জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জমিদারী। তিনি ম্যালেরিয়ার সময় দ্বার-বাসিনীতে গবর্ণমেণ্ট হইতে ডাক্তার আনাইয়া পথ্যৌষধ দ্বারা সাধারণের যথেষ্ট উপকার সাধন করিয়াছিলেন এবং গবর্ণমেণ্টের সুখ্যাতিভাজন হইয়াছিলেন। কেবল দ্বারবাসিনী কেন সারাটী, মায়াপুর, হাট বসন্তপুর, মুতাডাঙ্গা প্রভৃতি হুগলী জেলার বহু গ্রামই তাঁহার স্বাধিকারভুক্ত থাকায় সর্ব্বত্র তিনি মুক্তহস্তে পীড়িতের জন্য পথ্য ঔষধ ও কুইনাইনাদি ঔষধ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বিতরণ করিয়াছিলেন।

মহানাদ।—ইহাও এককালে মহা সমৃদ্ধিশালী জনপদ ছিল। হিন্দু রাজার রাজধানী, হিন্দু সৈন্যের বিহারভূমি, হিন্দু

আমাত্যের বুদ্ধিবিদ্যার লীলাক্ষেত্র ছিল। ইহা পাণ্ডুশেখর নামে এক রাজার রাজ্য ছিল—বলা যায় না, তিনিও হয়ত পাণ্ডুয়ার প্রতিষ্ঠাতা পাণ্ডুশাক্যের বংশধর ছিলেন। নতুবা পাণ্ডু নামের পরিচয় কেন থাকিবে। শুনা যায় গোরক্ষনাথ এই শৈব পীঠে অনেক দিন ছিলেন। সম্ভবতঃ পাণ্ডু বিজয়ের পর মুসলমান সেনাপতি মহানাদ আক্রমণ করিয়া, সম্মুখ সমরে হিন্দু রাজাকে নষ্ট করিলেন, তাঁহার রাজ প্রাসাদ ভাঙ্গিলেন, পুস্তকালয় দগ্ধ করিলেন, সর্ব্বস্ব হরণ করিলেন, দেব মন্দির চূর্ণ করিলেন, হিন্দুত্বের কোন পরিচয় রাখিলেন না। প্রকৃতিপুঞ্জের কাতর কণ্ঠস্বরে মেদিনীমণ্ডল কাঁপিয়া উঠিল, তাহারা নিরাশ্রয় হইল, স্ত্রী, পুত্র, পরিজনবর্গের রক্ষার জন্য বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র পলায়ন করিল। মহানাদের রাজান্তঃপুরেও মৃতসঞ্জীবনী শক্তিশালিনী এক পুষ্করিণী ছিল। দ্বারাবাসিনীর ন্যায় কৌশল অবলম্বনে এক মুসলমান ফকির গোমাংস দ্বারা তাহার জল কলুষিত করিলে রাজার মৃত সৈন্যের প্রাণ প্রাপ্তির অন্তরায় ঘটিল এবং তাঁহাকে শত্রুহস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হইল। দ্বারবাসিনী হইতে মহানাদ এক ক্রোশ মাত্র, এরূপ নিকটবর্ত্তী দুই রাজার অস্তিত্বে মনে হয় এখন যেমন নিকটে নিকটে জমিদারদের বাস দেখিতে পাওয়া যায়, তখনও সেইরূপ ছিল। দিদিমার গল্পে যে—"রাজপুত্র, পাত্রের পুত্র, এক রাজার রাজ্য হইতে অন্য রাজ্যে"—দিনের মধ্যে পাঁচ ছয় রাজার রাজ্যে ভ্রমণ করিতেন বলিয়া শুনিতাম এরূপ কাছে কাছে রাজ্য না হইলে তাহা কখন সম্ভবিতে পারিত না। মহানাদে এক মহাদেব আছেন। তাঁহার প্রকাণ্ড মন্দিরও আছে। প্রতি বৎসর শিবচতুর্দ্দশীতে যাত বসে। শুনা

যায় যোগী মীননাথ, গোরক্ষনাথ অনেক দিন এখানে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহাদিগকে শৈব মনে করিতে হয়। বাল্যকালে এখানে অনেক দেবীমূর্ত্তি দেখিয়াছি—সকল গুলিই প্রায় তন্ত্রোক্ত দশ মহাবিদ্যা বা অষ্টাদশ মহাবিদ্যার কোন কোনটীর প্রতিমূর্ত্তি। সচরাচর সে সকল মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। এ সকল শাক্ত প্রভাবের পরিচয়। বোধ হয় এখানে তান্ত্রিক শাক্ত ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব ছিল। প্রবাদ বাক্যে শুনিয়াছি এখানকার হিন্দু রাজা কাশীর আদর্শে তাঁহার রাজধানী গঠিত করিবার জন্য এতাধিক দেবদেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। মহানাদ এবং দ্বারবাসিনীর মধ্যপথে মেনাগর নামে এক অতিকায়া দীর্ঘিকা আছে। তাহার দৈর্ঘ্য অর্দ্ধ মাইলের উপর হইবে।

মল্লভূমি বিষ্ণুপুর।— মল্ল শব্দের অর্থ কুস্তিগীর বা বাহুযুদ্ধনিপুণ। পুরাকালে বাগ্দিরাই একাজে পটু ছিল, যুদ্ধবিগ্রহে তাহারাই তীর চালাইত, গুলি ছুড়িত, ঢাল শড়কী লইয়া রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইত। তাহারাই রাঢ়দেশের আদিম নিবাসী, তাহারাই রাঢ় চুয়াড় নামে অভিহিত। পুরাণে বাগ্দির উৎপত্তি সম্বন্ধে লিখিত আছে, ক্ষত্রিয় মাতা পিতার গর্ভৌরসে তাহাদের জন্ম। তৎকালে ক্ষত্রিয় পত্নী ঋতুমতী ছিলেন বলিয়া তদুদ্ভূত পুত্রের পাতিত্য জন্মে। ফলে অতি প্রাচীনকাল হইতে তাহারা রাঢ়ের অধিবাসী। মল্ল শব্দ হইতে এ দেশের নাম হইয়াছে—মল্লভূমি। মল্লশব্দের অপভ্রংশে মাল বা মালভূমি হইতে মানভূম নামের উৎপত্তি। মানভূম এক সময়ে মল্লভূমির অন্তর্গত ছিল। প্রাচীন গ্রীকেরা ইহাকেই Malle বলিতেন। এই মল্লভূমিতে এক মল্ল রাজ লাউগ্রামে রাজত্ব করিতেন। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে

শ্রীবৃন্দাবনের নিকটবর্ত্তী জয়নগর গ্রামের এক ক্ষত্রিয় দলপতি জগন্নাথ তীর্থদর্শনে বহির্গত হইয়া লাউগ্রামের নিকটবর্ত্তী বনভূমিতে উপস্থিত হইলে, পূর্ণগর্ভা ক্ষত্রিয় পত্নীর প্রসববেদনা উপস্থিত হয়। তীর্থগামী ক্ষত্রিয় পত্নীকে তদবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া গন্তব্য স্থানে চলিয়া যান। ক্ষত্রিয়কন্যা যথাকালে দিব্যলাবণ্য শোভিত একটী পুত্র প্রসব করিয়া প্রাণত্যাগ করিলে, এক কুশ.মটে বাগ্দী তাহাকে কুড়াইয়া আপন বাড়ীতে আনায়ন করে এবং আপন পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিতে থাকে এবং তাহার নাম রাখে রঘু। রঘুর বয়স আট দশ বৎসর হইলে তাহার প্রতিপালক বাগ্দী তাহাকে এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে রাখালী করিতে দেয়। প্রিয়দর্শন রঘুকে ব্রাহ্মণ ও তাঁহার পত্নী পুত্রের ন্যায় ভাল বাসিতেন। রঘুনাথ অন্যান্য রাখাল বালকগণের সঙ্গে গরু চরাইতে বনে যাইত। এক দিন মধ্যাহ্নকালে অন্যান্য রাখাল বালকেরা গরু লইয়া বাড়ী ফিরিল কিন্তু রঘু বাড়ী আসিল না দেখিয়া ব্রাহ্মণ রঘুর অনুসন্ধানে বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন—এক শাল বৃক্ষমূলে রঘু শয়ন করিয়া আছে আর একটী বিষধর সর্প তাহার মুখের উপর ফণা ধরিয়া রহিয়াছে। তাহা দেখিয়া ব্রাহ্মণের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল, তিনি ভাবিলেন ঐ সর্পের দংশনে রঘু নিশ্চিতই প্রাণ হারাইয়াছে, ব্রাহ্মণ রঘুর দিকে অগ্রসর হইলে সর্প চলিয়া-গিয়া বনে প্রবেশ করিল। ব্রাহ্মণ রঘুর নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, রঘু ঘুমাইতেছে। তখন ব্রাহ্মণের আনন্দের সীমা রহিল না, রঘুকে জাগাইলেন। রঘু প্রভুকে দেখিয়া ভয়ে জড়সড় হইল, ইতস্ততঃ গরুর অনুসন্ধান করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, গরুগুলি তৎপূর্ব্বেই ব্রাহ্মণের বাটীতে উপস্থিত হইয়াছিল।

ব্রাহ্মণ সেদিন হইতে রঘুর গরু চরান বন্ধ করিয়া তাহাকে গুরু-মহাশয়ের পাঠশালায় পাঠাইয়া দিলেন, রঘু অল্প দিনে অনেক শিখিয়া ফেলিল। কিছুদিন পরে লাউগ্রামের মল্লরাজার মৃত্যু হইল, তাঁহার পুত্রেরা নিতান্ত অকর্ম্মণ্য এবং রাজতক্তের অনুপযুক্ত দেখিয়া রাজহস্তী ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, পথিমধ্যে রঘুকে দেখিতে পাইয়া, তাহাকে শুঁড়ে জড়াইয়া পৃষ্ঠে তুলিল এবং রাজ-বাড়ীতে আনিয়া রাজতক্তে বসাইল, আমাত্যগণ রঘুকেই রাজা বলিয়া মানিল।

১। আদিমল্ল—রঘু লাউগ্রামের শূন্য সিংহাসন পূর্ণ করি-লেন। সেকালে রাজার মৃত্যুর পর তাঁহার উপযুক্ত পুত্র না থাকিলে এইরূপে রাজহস্তী রাজা খুজিয়া লইত, তাহাতে কাহারও আপত্তি থাকিত না, প্রজাগণ ভক্তিভাবে তাঁহকেই রাজসম্মান অর্পণ করিত। রঘু আদিমল্ল নামে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন। রাজত্ব করিতে করিতে তিনি এক দিন শ্যেনপক্ষী লইয়া শীকারে বহির্গত হয়েন এবং এখন যেখানে বিষ্ণুপুর সেই স্থানটী তখন অরণ্যময় ছিল, তথায় এক বককে আকাশমার্গে উড্ডীয়মান দেখিয়া রাজা তাহার প্রতি আপন শ্যেনকে ছাড়িয়া দিলেন। শ্যেন অভ্যাস প্রবুক্ত বককে আক্রমণ করিল বটে, কিন্তু বক আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়া শত্রুকে পরাভূত করিল এবং শ্যেন ভূতলে পড়িয়া ছটফট করিতে লাগিল, কিয়ৎকাল পরেই প্রাণত্যাগ করিল। ইহা দেখিয়া রাজা সেই স্থানে দৈবশক্তির অস্তিত্ব অনুভব করিয়া সেইখানেই রাজধানী সংস্থাপিত করিলেন এবং আপন অভীষ্টদেব বিষ্ণুর নামানুসারে ইহার নাম রাখিলেন—বিষ্ণুপুর। আদিমল্লের রাজ্যাধিকার প্রাপ্তির দিন হইতে বিষ্ণুপুরে

এক অব্দ গণনা হইয়া থাকে তাহার নাম মল্লাব্দ। রঘুনাথ বা আদিমল্ল সন ১২২ সালে খৃষ্টীয় ৭১৫ অব্দে রাজ্যারম্ভ করেন। লাউ-গ্রামের গাস্থেশ্বরীদেবীর মন্দির তাঁহারই নির্ম্মিত। রাজা রঘুনাথ তাঁহার প্রতিপালক ব্রাহ্মণকে নগদ লক্ষ টাকা এবং কিছু ভূ-সম্পত্তি দান করেন, তাঁহার বংশধরেরা অদ্যাপি তাহা ভোগ-দখল করিতে-ছেন ঐ গ্রামের নাম চাঁদপাড়া। বোধ হয় ব্রাহ্মণের নাম ছিল চন্দ্রনাথ বা চন্দ্রকুমার—তাঁহারই নামানুসারে উহার নাম হইয়াছে চন্দ্রপাড়া বা চাঁদপাড়া। রঘুনাথ সূর্য্য বংশীয় ক্ষত্রিয় রাজা ইন্দ্র সিংহের কন্যা চন্দ্রকুমারীকে বিবাহ করেন। তাঁহার বাসস্থান উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে। বিষ্ণুপুরের প্রধান রাজ কর্ম্মচারীর উপাধি কামদার। ৩৪ বৎসর রাজত্ব করিয়া আদিমল্ল রাজা রঘুনাথ পরলোক বাস করেন। বিষ্ণুপুরের অধিষ্ঠাত্রীরূপে যে মৃণ্ময়ী-দেবী অদ্যাপি বিদ্যমান আছেন তিনিও রাজা রঘুনাথ সিংহের প্রতিষ্ঠিতা। আদিমল্ল যখন বনমধ্যে স্বীকার করিতে গিয়া বকের দ্বারা বাজ-পক্ষীর পরাভবে সেই স্থানের দৈবীশক্তির অস্তিত্ব অনুভব করেন, তখন দৈববাণী হয় যে—সে স্থানে মৃণ্ময়ী-দেবীর মুখমণ্ডল ভূগর্ভে প্রোথিত আছে। প্রত্যাদিষ্ট হইয়া সেই স্থানের মৃত্তিকা খনন করাইলে দেবীর পাষাণময় মুখমণ্ডল দেখিতে পাওয়া যায়। রঘু-নাথ তাঁহার প্রতিষ্ঠা-কার্য্য সমাধা করিয়া মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। আদিমল্ল বিষ্ণুপুর নগর সংস্থাপিত করিলেও কিছুদিন তাঁহার রাজধানী লউগ্রামেই ছিল।

২। জয়মল্ল—ইনি আদিমল্লের পুত্র, ৩৪ মল্লাব্দে, বা ৭৪৯ খৃষ্টাব্দে রাজ্যাভিষিক্ত হয়েন, তিনি সূর্য্য-বংশীয় দিনু সিংহের কন্যাকে বিবাহ করেন, এবং ষট্‌চক্রবিহারী নামক দেবতার মন্দির

নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারীর নাম ভাগীরথী গোপ। ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিয়া রাজা জয়মল্ল পরলোক বাস করেন, তাঁহার দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠ বেনুমল্ল এবং কনিষ্ঠ ঈশ্বর মল্ল।

৩। বেনুমল্ল—পিতার পরলোক প্রাপ্তির পর বেনুমল্ল, (অম্বু-মল্ল) রাজ্যাধিকার লাভ করিয়া ত্রয়োদশ বর্ষ কাল রাজত্ব করেন। তিনি সূর্য্য-বংশীয় মতিয়ার সিংহের কন্যা কাঞ্চনমণিকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ৭৬ মল্লাব্দে বেনুমল্ল পরলোক বাস করেন।

তাঁহার পর ৪। কিনুমল্ল ৯ বৎসর, ৫। ইন্দ্রমল্ল ১৫ বৎসর, ৬। কাউমল্ল ৭ বৎসর, ৭। ঝাউমল্ল ১ বৎসর, ৮। সুরমল্ল ১২ বৎসর, ৯। কনকমল্ল ২১ বৎসর, ২১। কন্দর্পমল্ল ১০ বৎসর, ১১। সনাতনমল্ল ২৩ বৎসর, ১২। খড়্গমল্ল ২৭ বৎসর, ১৩। দুর্জয়মল্ল ৩১ বৎসর, ১৪। যাদবমল্ল ১৩ বৎসর, ১৫। জগন্নাথমল্ল ১২ বৎসর, ১৬। বিরাটমল্ল ১৫ বৎসর, ১৭। মাধোমল্ল ৩১ বৎসর, ১৮। দুর্গাদাসমল্ল ১৭ বৎসর, ১৯। জগন্নাথমল্ল ইঁহার রাজ্যাধিকার কালে বিষ্ণুপুর রাজ্যের অনেক উন্নতি সাধন হইয়াছিল। ইনি ১৭৫ মল্লাব্দে (৯৯০ খৃষ্টাব্দে) জন্মগ্রহণ করিয়া ৩১৮ মল্লাব্দে (খৃ০ ১০৩৩ খৃষ্টাব্দে) রাজ্যাধিকার লাভ করেন। তিনি গোলন্দ সিংহের কন্যা চন্দ্রাবতীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজ্যারম্ভে তিনি রাধাবিনোদ বিগ্রহের শ্রীমন্দির এবং একটী সুন্দর রাসমণ্ডপ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে বিষ্ণুপুর অমরাবতীর ন্যায় শোভা ও সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল—মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত অসংখ্য হর্ম্ম্যরাজি নগরের নানাস্থানে অনুপম সৌন্দর্য্য বিস্তারে দর্শকের নয়নমনে আনন্দের উদ্রেক করিত। প্রাকারপরিখবেষ্টিত দুর্গ

শোভা পাইত। সৈনিকাবাস, অশ্ব ও হস্তীশালা, অস্ত্রাগার, ধনরত্নাগার, ভোজ্যভাণ্ডার, দেবমন্দির দেখিলে চক্ষু জুড়াইত। নগরের নানা স্থানে গীত বাদ্যাদির আমোদ আহ্লাদ চলিত। সেই সময় হইতেই বিষ্ণুপুর সঙ্গীতচর্চ্চার জন্য বিখ্যাত। সঙ্গীত শিক্ষার জন্য নানা দিগ্দেশাগত সঙ্গীতশিক্ষার্থী বিষ্ণুপুরে অবস্থিতি করিতেন। পশ্চিমে দীল্লি অযোধ্যা গোয়ালিয়র যেমন বঙ্গে বিষ্ণুপুর তেমনি। বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতের ধাঁচা ঢং পৃথগ্বিধ, এখানে বড় বড় সঙ্গীতাচার্য্য বাস করিতেন। এখানকার রাজারা সকলেই বিশেষ সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন। তাঁহারা ভূমি ও বৃত্তি দিয়া বড় বড় সঙ্গীতাচার্য্যের সম্মান ও সমাদর করিতেন। এই সেদিন পর্য্যন্ত যে যদু ভট্ট, কেশব চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি সঙ্গীতাচার্যগণের সঙ্গীত শ্রুতি পবিত্র করিয়াছিল, সে বিষ্ণুপুরের রাজবংশের কৃপায়। শুনা যায় বিষ্ণুপুরে পাখোয়াজ, সেতার, বেহালা, তাউশ আদি নানা যন্ত্রবিশারদগণ পুরাতন বাদ্যযন্ত্রে পরিতৃপ্ত না হইয়া পশুচর্ম্মে পাতকুয়া ছাওয়াইয়া তাহা বাজাইয়াছিলেন, সত্য মিথ্যা নারায়ণ জানেন,—কিন্তু জনশ্রুতি এইরূপ। বিষ্ণুপুরের এইরূপ সঙ্গীতপ্রসিদ্ধি বহুকালের—রাজা জগৎমল্লের আমলে অনেক বিদেশীয় বণিক আসিয়া বিষ্ণুপুরে বসতি বিস্তার করেন। জগৎমল্ল ৩৩৬ মল্লাব্দে পরলোক বাস করেন। ২০। অনন্তমল্ল—ইনি জগৎমল্লের পুত্র। ৮ বৎসর মাত্র রাজত্ব করেন ২১। রূপমল্ল ১৪ বৎসর, ২২। সুন্দরমল্ল ২৪ বৎসর, ২৩। কুমুদমল্ল ২১ বৎসর, ২৪। কৃষ্ণমল্ল ১০ বৎসর, ২৫। ঝাঁপমল্ল ১৩ বৎসর, ২৬। প্রকাশমল্ল ৫ বৎসর, ২৭। প্রতাপমল্ল ১১ বৎসর, ২৮। সিন্দুরমল্ল ১৬ বৎসর,

১১ বৎসর, ৩২। জীবনমল্ল ২৮ বৎসর, ৩৩ রায়মল্ল—ইনি ৫৬৪ মল্লাব্দে (খৃঃ ১২৭৭ অব্দে) রাজ্যাভিসিক্ত হইয়া ৫৮৭ মল্লাব্দে (খৃঃ ১৩০০ অব্দে) ২৩ বৎসর রাজত্ব করিয়া পরলোকবাসী হয়েন। তাঁহার অধিকারকালে বিষ্ণুপুর দুর্গের সমধিক উন্নতি-সাধন এবং নানাপ্রকার আগ্নেয়াস্ত্র ও নানারকমের কল কারখানা আমদানী হয়। রাজ্যমধ্যে একজন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া শাসন কার্য্যে সুশৃঙ্খলা সংস্থাপন করেন। সৈনিকগণের পরিচ্ছদ প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হয়। তাহারা যুদ্ধ বিদ্যায় বিচক্ষণ পারদর্শিতা লাভ করে। রাজা রায়মল্লের রাজত্বকালে পার্শ্ববর্ত্তী রাজারা তাঁহার ভয়ে ভীত ও সঙ্কুচিত ছিলেন, তাঁহার রাজৈশ্বর্য্যের দিকে লোভদৃষ্টি করিতে পারিতেন না। পশ্চিম বঙ্গে বিষ্ণুপুর রাজ্য অজেয় ও অনাক্রমনীয় হইয়া উঠিয়াছিল, এককালে তাঁহাদের রাজ্য দামোদর তীর পর্য্যন্ত প্রসার প্রাপ্ত হইয়াছিল। রায়মল্ল নন্দলাল সিংহের কন্যা সুকুমারীকে বিবাহ করেন। তিনি বহু অর্থব্যয়ে রাধাকান্ত বিগ্রহের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

৩৪। গোবিন্দমল্ল—ইনি রায়মল্লের পুত্র। পিতার স্বর্গারোহণের পর রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়া ৩১ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। ৩৫। ভীমমল্ল ১১ বৎসর, ৩৬। খট্টারমল্ল ৩২ বৎসর, ৩৭। পৃথ্বীমল্ল ২৪ বৎসর, ৩৮। তপমল্ল ১৭ বৎসর, ৩৯। দীনুমল্ল ২১ বৎসর, ৪০। কিনুমল্ল ১৩ বৎসর, ৪১। সুরমল্ল ১২ বৎসর, ৪২। বীরমল্ল ৩১ বৎসর, ৪৩। মদনমল্ল ১০ বৎসর, ৪৪। দুর্জয়মল্ল ১৭ বৎসর, ৪৫। উদয়মল্ল ২৩ বৎসর, ৪৬। চন্দ্রমল্ল ৪১ বৎসর, ৪৭। বীরমল্ল ৩৮ বৎসর, ৪৮। বায়ুমল্ল ৪৮ বৎসর রাজত্ব করেন। ইঁহার রাজত্বকালে পাঠান সেনাপতি কতলু খাঁর সেনাগণ রাজ্য

মান সিংহের পুত্র জগৎ সিংহকে বিশ্বাসঘাতকতা সহকারে রাত্রি কালে জাহানাবাদ হইতে বিষ্ণুপুরে ধরিয়া লইয়া যায়- রায়মল্লই তাঁহার উদ্ধার সাধন করিয়া জাহানাবাদে পাঠাইয়া দেন।

৪৯। বীর হাম্বীর- ইনি ৮৬৮ মল্লাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ৮৮১ মল্লাব্দে (খৃঃ ১৫৯৬ অব্দে) রাজ্যাধিকার লাভ করেন এবং ২৬ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়া ১৬২২ খৃষ্টাব্দে গতায়ু হয়েন। তাঁহার রাজ্যাধিকার কালে বিষ্ণুপুরের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হয়—বিষ্ণুপুর দুর্গের প্রাকারোপরি বড় বড় কামান সাজাইয়া তাহাকে শত্রুর দুরাক্রম্য ও সুদৃঢ় করা হয়। বীর হাম্বীর তদানীন্তন মুসলমান নবাবের বিরুদ্ধে সৈন্য চালনায় ক্ষান্ত ছিলেন না, কিন্তু যখন জানিলেন যে, তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রচালনা করিলে দিল্লীশ্বরের অমর্য্যাদা ও বিরুদ্ধাচরণ করা [illegible] তখন তিনি তাহাতে ক্ষান্ত হইয়া ১৬৭০০০ এক লক্ষ সাতষট্টি হাজার টাকা কর দিবার অঙ্গীকার করেন। তৎকালে ভারতের রাজশক্তি আকবর সাহের হস্তে ছিল। আকবর হিন্দু মুসলমান সকলেরই প্রীতিভাজন ছিলেন। বীর হাম্বীরের অধিকার কালেই শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু শ্রীবৃন্দাবন হইতে গাড়ী গাড়ী শ্রীগ্রন্থ আনিতেছিলেন; বাঁকুড়া জেলার মালিয়াড়া গ্রামের নিকট উপস্থিত হইলে দস্যুগণ (তৎকালে এ দেশে দস্যুভয় বড়ই বেশী ছিল) জিজ্ঞাসা করে—"গাড়ীতে কিসের বোঝাই?" আচার্য্য প্রভু উত্তর করেন "বহুমূল্য রত্ন।" ইহাতে তাহারা সে সব লুণ্ঠিত করিয়া লইয়া যায়, স্বস্থানে গিয়া যখন দেখিল, কতকগুলি গ্রন্থ বই মূল্যবান কিছুই নাই তখন তাহারা সমস্ত গ্রন্থ বীর হাম্বীরের নিকট উপস্থিত করিলে তিনি দেখিয়া বুঝিলেন—

জানিতে পারিয়া রাজসমক্ষে দণ্ডয়মান হইলেন এবং পুস্তক প্রত্যর্পণের প্রার্থনা জানাইলেন। মহারাজ তৎক্ষণাৎ গ্রন্থগুলি তাঁহাকে দিলেন এবং শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর মুখে ভাগবতের প্রকৃত ব্যাখ্যা শুনিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব পরিগ্রহ করিলেন। তদবধি বিষ্ণুপুরে বৈষ্ণব ধর্ম্মের কীর্ত্তিকেতন উড্ডীন হইতে থাকে, অনেক বিগ্রহ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং বিষ্ণুপুর হরিনাম সংকীর্ত্তনে প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে।

অদ্যাপি তাহার বিরাম নাই—বিষ্ণুপুরে অনেক বৈষ্ণবের বাস। রাজা বীর হাম্বীরের চারি রাণীর দ্বাবিংশটী পুত্র জন্মে। তিনি তিনটী শিল্পকলাপরিপাটী দেবমন্দিরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। দুর্গাপ্রসাদ গোর তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন।

৫০। ধাড়ি হাম্বীরমল্ল সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া ছয়টী বৎসর রাজত্ব করিবার পর উন্মাদগ্রস্ত ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়েন। তাঁহার পুত্র বধির ও বোবা ছিলেন বলিয়া রাজরাণী আপনার তৃতীয় দেবর বীর হাম্বীরের তৃতীয় পুত্র রঘুনাথ সিংহকে রাজটীকা দিয়া রাজ্যাভিষিক্ত করেন। ইনি দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ নামে প্রসিদ্ধ এবং ৩০ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। ৫২। বীর সিংহ ২৬ বৎসর রাজত্ব করেন। ৫৩। দুর্জ্জন সিংহ ২০ বৎসর, ৫৪। রঘুনাথ সিংহ (৩য়) ১০ বৎসর রাজত্ব করিয়া গতায়ু হইলে তাঁহার অনপত্যতা হেতু তাঁহার অনুজ গোপাল সিংহ রাজ্য লাভ করেন।

৫৫। গোপাল সিংহ—ইনি পরম কৃষ্ণ পরায়ণ পরম ভাগবৎ

ছিলেন, ইহার রাজত্বে যে না সন্ধ্যার পর হরিনাম সংকীর্ত্তন করিত, তিনি তাহারই দণ্ড বিধান করিতেন বলিয়া, বিষ্ণুপুরবাসী মাত্রেই সন্ধ্যাকালে হরিনাম করাকে "গোপাল সিংহের বেগার" বলিত। এজন্য রাঢ় দেশের অনেকের মুখে এই কথা অদ্যাপি শুনিতে পাওয়া যায়। যে কাজ না করিলেই নয় লোকে তাহাকেই "গোপাল সিংহের বেগার" বলে। তিনি ৩৮ বৎসর রাজত্ব করেন এবং তুঙ্গভুমির রাজা রঘুনাথ তুঙ্গের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। রাজা গোপাল সিংহের দ্বারা পাঁচটী অতি সুন্দর দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহারই অধিকার কালে মহারাষ্ট্র সৈন্য (বর্গীরা) ভাস্কর পণ্ডিতের অধিনেতৃত্বে বিষ্ণুপুর আক্রমণ করে। প্রবাদ এইরূপ যে, বিষ্ণুপুরের প্রধান দেবতা মদন মোহন, দল-মাদল নামক দুই প্রকাণ্ডাকারের কামান দাগিয়া, শত্রু সৈন্যকে বৈমুখ করেন। ঐ কামান দুইটীর মধ্যে একটি এক জলাশয়ে নিমগ্ন আছে, অপরটী একই বাঁধের ধারেই পড়িয়া আছে, তাহার মধ্যে ভালুক বাস করে বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়, করুক না করুক ইহার গর্ত্ত এত বড় যে তাহার মধ্যে তাহারা গতিবিধি করিতে পারে। উহা এরূপ লৌহায় প্রস্তুত যে এখনও সদ্যনির্ম্মিত বলিয়া বোধ হয়, গায়ে মরিচা মাত্র ধরে না—চক্‌চক্ করিতেছে।

ফলকথা এই যে মহারাষ্ট্রীয়-সৈন্য সর্ব্ব প্রথমে জয়লাভ করিলে রাজা পরাভূত হইয়া দুর্গমধ্যে আশ্রয় লয়েন, মদনমোহনের কৃপায় মানবীয় সাহায্য ব্যতীত দলমাদলে বজ্রধ্বনির ন্যায় শব্দ হয়, তন্নিক্ষিপ্ত গোলাগুলিতে মহারাষ্ট্রীয়-সৈন্য বিধ্বস্ত পরাজিত এবং তাহাদের সেনাপতি নিহত হয়। বিষ্ণুপুরের সেনাগণ মহারাষ্ট্র-

বলে মহারাজা গোপাল সিংহ আপনার সৈন্য ও সেনাপতি লইয়া শত্রুদের সম্মুখীন হইয়া তাহাদিগকে পরাভূত করেন, এবং সেনাপতির প্রাণ নষ্ট করিবার জন্য দ্বিতীয় যুদ্ধ না করিয়া দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা পলায়ন না করিয়া দ্বিতীয়বার নগর আক্রমণ করিলে ঐ দুই কামানের মুখে অনেকেই প্রাণ বিসর্জ্জন দিল, এবং তাহাদের সেনাপতিও বিনষ্ট হইয়াছিল।

বর্দ্ধমানের মহারাজা কীর্ত্তিচন্দ্র বাহাদুর বিষ্ণুপুর আক্রমণ করিয়া রাজাকে পরাভূত করিলেও মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য উভয়কে মিলিত হইতে হইয়াছিল। গোপাল সিংহের দুই পুত্র জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণসিংহ পিতৃ-রাজ্যের অধিকার লাভ করিলে কনিষ্ঠ গোবিন্দ সিংহ বিষ্ণুপুরের একাংশ জামকুড়ি নামক স্থানে একটী ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করেন, তাঁহার বংশধরেরা অদ্যাপি সেই সম্পত্তি ভোগদখল করিতেছেন। কুচিয়াকোলের ৺রাধাবল্লভ সিংহ মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষ বিষ্ণুপুর রাজবংশের ঐরূপ এক শাখা। তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সিংহ এক্ষণে কুচিয়াকোল ষ্টেটের অধিকারী।

৫৬। কৃষ্ণ সিংহ ১।৩ এক বৎসর তিনমাস মাত্র রাজত্ব করিয়া পরলোকবাসী হইলে তৎপুত্র ৫৭। চৈতন্য সিংহ রাজ্যাধিকার লাভ করিয়া ২৭ বৎসর রাজত্ব করেন। ৫৮। মদনমোহন সিংহ অত্যল্পকাল মাত্র রাজত্ব করেন। তৎপুত্র ৫৯। মাধব সিংহ ১১ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার হস্ত হইতেই রাজ্যাধিকার স্খলিত হয়। তাঁহার বংশধরেরা আর গবর্ণমেণ্ট দ্বারা রাজসম্মানে সম্মানিত নহেন। কিন্তু বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরবাসী মাত্রেই তাঁহাদিগকে সে সম্মান প্রদর্শন করিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত জ্ঞান করে।

বর্গীর হাঙ্গামায় বিষ্ণুপুরের প্রভূত ক্ষতি করিয়াছিল। তাহার পর ইংরাজ-রাজত্বের আরম্ভে যে ছিয়াত্তর মন্বন্তর নামে দেশব্যাপী প্রসিদ্ধ অন্নকষ্ট উপস্থিত হয় তাহাতে প্রভূত প্রজাক্ষয় জন্য দেশ জনশূন্য প্রায় হইয়া পড়ে। ইংরাজ-রাজও তাঁহাদের সম্মান সৌভাগ্য রক্ষার জন্য কৃপাদৃষ্টি করিলেন না। কাজেই তাঁহাদের অবস্থা ক্রমশঃই শোচনীয় হইয়া উঠিতে লাগিল। তাঁহারা ক্রমশঃ গৃহস্থ অপেক্ষাও হীনাবস্থ হইলেন, যৎকিঞ্চিৎ বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া এখন তাঁহাদিগকে কালযাপন করিতে হইতেছে। যে বিষ্ণুপুরের রাজাদের প্রতাপে এককালে বাঘবলদে এক ঘাটে জল খাইত, যাঁহাদিগকে রাজকর দিয়া কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা আপনাদিগকে নিরাতঙ্ক জ্ঞান করিতেন, আজি তাঁহারা আপনাদের সামন্ত-রাজা অপেক্ষাও হীনাবস্থ। মুসলমানদের আমলে তাঁহারা কখন বন্ধু রূপে কখন বা যৎকিঞ্চিৎ মাত্র কর দিয়া আপনাদের রাজ্য আপনারা শাসন করিতেন। আজি তাঁহাদের বংশধরগণ পরপ্রত্যাশী, কাল কিছুই চিরদিন সমান রাখে না—মানবাবস্থার উত্থান পতন চক্রনেমীর ন্যায় নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। বিষ্ণুপুর দুর্গের ভগ্ন প্রাকার স্বল্পতোয়া পরিখা নির্ম্মলসলিলশালী বড় বড় বাঁধ, ধ্বংসোন্মুখ সুন্দর দেবমন্দির, সুপ্রশস্ত রাজ-পথ, নানা পণ্যপরিপূর্ণ বিপণিগুলি আজিও বিষ্ণুপুরের লুপ্ত স্মৃতিকে জাগ্রত করিয়া তুলিতেছে। সেকালে এখানকার তন্তুবায় পল্লীতে রেসম গরদের কত রকম কাপড়, কাংস্য-বণিক পল্লীতে নানাবিধ পিতল কাঁশার কারখানা, বিবিধ মিষ্টান্ন দ্রব্যের দোকান কতই শোভা পাইত—বিষ্ণুপুরের মিহিদানা বঙ্গের সর্ব্বত্র সুপ্রসিদ্ধ। অধুনা অতি উৎকৃষ্ট তামাক বিষ্ণুপুরের নাম কতকটা রক্ষা করিয়াছে। মেদিনীপুর,

বীরভূম, বর্দ্ধমান, হাওড়া কলিকাতার সমস্ত তামাকের দোকানে বিষ্ণুপুরের নাম লিখিত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। তদ্ভিন্ন বিষ্ণুপুরের পরিচয় দিবার আর কি আছে। যে বিষ্ণুপুরের পথে ঘাটে মাঠে সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সঙ্গীতের সুস্বরলহরী উত্থিত হইয়া পথিকের মন প্রাণ উল্লাসিত করিত, আজি সেই সকল স্থান বিনীরব হইয়াছে। রাজ-বৃত্তিতে সঙ্গীতাচার্য্যগণ নিশ্চিন্ত মনে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিয়া শত শত সঙ্গীতশিক্ষার্থীকে অন্নদান করিতেন, এখন তাঁহারা আপনারাই নিরন্ন অপরকে কোথা হইতে অন্নদান করিবেন।

বিষ্ণুপুরের প্রধান অধিষ্ঠাত্রী দেবতা মদনমোহন,—যাঁহার কৃপায় বিষ্ণুপুরের শ্রী সৌভাগ্য, তিনি আর এখন বিষ্ণুপুরে নাই। দৈন্য দুরদৃষ্টপ্রযুক্ত যেদিন তিনি কলিকাতা বাগবাজারের গোকুলমিত্রের ঘরে লক্ষ টাকায় বন্ধক পড়িয়াছিলেন, সেই দিন হইতে বিষ্ণুপুরের সৌভাগ্য-লক্ষ্মী বিষ্ণুপুর ত্যাগ করিয়াছেন, রাজা তাহা বুঝিতে পারিয়া কষ্টেস্রষ্টে লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া গোকুলচন্দ্র মিত্রের ঋণ শোধ করিয়া দিলেন, কিন্তু মদনমোহনকে ফিরিয়া পাইলেন না— গোকুল টাকা পাইয়াও তাহা দিতে স্বীকার করিলেন না। লক্ষ টাকা দিয়া যে ব্যক্তি একটী শিলামূর্ত্তি রাখিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারেন, তিনি অমূল্য নিধি হাতে পাইয়া হেলায় তাহা হারাইবেন কেন। সুপ্রীম কোর্টে মোকদ্দমা হইল, বিষ্ণুপুরের রাজা জিতিলেন কিন্তু আসল মদনমোহন পাইলেন না, গোকুলচন্দ্র তাঁহাকে একটী নকল বিগ্রহমূর্ত্তি দিলেন। রাজাকে ভগবান্ নারাজ তাই তিনি বিষ্ণুপুরবাসে অসম্মত। আজি পর্য্যন্ত

স্থানে গাহিয়া বেড়ায়। তাহাতে বিষ্ণুপুরের অনেক কথা জানিতে পারা যায়। গীতটী পরিশিষ্টে দেওয়া গেল।

ব্রাহ্মণ ভূমি।—চলিত কথায় বামুনভুঁই। ইহা মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। আমাদের কোন গ্রামের পরিচয় জন্য তাহাকে তন্নামীয় অন্য গ্রাম হইতে পৃথক্ করিবার জন্য নিকটবর্ত্তী গ্রামের নাম তাহার সহিত যুক্ত করা হয় বা তাহার পূর্ব্বে কোন বিশেষণ সংযুক্ত করিবার রীতি আছে। যথা—ভাঙ্গামোড়া বৈকুণ্ঠপুর বা ভাঙ্গা-মোড়া গোপীনাথপুর, তেমনি ইহাকে আরড়া ব্রাহ্মণ ভূমি বলা হয়। এই ব্রাহ্মণ ভূমির উত্তর সীমায় রাঢ়া দেউল এবং তাহাতে এক শিব প্রতিষ্ঠিত আছেন—রাঢ়া দেউলের পরেই ব্রাহ্মণ ভূমির আরম্ভ। ব্রাহ্মণভূমি দৈর্ঘে প্রস্থে ষোল ক্রোশ বলিয়া প্রবাদ আছে। এই ষোল ক্রোশব্যাপী ব্রাহ্মণভূমিতে বহুকাল পূর্ব্ব হইতে এক ব্রাহ্মণবংশ রাজত্ব করিতেন, তাঁহাদের নামানুসারে সমগ্র রাজ্যটীর নাম ব্রাহ্মণভূমি হইয়াছে। রাঢ়দেশ হইতে পৃথক ছিল বলিয়া ইহা আরড়া ব্রাহ্মণভূমি নামে অদ্যাপি খ্যাত। এই ব্রাহ্মণ-ভূমির রাজা রঘুনাথ রায় ১৪৯৫ অব্দ (খৃঃ ১৫৭২ অব্দ) হইতে ১৫২৫ শাক (খৃঃ ১৬০৩ অব্দ) পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তৎকালে দীল্লি সম্রাজ্যের অধীশ্বর ভুবনবিখ্যাত মোগলকুলতিলক আকবর সাহ অধিষ্ঠিত ছিলেন। রঘুনাথের পিতার নাম বাঁকুড়ারায়, পিতামহের নাম বীরমাধব রায়, রাজা রঘুনাথের অধ্যাপকতা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া আরড়া ব্রাহ্মণভূমিতে অবস্থানকালে বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ অমর কবি দামুন্যা গ্রাম নিবাসী ৺ মুকুন্দরাম ভট্টাচার্য্য কবিকঙ্কণ মহাশয় তাঁহার অমৃতস্রাবী সুমধুর চণ্ডী কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কবি স্বীয় গ্রন্থে তাহার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন—

আরড়া ব্রাহ্মণভূমি, ব্রাহ্মণ যাহার স্বামী
নরপতি ব্যাসের সমান।
পড়িয়া কবিত্ব বাণী, সন্তাসিন্ধু নৃপমণি
দশ আড়া মাপি দিল ধান॥
বীর মাধবের সুত, বাকুড়া দেব গুণযুত,
শিশুপাঠে কৈল নিয়োজিত।
তাঁর সুত রঘুনাথ, রূপে গুণে অবদাত,
গুরু করি, করিলা পূজিত॥

বীরমাধবের পূর্ব্ববর্ত্তী ১৭।১৮ পুরুষ ব্রাহ্মণভূমিতে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহা হইতে এই রাজবংশকে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রাচীন বলিবার পক্ষে কোন আপত্তি দেখা যায় না। তৎকালে গৌড়ের সিংহাসন পালবংশীয় নরপতিগণের অধিকারে ছিল বলিয়া অনুমান হয়। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজারাও তখন প্রবল প্রতাপান্বিত। ব্রাহ্মণভূমির ব্রাহ্মণ রাজা কাহাকেও কর দিতেন, কি স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেন, তাহা নিশ্চয়রূপে বলিবার উপায় নাই। ফলে স্বাধীন থাকাই সম্ভব। পালবংশীয় গৌড়েশ্বরেরা রাঢ়দেশ করতল গত করিলেও ব্রাহ্মণ-ভূমিকে রাঢ় হইতে পৃথক করিবার জন্য যখন রাঢ়াদেউলে তাহার সীমা নির্দ্দেশ করিয়া ব্রাহ্মণ নরপতিরা আপনাদের রাজ্যকে আরড়া বলিয়া গিয়াছেন, তখন মনে হয় না যে গৌড়েশ্বর বা মল্লভূমীশ্বরগণের সহিত তাঁহাদের কোন সম্বন্ধ সংস্রব ছিল। যতদূর দেখা যাইতেছে তাহাতে ব্রাহ্মণভূমির রাজারা মুসলমানদিগের এদেশে আধিপত্য বিস্তারের পূর্ব্বে স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিতেন বলিয়াই বিশ্বাস হয়। পরে মুসলমান রাজত্বে ইহা একটী পৃথক পরগণা বলিয়া পরিগণিত

হয়। আইন আকবরীতে দেখা যায় যে ব্রাহ্মণভূমি সরকার জলেশ্বরের অন্তর্গত ছিল এবং ইহার বার্ষিক রাজস্ব -- ২৮৫৫ টাকা। এখানে বহু ব্রাহ্মণসজ্জন এবং কৃতবিদ্য পণ্ডিত ও কবি বসবাস করিতেন। দেবীমাহাত্ম্য সপ্তশতী চণ্ডীর টীকাকার ৺গোপাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় ব্রাহ্মণভূমির যদুপুর নামক গ্রামে বাস করিতেন, তাঁহার বংশধরগণ অদ্যাপি পিতৃভূমিতে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ কবি শিবায়ণ প্রণেতা রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও অগ্রে এখানে বাস করিতেন পরে মেদিনীপুরের সৎগোপ জমিদার যশোমন্ত সিংহের আশ্রয়ে অবস্থিতি করিয়া কর্ণগড়ে তৎপ্রতিষ্ঠিত পঞ্চমুণ্ডের আসনে বসিয়া দেবী ভগবতীর উপাসনায় সিদ্ধি লাভ করেন। যথাস্থানে তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইবে।

ব্রাহ্মণভূমির ব্রাহ্মণ রাজবংশধরগণ এক্ষণে চন্দ্রকোণার নিকটবর্ত্তী সেনাপতে গ্রামে বাস করিতেছেন। ৺বৈকুণ্ঠনাথ দেব রায় মহাশয় কিয়দ্দিন হইল লোকান্তরিত হইয়াছেন তিনি রাজা রঘুনাথ রায়ের অধস্তন দশম পুরুষ। তাঁহাদের পিতৃপুরুষের সে রাজত্ব আর নাই, সেনাপতে গ্রামের উপসত্ব মাত্র সম্বল। বঙ্গের যাবতীয় প্রাচীন রাজবংশই এখন এইরূপ অবস্থাপন্ন।

চন্দ্রকোনা।--ব্রাহ্মণভূমি হইতে দুই ক্রোশমাত্র, ইহাও প্রাচীনকালের হিন্দুরাজ্য, চন্দ্রকেতু নামে এক ক্ষত্রিয় রাজা ইহার প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁহার নামানুসারে ইহার নাম চন্দ্রকোনা। কোন্ কালে ইহা প্রতিষ্ঠিত তাহা নিরূপণ করিবার উপায় নাই। আকবর সাহের অধিকার কালে উড়িষ্যার পাঠান সর্দ্দার কতলু খাঁর সহিত মিলিত হইয়া চন্দ্রকোনার রাজা রঘুনাথ সিংহ বঙ্গ দেশের শাসনকর্ত্তা রাজা মানসিংহের পুত্র জগৎ সিংহকে বন্দী

করিয়া লইয়া যান। মানসিংহের প্রতাপে বিষ্ণুপুরের রাজার যত্নে জগৎ সিংহের উদ্ধারসাধন হয়। বর্দ্ধমানের মহারাজা কীর্ত্তিচন্দ্রও একবার চন্দ্রকোনা আক্রমণ ও অধিকার করিয়া মুসলমান রাজত্বের অন্তর্গত করিয়াছিলেন। চন্দ্রকোনা অতি বৃহৎ গণ্ডগ্রাম ৫২ বাজার ৫৬ গলি বলিয়া চন্দ্রকোনার খ্যাতি। ইহা তন্তুবায়প্রধান স্থান, কার্পাসসূত্রনির্ম্মিত ধুতির জন্য ইহা প্রসিদ্ধ। এখানে পুলীশ থানা, উচ্চ শ্রেণীর স্কুল, ডাকঘর, দাতব্য চিকিৎসালয় ও মিউনিসিপালিটী আছে।

মঙ্গলকোট।—এখন বর্দ্ধমান জেলার একটী পুলিশ ষ্টেশন, এখানে একটী সবরেজিষ্ট্রী আপিশ স্কুল ও ডাকঘর আছে। মঙ্গলকোট একটী অতি প্রাচীন স্থান। এখানেও হিন্দু রাজবংশের রাজত্বের কথা ধর্ম্মমঙ্গল পাঠে অবগত হওয়া যায়। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে রামাই পণ্ডিত ধর্ম্ম পূজার পদ্ধতি প্রচার করেন। ময়নাগড়ের রাজা লাউসেন একজন সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মসেবক, এবং সিদ্ধ পুরুষ ও গৌড়েশ্বরের সামন্ত রাজা। তিনি যখন কামরূপ জয় করিয়া গৌড়েশ্বরের সহিত সাক্ষাতের পর স্বরাজ্যে প্রত্যাগত হয়েন, তৎকালে পথিমধ্যে মঙ্গলকোটের রাজা গজপতি তাঁহাকে কন্যা দান করেন একথা ঘনরাম চক্রবর্ত্তী আপনার ধর্ম্মমঙ্গলে লিখিয়া গিয়াছেন যথা—

লঘুগতি ভূপতি পেরুল পদ্মাবতী।
শুনিয়া মঙ্গলকোটে রাজা গজপতি॥
বিভা করি দেশে যায়-লাউসেন রায়।
অমলা অঙ্গজা আনি সমর্পিল তায়॥

রূপে গুণে অনুপম ধর্ম্মের সেবক।
হেন পাত্রে কন্যা দিলে রয়ে যায় সক॥

*　　*　　*

তবে রাজা সায় দিয়া চলে রাজধামে।
প্রবেশে মঙ্গলকোটে বেলা অবসানে॥

*　　*　　*

বলিল বিমলা কন্যা সমর্পিনু রায়।
শ্বশুর সম্ভাষ করি রায় দিল সায়॥

ধনরাম ১৮৯ পৃঃ।

মঙ্গলকোট অজয়তীর হইতে দূরবর্ত্তী নহে। এই বহু প্রাচীন জনস্থানের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে জানিতে পারা যায় যে—পুরাকালে এখানে "শ্বেত" নামে এক হিন্দুরাজা রাজত্ব করিতেন, তিনি সত্যবাক্, জিতেন্দ্রিয়, সত্যসন্ধ মহা উদার, দানকার্য্যে শৈবধর্ম্মে এবং শিবার্চ্চনে সদা অনুরক্ত ছিলেন, তিনি পাঁচ যোজন পথ অতিক্রম করিয়া প্রতিদিন বক্রেশ্বর তীর্থে বক্রেশ্বর শিবের উপাসনা করিতেন।

শ্বেত রাজা মহানাসীৎ সত্যবক্তা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সত্যসন্ধঃ মহোদারঃ সত্যবাক্ দানতৎপরঃ॥
রাজা কৃতযুগে আসীৎ শিবপাদার্চ্চনে রতঃ।
মঙ্গলকোটকং নাম পুরং অস্য প্রতিষ্ঠিতম্॥
নিত্যং বক্রেশমারাধ্য ভুক্তোঽসৌ শ্বেতপার্থিবঃ।
আয়াতি নিত্যং স রাজা পঞ্চযোজন মাত্রকম্॥
পুনরেষ গৃহং যাতি দিনেনৈকেন ভূপতিঃ।
তদেবাসৌ বরং প্রাদাৎ বক্রেশো ভক্তবৎসলঃ॥

বক্রেশ্বর মাহাত্ম্য।

রাজা প্রতিদিন পাঁচ যোজন পথ আসা যাওয়া করিতেন। মঙ্গলকোট তাঁহার রাজধানী ছিল।

বিক্রমাদিত্য বা বিক্রমজিৎ নামে এক রাজাও এখানে রাজত্ব করিতেন। তিনি প্রভূত বলবীর্য্যশালী ছিলেন, তাঁহার রাজত্ব-কালে সতেরজন মুসলমান ধর্ম্মযোদ্ধা বা গাজি আসিয়া তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিলে তিনি প্রভূত পরাক্রমে যুদ্ধ করিয়া তাহাদের প্রাণনষ্ট করেন। মঙ্গলকোটের নানা স্থানে তাঁহাদের সমাধি অদ্যাপি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। পরিশেষে গজনবী নামক গাজী বা পীর বিক্রম জিতের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে পরাভূত ও নিহত করেন। এই সময় হইতেই মঙ্গল কোট মুসলমান দিগের শাসনাধীন হয় *।

সংপ্রতি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কয়েকটী প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসু সুযোগ্য সভ্যের উদ্যোগযত্নে মঙ্গলকোটের অনেকগুলি পুরাতত্ত্বের উদ্ধার সাধন হইয়াছে। তাঁহারা অনুসন্ধান কালে সেখানকার রাজদীঘি নামক জলাশয়ের নিকটস্থ একটী ভগ্ন মসজিদসম্মুখস্থ শিলা খণ্ডে "চন্দ্রসেন নৃপতির" নাম বঙ্গাক্ষরে খোদিত দেখিয়াছেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞোপলক্ষে মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন এতদঞ্চলে এক চন্দ্রসেন নৃপতিকে পরাজিত করিয়াছিলেন বলিয়া মহাভারতের সভা পর্ব্বের ২৯ অধ্যায়ে লিখিত আছে।

সমুদ্রসেন নির্জ্জিত্য চন্দ্রসেনঞ্চ পার্থিবং।
তাম্রলিপ্তঞ্চ রাজানাং কর্ব্বটাধিপতিং তথা॥

তবে কথা এই যে উক্ত রাজসূয় যজ্ঞকালে বঙ্গাক্ষর প্রচলিত থাকা সম্ভবপর কি না। প্রবন্ধলেখক অনুমান করেন খোদিত

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা ২০ ভাগ, ৩য় খণ্ড।

অক্ষর গুলি দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দীর অক্ষরের অনুরূপ। তাহা হইলে এই চন্দ্রসেন রাজা গৌড়ের সেন নরপতিগণের সামন্ত রাজা হইবারই সমধিক সম্ভাবনা।

বৈদ্যককুলপঞ্জিকা চন্দ্রপ্রভায় এক চন্দ্রসেনের পরিচয় আছে—তিনি বিজয় সেনের পুত্র এবং নাথ সেনের পৌত্র। এই নাথ সেন পাহাড় দেশখণ্ডে রাজত্ব পাইয়াছিলেন, পাহাড় দেশখণ্ড বলিতে বীরভূম ও সাঁওতাল পরগণাকে বুঝিতে হয়, নাথ সেনের পৌত্র যে রাজ্যবিস্তার সহকারে আপন রাজধানী মঙ্গলকোটে স্থাপিত করিতে না পারিয়া ছিলেন এমন কথা বলা যায় না।

নৃপতের্নাথ সেনস্য পুত্রো বিজয় সেনকঃ।
স এব সর্ব্ব সংগ্রামে মহারাজেনাহভবদ্বলী॥
রাজ্ঞো বিজয়সেনস্য তনয়ৌ দ্বৌ বভূবতুঃ।
চন্দ্রবচ্চন্দ্রসেনোহভূদ্ বুধসেনো বুধোপমঃ॥

কুব্জিকা তন্ত্রে মঙ্গলকোট পীঠস্থান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এখানে দেবী মঙ্গলচণ্ডী এবং ভৈরব কপিলাম্বর বিদ্যমান। পীঠমালায় উজানির উল্লেখ আছে। * রাজা বিক্রমজিতের গড় বেষ্টিত বাড়ী মঙ্গলকোটের মধ্যগত ছিল এখন ডাঙ্গায় পরিণত। মঙ্গল কোটে যে কয়টী শিলালিপির আবিষ্কার হইয়াছে তাহাদের মধ্যে মৌলানা হামিদ দানেশমন্দের সমাধি গৃহের সম্মুখে বাঙ্গালার সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন সাহের রাজত্বকালে খোদিত ৯১৬ হিজিরার যে শিলালিপিটী পাওয়া গিয়াছে তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। হিজিরা ৯১৬ খৃষ্টীয় ১৫১০ অব্দ। ইহা দ্বারা অনুমান

---

* উজানীতে কফোনি মঙ্গলচণ্ডী দেবী।
ভৈরব কপিলাম্বর শুভ যাঁরে সেবি॥

হয় যে খৃষ্টীয় ১৫১০ অব্দের পূর্ব্বে মঙ্গলকোটে মুসলমানদের অধিকার সংস্থাপিত হয় নাই। রাজা বিক্রমজিৎও এই সময়েই বা ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন সময়ে গাজি গজনবীর হস্তে নিধন প্রাপ্ত হয়েন।

আমরা উজানীর বিবরণ ইতিপূর্ব্বে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। মঙ্গলকোট উজানীর অতি নিকটবর্ত্তী। কেহ কেহ দুইটী স্থানকে অভিন্ন মনে করেন। এককালে যে অভিন্ন ছিল এরূপ মনে করা ভ্রান্তিবিজৃম্ভিত বলিয়াও বোধ হয় না, তবে একটী কথা আছে—উজানী সমধিক প্রাচীন—যখন উজানী ছিল তখন হয়ত মঙ্গলকোট ছিল না। তাহার পর মঙ্গলকোটের প্রতিষ্ঠা হয়, তাহার পর দুইটীর পৃথক্ নাম থাকিলেও মূলতঃ একই হইয়া গিয়াছিল। এরূপ অনুমানের কারণ এই যে যৎকালে উজানী সমৃদ্ধিশালিনী তখন তথায় রাজা বিক্রমকেশরী রাজত্ব করিতেন। ধনপতি দত্ত—সদাগর ছিলেন, গড়ের নাম মঙ্গলকোট থাকাও বিচিত্র নহে। তাহার পর বিক্রমজিৎ নামে বিক্রম কেশরীর কোন বংশধর উজানী হইতে মঙ্গলকোটের দুর্গমধ্যে আপন রাজধানী স্থাপিত করিয়া তাহাতে বসবাস করিতে থাকায় উজানীর প্রসার প্রতিপত্তি কমিয়া যায়, মঙ্গলকোট নামেরই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা জন্মে। চণ্ডীকাব্যের রচয়িতা কবিকঙ্কণ ইহার বহু পরবর্ত্তী কালে চণ্ডী রচনা করিয়াছেন তাই তিনি লিখিয়া গিয়াছেন।

গন্ধবণিক জাতি দেশ গৌড় নাম।
স্থান মঙ্গলকোট উজাবনী গ্রাম॥

চণ্ডীকাব্যের নানা স্থানে উজাবনী বা উজানীরই বেশী পরিচয় পাওয়া যায়।

এখন আর উজানীর নাম নাই, অবস্থিতিস্থানেরও অভাব— একমাত্র এখানে যে একটী মেলা হয় তাহারই নাম "উজানীর মেলা"। যেখানে উজানীর অবস্থিতি ছিল সে স্থানটীকে কো-গ্রাম বলে। কুগ্রামের অপভ্রংশে এই নামের উৎপত্তি। লোচন দাস নামে বৈদ্যকুলসম্ভূত এক সিদ্ধ বৈষ্ণব কবি এখানে আবির্ভূত হইয়া শ্রীচৈতন্যমঙ্গল নামে এক অতি উৎকৃষ্ট শ্রীচরিতগ্রন্থ রচনা করেন। তিনি বিবাহ করিয়া দাম্পত্যসুখে চিরবঞ্চিত হওয়ায় তাঁহার পত্নী এই গ্রামের নাম রাখিয়াছিলেন কুগ্রাম। সেই অবধিই সতীসম্মান রক্ষার জন্য ইহার উজানী নাম ঘুচিয়া কো-গ্রাম নাম হইয়াছে।

ইহারই মধ্যে খড়্গমোচন নামে এক তীর্থ স্থান আছে, তৎসম্বন্ধে প্রবাদ এই যে রাজা বিক্রমাদিত্য তালবেতাল সিদ্ধি উপলক্ষে খড়্গাঘাতে এক সন্ন্যাসীর প্রাণহানি করেন, এই অপরাধে খড়্গ তাঁহার হস্তচ্যুত হয় নাই, হাতেই থাকিয়া যায়। বহুতীর্থ স্নানের পর উজানীর এই মহাতীর্থে স্নান করিলে খড়্গ তাঁহার হস্তচ্যুত হয় বলিয়া ইহার নাম হইয়াছে "খড়্গমোচন"। অজয় নদ এবং কুণুর নাম্নী ক্ষুদ্র স্রোতোস্বিনীর সঙ্গমস্থলের অনতিদূরেই এই মহাতীর্থ স্থান। যে ভ্রমরার দহে ধনপতি সদাগরের সাত ডিঙ্গা ডুবান থাকিত সে ভ্রমরা অধুনা কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হইতেছে। ইহার নিকটেই শ্রীমন্তের ডাঙ্গা— এই স্থান হইতে শ্রীমন্ত সদাগর সিংহল যাত্রা করিয়াছিলেন। এই থানেই গঙ্গামঙ্গল কাব্য রচয়িতা দ্বিজ কমলাকান্ত বাস করিতেন। উজানীতেই তাঁহার বাসস্থান ছিল।

উজানী অদ্যাপি কবিশূন্য নহে—শ্রীমান্ কুমুদরঞ্জন মল্লিক বিএ, বাবাজীবন উজানীর পূর্ব্ব গৌরব রক্ষা করিতেছেন, তাঁহার রচিত

"উদ্‌ভ্রান্তি" "বনতুলসী" প্রভৃতি কাব্য গ্রন্থ এবং নানা সাময়িক পত্রে প্রকাশিত খণ্ড কবিতায় তাঁহার কবিগৌরব সার্থক করিয়াছে। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নাথ মল্লিক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ মল্লিক বি, এস. সি, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ মল্লিক বি. এল্ শ্রীযুক্ত সীতানাথ মল্লিক প্রভৃতি কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ এখন কো-গ্রামের গৌরব স্বরূপ। তাঁহারা কৃষ্ণ খাঁ বংশ সম্ভূত—মঙ্গলকোট বৈদ্যদিগের একটী সমাজ রূপে পরিগণিত যথা—

খানা মঙ্গলকোঠশ্চ তেহট্ট গুটিনাগড়িঃ।
সেনহাটী তথা খণ্ডো রায়িগা নদিয়া তথা॥

চন্দ্রপ্রভা ১২ পৃঃ।

রাঢ়ে ব্রাহ্মণ—সর্ব্ব প্রথম ব্রাহ্মণেরা যে কোন সময়ে রাঢ়দেশে উপনিবিষ্ট হয়েন তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। আদিশূর কর্ত্তৃক যে বেদপারগ পাঁচজন ব্রাহ্মণ কান্যকুব্জ হইতে গৌড়ে আগমন করেন, তাঁহাদের আসিবার পূর্ব্বে এদেশে সপ্তশতী ব্রাহ্মণেরা বসবাস করিতেন, কিন্তু তাঁহাদের দ্বারা বেদবিহিত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান হইত না, বৌদ্ধ প্রভাবে তাঁহারা অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছিলেন। চন্দ্রসেন সমুদ্র সেনাদি হিন্দু রাজা যে এদেশে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞকালে রাজত্ব করিতেন তাহা, মহাভারত পাঠে অবগত হইতে পারা যায়, সেই সকল হিন্দুরাজা যে একবারে যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন না এমন কথা বলিতে পারা যায় না। অতএব তাঁহাদিগকে হিন্দুত্ব রক্ষার জন্য ব্রাহ্মণের শরণাপন্ন হইতে হইত। বিষ্ণুপুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠা খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে— সে সময়েও এদেশে ব্রাহ্মণের বাস ছিল, তাহা না হইলে বিষ্ণুপুর

বাড়ীতে রাখালী করিতেন। সমগ্র রাঢ় দেশের মধ্যে কেবলমাত্র সাত শত ব্রাহ্মণের বাস ইহা নিতান্ত অসম্ভব। গণনার অতিরিক্ত পৈতাধারী অনেকে ছিলেন, তাঁহারা সপ্তশতীর মধ্যেও স্থান পান নাই। প্রজা রাজপ্রিয় হইবার জন্য রাজধর্ম্মী হইয়া যায়, কাজেই বৌদ্ধ রাজার অধিকার কালে বৈদিক যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান প্রায় লোপ পাইয়াছিল বলিয়া ব্রাহ্মণেরা বৈদিক কার্য্য ভুলিয়া গিয়াছিলেন, আবার যখন হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুদয় হইল, দেশাধিপতিগণ বৈদিক ক্রিয়াকলাপের পক্ষপাতী হইলেন, আবার যখন রাজ্যের স্থানে স্থানে হোমাগ্নিসম্ভূত ধূমরাশি আকাশমার্গে উড্ডীন হইতে লাগিল, শ্রোত্রিয়ের বেদমন্ত্র পাঠে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত হইল, তখন হিন্দুরাজাদের যাজ্ঞিক কার্য্যানুষ্ঠান জন্য বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হইল, বঙ্গদেশে তখন যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ খুজিয়া মিলিল না, কাজেই গৌড়েশ্বর আদিশূরকে কান্যকুব্জ হইতে বেদপারগ ব্রাহ্মণ আনাইতে হইল। পঞ্চগোত্রের পাঁচটি ব্রাহ্মণ আসিয়া গৌড়েশ্বরের যজ্ঞ সমাপন করিলেন কিন্তু স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া সমাজে স্থান পাইলেন না, অগত্যা তাঁহাদিগকে স্ত্রীপুত্রপরিজন লইয়া এদেশে বসবাস করিতে হইল। আদিশূর তাঁহাদের অবস্থিতি জন্য পাঁচজনকে পাঁচ খানি গ্রাম দান করিলেন—

> পঞ্চকোটিকামকোটিহরিকোটি স্তথৈবচ।
> কঙ্কগ্রামো বটগ্রামঃ স্তেষাং স্থানানি পঞ্চৈবঃ॥
>
> ঘটককারিকা।

সেই পাঁচখানি গ্রাম এই—পঞ্চকোটি, কামকোটি, হরিকোটি, কঙ্কগ্রাম এবং বটগ্রাম। কেহ বলেন এই পাঁচ খানি গ্রাম গৌড়ের সন্নিহিত কিন্তু তাহার বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায়

না। সমন্ধ নির্ণয়কার সেই পাঁচ খানি গ্রাম যে রাঢ় দেশের মধ্যে তাহা সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা নিষ্ফলা হয় নাই। গৌড়েশ্বরের অধীন সামন্ত রাজগণের বৈদিক যাগযজ্ঞ সম্পাদন সৌকর্য্যার্থ তাঁহাদিগকে এক জায়গায় না রাখিয়া রাঢ়ের বিভিন্ন স্থানে সন্নিবিষ্ট করাই সমধিক সম্ভাবিত মনে করিতে হয়; বিশেষতঃ পালবংশীয় বৌদ্ধ নরপতিগণ অচিরে গৌড় অধিকার করিয়া ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধনার্থ যে চেষ্টা না করিয়াছিলেন এমন নহে, কান্য-কুব্জ হইতে সমাগত ব্রাহ্মণগণকে গৌড়ে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করা তাঁহাদের পক্ষে ততটা সম্ভব নহে, বিশেষতঃ আদিশূরপুত্র ভূশূর রাজ্য-চ্যুত হইয়া যখন রাঢ়দেশ আশ্রয় করিয়াছিলেন তখন পিতার আদৃত ও পূজিত ব্রাহ্মণগণকে যে বৌদ্ধ নরপতির হাতে তুলিয়া দিয়া আসিয়া-ছিলেন ইহাও বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। অতএব তাঁহারা যে রাঢ়ের নানা স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন ইহাই সমধিক সম্ভাবিত।

রাঢ়ীয় কুল-মঞ্জরীর মতে আদিশূরের পুত্র ভূশূর গৌড়দেশ পরিত্যাগ করিয়া রাঢ়দেশে আশ্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সহিত শ্রীহর্ষ, ভট্টনারায়ণ, বেদগর্ভ, দক্ষ, ছান্দড় প্রভৃতি যে সমস্ত বিপ্রসন্তান প্রথমে রাঢ়ে আসিয়া বাস করেন, তাঁহারাই রাঢ়ীয় বিপ্রগণের বীজ পুরুষ বলিয়া পরিগণিত। বাসস্থান অনু-সারে এই ভূশূরের সময়েই বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে রাঢ়ীয় বারেন্দ্র ও সাতশতী এই তিনটী শ্রেণীভেদ ঘটে।

এই কারণ পূর্ব্বোক্ত গ্রাম পাঁচখানিকে রাঢ়দেশের অন্তর্গত বলিতে হয়। ব্রাহ্মণপঞ্চকের ৫৬টি সন্তান জন্মেন তাঁহারা পরবর্ত্তী গৌড়েশ্বরের নিকট এক একখানি গ্রাম প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে বসবাস করেন। সেই সকল গ্রামানুসারে ভূশূরের পুত্র ক্ষিতি

শূরের দ্বারা গাঞী সংজ্ঞা নির্দ্দিষ্ট হয়। সেই ৫৬ খানি গ্রামের নামাদি।—

ক। ভট্টনারায়ণের ১৬ পুত্রের ১৬ খানি গ্রাম যথা—১। বন্দ্য। ২। কুসুম। ৩। দীর্ঘাঙ্গ। ৪। ঘোষাল। ৫। বটব্যাল। ৬। পারিহা। ৭। কুলকল। ৮। কুশার। ৯। কুলভি। ১০। সেবক। ১১। গড়গড়ি। ১২। আকাশ। ১৩। কেশর। ১৪। মাসচটক। ১৫। বসুয়ারি। ১৬। করাল।

খ। দক্ষের ১৬ পুত্রের ১৬ খানি গ্রাম যথা,—১। চট্টো। ২। অম্বুল। ৩। তৈলবাটী। ৪। পোড়ারী। ৫। হড়। ৬। গূড়। ৭। ভূরিষ্টাল। ৮। পালধি। ৯। পাকড়াশ। ১০। পুষল। ১১। মূলগ্রাম। ১২। কোয়ারী। ১৩। পলসা। ১৪। পীতমুণ্ড। ১৫। সিমলা। ১৬। ভট্ট।

গ। শ্রীহর্ষের ৪ পুত্রের ৪ খানি গ্রাম যথা,—১। মুখটী। ২। ডিংসাহী। ৩ সাহব। ৪। রাই।

ঘ। বেদগর্ভের ১২ পুত্রের ১২ খানি যথা,— ১। গাঙ্গুল ২। পুংসিক। ৩। নন্দীগ্রাম। ৪। ঘণ্টেশ্বর। ৫। কুন্দগ্রাম। ৬। সিয়ার। ৭। সাটেশ্বর। ৮। দায়। ৯। নায়েব। ১০। পারিহাল। ১১। বালিয়া। ১২। সিন্ধল।

ঙ। ছান্দড়ের ৮ পুত্রের ৮ খানি যথা—১। কাঞ্জিলাল। ২। মহিন্তা। ৩। পুতিতুণ্ড। ৪। পিপলা। ৫। ঘোষাল। ৬। বাপুল। ৭। কাঞ্জার। ৮। সিমলাল।

এই ৫৬ গ্রামের সকল গুলিই প্রায় রাঢ় দেশের মধ্যে। তবে কোন কোন গ্রামের নাম বিকৃতি বা লোপ পাইয়াছে। অনেক গুলিকে এখনও চিনিয়া লইতে পারা যায়।

অচিরকাল মধ্যে রাঢ় দেশে ব্রাহ্মণের সংখ্যা বেশী হইয়া

উঠিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের মর্য্যাদাবৃদ্ধির জন্য যাঁহারা নবগুণবিশিষ্ট রাজা বল্লাল সেন তাঁহাদিগকে সমাজের উচ্চ স্থানে বসাইলেন, এই সামাজিক সম্মান বংশগত না করিয়া ব্যক্তিগত রাখিলে ভাল হইত। বল্লালপ্রতিষ্ঠিত কৌলিন্য একাদিক্রমে সাড়েছয় শত বর্ষ অপ্রতিহত ছিল। এক্ষণে অনেক শৈথিল্য ঘটিয়াছে।

হিন্দুরাজত্বে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ ছিল। সকল ব্যক্তিই আপনাপন জাতীয় বৃত্তির অনুসরণ দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত, কৃষি বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নতি ছিল। হিন্দু রাজা প্রকৃতি পুঞ্জের সুখৈশ্বর্য্যবৃদ্ধির জন্য মুক্তহস্ত ছিলেন। হিন্দুর জাতীয় ইতিহাস না থাকিলেও পুরাণাদি শাস্ত্রে তদানীন্তন সামাজিক অবস্থার অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। কোন কোন পুরাণের বিষয় বিশেষ অতিরঞ্জিত বলিয়া আজকাল প্রতীয়মান হইলেও তাহা যে একবারেই ভিত্তিহীন এরূপ হইতে পারে না। পৌরাণিক কালের হিন্দু সামুদ্র পথে পোত চালনা দ্বারা বিদেশে বাণিজ্য করিতেন, স্বদেশের পণ্য বিনিময়ে বিদেশের পণ্য স্বদেশে আমদানি করিতেন।

মনুষ্য মাত্রেই ধর্ম্মভীরু ছিল, সকলেই ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশাসন মানিয়া চলিত, তাহার অন্যথাচরণে পাপ বোধ করিত, পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধ এবং তদুপলক্ষে অন্নবস্ত্র বিতরণে কাতর হইত না। সকল গৃহস্থেই সাধ্যানুসারে অতিথি সেবা করিত, অতিথি বৈমুখ করাকে অতি বড় পাপ মনে করিত। ব্রাহ্মণেরা সদাচার ছিলেন, ত্রিসন্ধ্যা করিতেন, নিত্য নৈমিত্তিক যজ্ঞানুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ ছিলেন না। স্ত্রীলোকের পতিপরায়ণতাই প্রধান ধর্ম্ম ছিল, তাঁহারা পতিকে সাক্ষাৎ দেবতা জ্ঞান করিতেন, লজ্জাশীলতা তাঁহাদের অঙ্গের আভরণ অপেক্ষাও শোভা বৃদ্ধি করিত, পতির অনুমৃতা

হইতে পারিলেই জন্ম সার্থক জ্ঞান করিতেন, সহমরণের সংবাদ পাইলে পিপীলিকা শ্রেণীর ন্যায় স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকা আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া তাহা দেখিতে যাইত, শ্মশানক্ষেত্র লোকে লোকারণ্য হইত। সতীদাহে মহাসমারোহ হইত—ঢাকঢোল খোল-করতাল বাজিত—সতী বেশবিন্যাস করিতেন, নব বস্ত্র পরিধান করিতেন, আত্মীয়েরা সর্ব্বাঙ্গে চন্দনচর্চ্চিত করিয়া দিত, গলায় পুষ্পমাল্য পরাইত, পদতল অলক্তে রঞ্জিত করিত, হাত দুইটীতে নূতন শাঁখা পরাইত, কপালে সিন্দুর দিত—সেই সিন্দুর পাইবার জন্য কত স্ত্রীলোক প্রার্থনা করিত, পাইলে আপনি পরিত, আপনার পুত্র-বধূ ও কন্যাদের মাথায় দিত—সতীর সিন্দুর মাথায় দিলে বৈধব্য ভোগ করিতে হয় না, সতীর সিন্দূরকে এতই পবিত্র মনে করিত।

তাহার পর ব্রাহ্মণে মন্ত্র বলাইতেন—সতী স্বামী অনুগমনের সঙ্কল্প করিয়া সতীশ্বরী ভগবতীর নিকট কামনা পূর্ণ করিবার জন্য প্রার্থনামন্ত্র পাঠ করিতেন, ধান ও কড়ি ছড়াইতে ছড়াইতে শ্মশানক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া সজ্জিত চিতায় আরোহণ করিতেন এবং স্বামীর শব কোলে লইয়া দক্ষিণ হস্তে একটী আম্রশাখা ঘুরাইতে ঘুরাইতে ভস্মীভূতা হইতেন। চলিত কথায় ইহাকে আগুন খাওয়া বলিত।

মোগলরাজত্বে সম্রাট সাজেহানের আমলে বার্ণিয়ার নামে একজন ফরাসী চিকিৎসক এদেশে আসিয়া নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, তিনি সহমরণ প্রথাকে যার পর নাই বর্ব্বরতা ও নিষ্ঠুরতার কাজ বলিয়া গিয়াছেন, এবং অনেকগুলি সতীদাহ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষও করিয়াছিলেন। তিনি বলেন একদা আমেদাবাদ হইতে আগ্রা আসিবার পথে এক রাজার রাজ্য মধ্যে এক বটবৃক্ষতলে তাঁহাকে সায়ংকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইয়া-

ছিল, নিকটবর্ত্তী স্থানে একটী সতীদাহের সংবাদ পাইয়া তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন—একটা গভীর গর্ত্তের মধ্যে রাশীকৃত কাষ্ঠের উপর একটী পুরুষের মৃতদেহ, তাহার কাছে একটী স্ত্রীলোক উপবিষ্টা, চারি পাঁচজন ব্রাহ্মণ সেই কাষ্ঠস্তূপের নানা স্থানে অগ্নি সংযোগ করিতেছিল। আর পাঁচটী মাঝারি বয়সের স্ত্রীলোক উত্তম বেশভূষা এবং পরস্পরের হাত ধরাধরি করিয়া সেই গর্ত্তের চতুর্দ্দিকে নাচিতে নাচিতে গান করিতেছিল। অনেক স্ত্রী পুরুষ চতুর্দ্দিকে দাঁড়াইয়া সেই দৃশ্য দেখিতেছিল। কাষ্ঠ স্তূপের উপর পর্য্যন্ত ঘৃত তৈল ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। অগ্নি সংযোগ মাত্র ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সহমৃতার পরিচ্ছদে কুমকুম চন্দন চূর্ণ ও সুগন্ধি তৈল দেওয়া হইয়াছিল। আমি তাহার মুখশ্রীতে বিন্দুমাত্র দুঃখকষ্টের চিহ্ন অনুভব করিতে পারিলাম না। সে কেবল মুখে এই বলিতে লাগিল "পাঁচ ও দুই অর্থাৎ আমি পাঁচ জন্ম এই স্বামীর সহিত দগ্ধ হইয়াছি আর দুই বার বাকী, তাহা হইলেই আমার সাত জন্ম পূর্ণ হয় *" আমি মনে করিয়াছিলাম সেই পাঁচটী স্ত্রীলোকের নাচগান কেবল আড়ম্বর মাত্র কিন্তু যখন দেখিলাম ঐ পাঁচটী স্ত্রীলোকের মধ্যে একটীর

---

* উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে লেখকের নিকটবাসিনী এক ব্রাহ্মণপত্নী স্বামীর অনুমৃতা হইবার জন্য প্রস্তুত হইলে আত্মীয় স্বজনেরা তাহাকে প্রতিনিবৃত্তা হইবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিলেও তিনি শ্মশান ভূমিতে উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে—"আমি এই স্বামীর সহিত এই স্থানে ছয় জন্ম দগ্ধ হইয়াছি। মাটী খুলিয়া দেখ—নীচে নীচে ছয়টী শ্মশান দেখিতে পাইবে। আত্মীয়েরা মাটী খুলিয়া যখন সেই স্থানে ছয়টী শ্মশান নীচে নীচে দেখিতে পাইলেন তখন আর অপত্তি করিতে পারিলেন না—সত্য হানিতে স্বামীসহমৃতা হইলেন।

কাপড়ে চিতাগ্নি স্পর্শ করিল তখন সে মাথা হেঁট করিয়া চিতায় পড়িয়া গেল, সেইরূপে অপর একটী স্ত্রীলোকের কাপড়ে আগুন ধরিলে সেও যখন চিতায় পড়িল তখন বাকী তিনটী স্ত্রীলোক হাত ধরাধরি করিয়া স্থির ও ধীরভাবে নাচিত নাচিতে একে একে তিন জনেই সেই অগ্নিকুণ্ডে পড়িয়া ভস্মীভূতা হইল। এই পাঁচটী স্ত্রীলোক সহমৃতার সখী প্রভু পরায়ণতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনার্থ তাহারা আত্মজীবন বিসর্জ্জন করিল।"

ফরাসী পরিব্রাজক এই অত্যদ্ভুত আত্মহত্যা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে - এ দেশের সকল প্রসূতিই আপনাপন কন্যাগণকে বাল্যকাল হইতে শিক্ষা দিয়া থাকেন যে, স্বামীর সহিত একই চিতায় দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করার তুল্য পুণ্য এবং প্রশংসার কাজ আর নাই। অতএব বড় ঘরের স্ত্রীলোক মাত্রেরই ইহা কর্ত্তব্য। স্ত্রীলোকদিগকে বশীভূত রাখিবার, পীড়াকালে তাহাদের নিকট শুশ্রূষা পাইবার এবং বিষপ্রয়োগে স্বামীহত্যা না করে এই সকল কারণে পুরুষেরা সহমরণের পোষকতা করিত।

সাহেবের বিদ্যাবুদ্ধির দৌড়টা বিচারশক্তির মাপ কাঠিতে মাপিয়া দেখুন। কেবল ইহাই নহে, ফরাসী সাহেব কয়েকটী ঘৃণিত দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া আপনার মন্তব্য শেষ করিয়াছেন। বড় বেশী দিনের কথা নহে বঙ্গদেশের পূর্ব্বতন গবর্ণর সার ফ্রেডরিক হালিডে সাহেব যখন হুগলির মাজিষ্ট্রেট ছিলেন তখন তিনি গঙ্গাতীরে এক সতীদাহ দেখিয়া যার পর নাই বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন *। সতী ব্রাহ্মণ কন্যা—সাহেব তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া আত্মহত্যায়

* Mr. Buckland's Bengal under Leiut-Governors.

প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সতী দীপশিখায় আপন অঙ্গুলী রাখিয়া প্রফুল্ল মুখে অনেকক্ষণ অবস্থিতি করিবার পর দেখা গেল তাঁহার অঙ্গুলি পুড়িয়া ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে কিন্তু তাহাতে সতী একটী বারের জন্য মুখ কুঞ্চিত করেন নাই।

যদি ইহা অভ্যাসেরই কাজ হয়, তাহা হইলে যে বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া এই অভ্যাস লাভ করা যায় তাহা যে প্রশংসার যোগ্য এ কথা কে না মানিবে। এখন আইন দ্বারা সতীদাহ বন্ধ হইয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু অদ্যাপি কত স্ত্রীলোক আশ্চর্য্যরূপে পতিবিয়োগে অনুগমন করিতেছেন, সংবাদ পত্রে প্রায়ই সেরূপ মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া যায়। এই সেদিনের কথা—চক্ষুর উপর যাহা ঘটিয়া গেল বা তাহার কথা শুনিয়া কে না সতীধর্ম্মের মহতী মহিমা মানিবেন। সন ১৩২০ সালের ২৫শে মাঘের বঙ্গবাসীতে যে একটী অত্যাশ্চর্য্য সহমরণের সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

কলেরারোগে হুগলি উত্তরপাড়ার নারায়ণদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গত সরস্বতী পূজার দিন মৃত্যু ঘটিয়াছে। তাঁহার পত্নী গিরিবালা দেবীর বয়স অনুমান চল্লিশ বৎসর। গিরিবালা শুক্রবার সারা রাত্রি পতির সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। শনিবার সকাল বেলা পতির মৃত্যু হইতে আর বিলম্ব নাই বুঝিয়াই তিনি চুপে চুপে একটা ঘরের ভিতর গিয়া কেরোসিন তৈলে সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত করেন এবং তাহাতে আগুণ ধরাইয়া দেন। নারায়ণ দাসের শব লইয়া যাইবার সময় তাঁহার পত্নীর সন্ধান লইতে গিয়া বাড়ীর লোকে দেখিতে পায়,—গিরিবালার মৃত্যুও প্রায় সন্নিকট। তখনই আগুন নিবাইয়া তাঁহাকে

বাঁচাইবার চেষ্টা করা হয়। ডাক্তারেরা অনেক চেষ্টার বেলা ১১টার সময় গিরিবালার চৈতন্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। গিরিবালা চেতনা পাইরা চোথ খুলিয়া পতীর তত্ত্ব লয়েন। তখন তাঁহাকে সত্য কথাই বলা হয়। তাহাতে গিরিবালা বলেন,—"শব এখন দাহ করিও না; বেলা চারিটা পর্য্যন্ত রাখিও; তখন আমার শবও তাঁহার সহিত এক চিতায় দাহ করিতে পারিবে।" আর তিনি কথা কহেন নাই। বেলা দেড়টার সময় তাঁহার মৃত্যু ঘটে। একই চিতায় পতিপত্নী উভয়েরই শব দাহ করা হইয়াছিল। গিরিবালার চিতার সাজের জন্য উত্তর পাড়ার কোন সম্ভ্রান্ত মহিলা একখানি বেণারসী সাড়ী দিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছামত এই শাড়ী পরাইয়াই গিরিবালার শব দাহ করা হয়। গিরিবালার দুইটী পুত্র ও দুইটী কন্যা। একটী পুত্র ও একটী কন্যা নিতান্ত শিশু।

ইহা কি সুখের মরণ—যে দেহে একটী কণ্টক বিদ্ধ হইলে তাহার যাতনা অসহ্য হইয়া উঠে, সেই দেহে অগ্নি প্রজ্জ্বালিত করিয়া দেওয়া এবং তাহার দুঃসহ যাতনা সহাস্য মুখে সহ্য করা কি সহজ কথা। এই অসাধারণ সহিষ্ণুতার কি তুলনা আছে, দেবীপ্রতিমা গিরিবালা যে নিত্য এইরূপ অভ্যাস করিতেন তাহা নহে। এই অভ্যাস জন্মজন্মান্তরীন্। যতদিন জন্মান্তরবাদের প্রত্যক্ষ প্রমাণ না মিলিতেছে ততদিন ইহার গুহ্যাদপি গুহ্য রহস্য প্রকাশ পাইবে না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা তাহাতে নিশ্চিন্ত নহেন।

পাশ্চাত্য প্রত্নতাত্ত্বিক।—গ্রীসের অধীশ্বর আলেক-

পণ্ডিত ইউরোপে ভারতবার্ত্তা প্রচারিত করেন, সেই সময় হইতেই পাশ্চাত্য নরপতিগণ ভারতের প্রতি লুব্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া মধ্যে মধ্যে মন্ত্রণা আঁটিতেন কি উপায়ে দুস্তর বারিধি অতিক্রম করিয়া এদেশে আসিতে পারা যায়। তৎকালে ইউরোপীয় জাতির নৌবিদ্যায় এতটা পারদর্শিতা জন্মে নাই। তদ্রূপ সামুদ্রপোতও ছিল না। পরে গ্রীকরাজ আলেকজন্দর জলস্থল পথে বহু কষ্টে আসিয়া-খণ্ডে পদার্পণ করিয়া ভারতের পাশ্চাত্য দেশগুলিতে আপনার বিজয়বৈজয়ন্ত প্রতিষ্ঠিত করিতে করিতে সিন্ধুতীরে উপস্থিত হয়েন। অতি কষ্টে সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়া কয়েকটী হিন্দু রাজার সহিত যুদ্ধ বিগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়া যেরূপে এ দেশে আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা করেন তাহা ইতিহাস পাঠকের অনবগত নহে, সুতরাং এস্থলে তাহা বর্ণিত হইল না। আলেকজন্দরের সহিত কতকগুলি গ্রীস দেশীয় পণ্ডিত আসিয়াছিলেন তাঁহারা সৈনিক কার্য্যে যতদূর ব্যাপৃত থাকুন না থাকুন এ দেশের বিবরণ সংগ্রহ করিতে তাঁহারা অধিকাংশ সময়াতিপাত করিতেন। স্বদেশ প্রত্যাগমনকালে পথিমধ্যে আলেকজন্দরের পরলোক লাভ হইলে তাঁহার বিজিত রাজ্য নানা ভাগে বিভক্ত হইয়া কয়েকজন সেনাপতির হস্তগত হয়। ভারত রাজ্য সেলিউকশের ভাগে পড়িয়াছিল। তৎকালে মগধরাজ চন্দ্রগুপ্ত ভারতসম্রাজ্যে আধিপত্য করিতেছিলেন। সেলিউকশ আপন রাজ্য নিরাপদ করিবার জন্য চন্দ্রগুপ্তকে এক কন্যা সম্প্রদান করিয়া তাঁহার সহিত যেন সম্বন্ধ সংস্থাপিত করেন এবং মিগাস্থিনিস নামক একজন গ্রীসদেশীয় পণ্ডিতকে চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পাটলীপুত্র নগরে রাখিয়া দেন। মিগাস্থিনিস অনেক দিন রাজসভায় অবস্থিতি করিয়া এদেশের নানা বিষয়ক সংবাদ

সংগ্রহ করেন। তাঁহার লিখিত ভারত বিবরণ ইউরোপের নানা জাতির মহা-আদরের ধন হইল। জর্ম্মণ, ফরাসী প্রভৃতি পণ্ডিতেরা তাহা সংগ্রহ করিবারে চেষ্টা করিয়া সমগ্র সংগ্রহ করিতে পারেন নাই—নষ্ট হইয়া গিয়াছিল *। তাহার পরে যিনি যতটুকু পাইয়াছিলেন, তিনি ততটুকু কাটিয়া জুড়িয়া আপনাপন ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সেই সকল বিবরণ হইতে আমরা রাঢ় সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতে পারি না। খৃষ্টীয় শকারম্ভের কিছুদিন পরে প্লীনি টলেমী প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা আপনাপন গ্রন্থে যে ভারত বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা মিগাস্থিনিসের উক্তির প্রতি-ধ্বনি, আর পরবর্ত্তী ভারতভ্রমণকারিদের মুখে শুনা বা লিখিত বিবরণের সারাংশ মাত্র। মিগাস্থিনিশও রাঢ় দেশের কিছুই চক্ষে দেখেন নাই, একেত তিনি বিদেশের লোক, এদেশের ভাষা বুঝিতে অক্ষম। যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের মুখে শুনিয়া তিনি এ দেশের কথা লিখিয়াছিলেন, এদেশের ভৌগলিক তত্ত্বে তাঁহাদের কতদূর অধিকার ছিল তাহাও বলা যায় না। কাজেই কেবলমাত্র একজন বিদেশীয় পণ্ডিত যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহাই অভ্রান্ত এরূপ মনে করা আমাদের মত ইতিহাসকাঙ্গাল জাতির পক্ষে স্বতঃসিদ্ধ হইলেও তাহার সত্যাসত্য সম্বন্ধে এখন আমাদের আন্দোলন করা কর্ত্তব্য। মিগাস্থিনিস যে ভারতীয় বিবরণ লিপি-বদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা লাটিন ভাষায়। লাটিন সংস্কৃতের ন্যায়

* These works are all lost, but their substance is to be found condensed in Strabo. Pliny and Arrian.—Ancient India as described by Megasthenes and Arrian by J. W. Mc Crindle M. A.

ভাষা—ভিন্নার্থবোধক অনেক শব্দই তাহাতে আছে। তজ্জন্য জর্ম্মণ পণ্ডিত সনবেক প্রভৃতির অনুবাদে অনেক বৈচিত্র্য ঘটিয়াছে। সকলে একমত হইতে পারেন নাই। মিগাস্থিনিস ঠিক কোন সময়ে আসিয়া কত দিন এদেশে অবস্থিতি করিয়াছিলেন তাহাও অদ্যাপি অনিশ্চিত, তবে আন্দাজ অনুমানে খৃষ্টীয় শাকের ৩০২ বৎসর পূর্ব্বে বলিয়াই স্থির করা হইয়াছে। এরিয়েনাশ বলেন—It appears to me that Migasthenes did not see much of India but yet more than the companions of Alexander. আমার বোধ হয় মিগাস্থিনিশ ভারতের অধিকাংশ না দেখিলেও আলেকজন্দরের অন্যান্য সহচর অপেক্ষা বেশী দেখিয়াছিলেন।

অন্যত্র—Then, again, we know that he reached Pataliputra by travelling along the royal road. But he does not appear to have seen more of India than those part of it, and he acknowledges himself that he knew the lower part of the country traversed by the Ganges only by hearsay and report. আবার আমরা দেখিতে পাই যে তিনি রাজপথ দিয়া পাটলীপুত্র গিয়াছিলেন তদতিরিক্ত ভারতের অন্যান্য স্থান দেখিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না এবং তিনি আপনি স্বীকার করিয়াছেন যে নিম্নস্থ গাঙ্গ্য প্রদেশ সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিয়াছেন সমস্তই লোকমুখে শুনিয়া।

আমাদেরও ইহাই মনে হয়, কারণ তিনি নিম্নবঙ্গের গঙ্গা ও সাগরের মুখে গঙ্গারিদে নামে এক রাজ্যের উল্লেখ করিয়া আমা-

দিগকে মহা ধাঁধায় ফেলিয়াছেন—বেদে নাই, পুরাণে নাই, তন্ত্রে নাই—এমন এক দেশের নাম পাশ্চাত্য পরিব্রাজকের নিকট অবগত হইলাম,—অবশ্য বিদেশীয়ের বানানে নামটার কথঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য সম্ভব হইলেও কতক সামঞ্জস্য না থাকিলে চলে কই। আছে মাত্র গঙ্গাতীরে রাঢ়দেশ, তাহার নাম যে গঙ্গারাঢ় ছিল তাহা পূর্ব্বে কখন শুনা যায় না—টলেমিও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন।* গঙ্গারিডাই নামটী গ্রীক্‌দিগের গঠিত। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কোন রাজপুত্রের মুখে শুনিয়া আলেকজান্দারকে এই নাম শুনান হইয়াছিল। আমাদেরও ইহা প্রকৃত বলিয়া মনে হয়। আজি কালি অনেক খুঁজিয়া-পাতিয়া নাকি মুর্শিদাবাদ জঙ্গিপুর অঞ্চলে গঙ্গারডি নামে এক গ্রাম মিলিয়াছে তাহাই মিগাস্থিনিশের গঙ্গা-রিডাই বলিয়া স্থির হইতেছে। কেমন করিয়া একথা মানিব—মিগাস্থিনিশের গঙ্গারিডাই গঙ্গার মোহনায় একটী রাজ্য—তাহার পাশাপাশি সমুদ্রতীরবর্ত্তী কলিঙ্গ দেশ। এই ক্ষুদ্র গ্রামটী কলিঙ্গ হইতে বহু দূরবর্ত্তী। টলেমীর অনুমান—The country Ganga-

---

* The name of Gangaridai has nothing in Sanskrit to correspond with it, nor can it be a word, as Lassen supposed, of purely Greek formation, for the people were mentioned under this name to Alexander by one the princes in the North-west of India. Mc Crindale's Ptolemy. Page 175.

† When you are over Ganges the first region upon the coast that you yet foot into, is that of the Gangaridai and

ridai and the city which Pliny speaks of, as their capital, Parthalis can only be Vardhana, a place which flourishes in ancient times, and is now known as Bardwan – গঙ্গারিডাই এবং তাহার রাজধানী পার্থলিস বর্দ্ধন বই আর কিছুই নহে পুরাকালে উহা বড় সমৃদ্ধিশালী ছিল এবং অধুনা বৰ্দ্ধমান নামে খ্যাত।

আমাদের পাশ্চাত্যমতানুরাগ এতই বাড়িয়া উঠিয়াছে, যে পাশ্চাত্য প্রত্নতাত্ত্বিকগণের অভিমতকে একবারে অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ করি না, অথচ তাঁহাদের মধ্যে এত মত-ভেদ যে তাহাতে হাস্য সম্বরণ করা যায় না। আমরা এতই অস্থির ও অব্যবস্থিত যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা কে কি বলিতেছেন, তাহা ভাল করিয়া দেখিবার ও বুঝিবার অবকাশ গ্রহণ করি না। গঙ্গারিদের রাজধানী এক গাঙ্গী লইয়া তাঁহাদের মধ্যে কত মতভেদ দেখুন—হিরেণ বলেন উহা কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্বে ৪০ মাইল দূরে, ইচ্ছামতী নদীর শাখার উপর এবং ধুলিয়াপুরের নিকট। উইলফোর্ড বলেন—গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গমস্থলে। মরে বলেন—চট্টগ্রামে। টেলর বলেন – বঙ্গের প্রাচীন হিন্দু-রাজধানী সুবর্ণগ্রাম যেখানে ছিল সেইখানে। কানিংহাম বলেন—যশোহরে। আর এক পণ্ডিত বলেন—তাহার আরও পশ্চিমে কলিকাতার নিকটে অথবা উহার ৩০ মাইল উত্তরে হুগলী নদীর তীরে চুঁচুড়ার কাছে। আর্টিমেডরস পাটলীপুত্রের উত্তর পশ্চিমে আর এক গাঙ্গীর কথা বলেন। উইলফোর্ড বলেন তাহা প্রয়াগ। আমা-দের বোধ হয় এ দেশের প্রত্ন-তাত্ত্বিকেরা তাহারই অনুকরণে এখন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কারে আপনাদের নাম কিনিবার সুবিধা করিয়া

লইতেছেন—সত্যাবধারণের জন্ত ততটা উৎসুক্য কই। গ্রোশফোর্ড বলেন—উহা অনুপসহর।*

বিচার ও শাসন-প্রণালী।— হিন্দু চিরদিন শাস্ত্রের অধীন—হিন্দুসমাজ আবহমান কাল হিন্দুশাস্ত্রের বিধিব্যবস্থানুসারেই চলিয়া আসিতেছে। মুসলমানেরাও হিন্দুর বিধিব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করেন নাই; হিন্দু জমিদারেরা হিন্দুশাস্ত্রের ব্যবস্থানুযায়ী প্রজাপালন ও রাজ্য শাসন করিতেন। বশিষ্ঠ, পরাশর, শঙ্খ, জিমুতবাহনাদির ধর্ম্মশাস্ত্র সময়ে সময়ে প্রচলিত থাকিলেও প্রধানতঃ মনুর অনুশাসন আদৃত হয় নাই। ঋণগ্রহণ, ধন দান, ঋণ শোধ, গচ্ছিত দ্রব্যের আদান প্রদান, ক্রয় বিক্রয় চুক্তি, পৈতৃক ধন-বিভাগ, বাক্‌পারুষ্য, দণ্ড পারুষ্য, ব্যভিচার, পরস্ত্রীগমন, চুরি ডাকাইতি, নরহত্যাদি নানা বিষয়ের অভিযোগ

* Gange—various sites have been supposed for Gange. Hence placed it near Dhuliapur, a village about 40 miles S. E. of Culcutta on a branch of Isamati river. Wilford at the confluence of the Ganges and Brahmaputra where he says, there was a town called in Sanskrit Hastimalla, and in the dialect Hastimalla from elephants being picquitted there. Murray at Chittagong. Taylor on the site of the ancient Hindu capital of Banga (Bengal) which lies in the neighbourhood of Sonargo (Subarnagram) Cunningham at Jessore, and others farther west near Calcutta or about 30 miles higher up the Hugli, somewhere near Chinsura. Another Gange is mentioned by Artemedoros above or to the N. W. of Palibothra and this Wilford identifies with Prayag *i.e.* Allahabad but Groskurd with Anupsar.

Mc Crindale's Ptolemy page 75

রাজদ্বারে উপস্থিত হইলে, রাজা তিনজন সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী, সুবিবেচক ব্রাহ্মণ অমাত্য লইয়া বিচার করিতেন, আপনি অশক্ত হইলে প্রতিনিধি দিতেন। এই সভাকে ব্রহ্মসভা বলা হইত। বিচার জন্য বাদী প্রতিবাদীর এবং সাক্ষীর এজাহার হইত। সাক্ষীকে হলপ্ দিবারও রীতি ছিল, এজেহার গ্রহণ কালে মুখের ভাবভঙ্গি, কথার উপর (demeanour) দৃষ্টি রাখাও হইত। তদ্দ্বারা মনের ভাব অনেকটা বুঝা যাইত।

*যে সকল ধনরত্নের মালিক পাওয়া যাইত না, রাজা তিন বৎসর তাহা আপনি রাখিয়া পরে বিক্রয় করিতেন, মালিক মিলিলে, দ্রব্যবিশেষে তিন ছয় বা দ্বাদশ ভাগ আপনি লইয়া বাকি মালিককে ফিরাইয়া দিতেন।

ঋণদাতা ঋণিকের নিকট আপন প্রাপ্য আদায় জন্য বল প্রকাশ করিতে পারিতেন, না পারিলে রাজদ্বারে অভিযোগ করিতেন ঋণ আদানপ্রদানে লেখ্য-পত্রের ব্যবহার ছিল। সুদের হার কম ছিল. কোনমতে আসল টাকার বেশী লইবার বিধি ছিল না। এ সকল ব্যাপারে অন্ততঃ তিনজন সাক্ষীর প্রয়োজন হইত। কৃতদার, পুত্রবান এবং এক গ্রামনিবাসী ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রের সাক্ষ্যবাক্য বলবৎ হইত। বন্ধু, সাহায্যদাতা, ভৃত্য, শত্রু এবং পেশাদার সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইত না। ব্যাধিগ্রস্থ মহাপাতকাদির সাক্ষ্যও অগ্রাহ্য হইত। রাজা, সন্ন্যাসী, সূপকার (এখনকার পাচক-ব্রাহ্মণ) নট্, কারুজীবী, ইহাদিগেরও সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইত না। গৃহাভ্যন্তরে, অরণ্যাদি নির্জ্জন স্থানে চোরাদির উপদ্রবে ও আততায়ী দ্বারা হত্যাস্থলে উক্ত ব্যাপারজ্ঞ যে কোন ব্যক্তি সাক্ষ হইতে পারিত। গুণবান সাক্ষীর অভাবে উপরিউক্ত স্থলে স্ত্রীলোক

বালক, বৃদ্ধ, দাস ও ভৃত্য প্রভৃতি বর্জ্জনীয় ব্যক্তিগণের সকলকেই সাক্ষী করা যাইত। সাক্ষ্যদ্বৈধ স্থলে রাজা বহু সাক্ষী লইতে পারিতেন। যেখানে সাক্ষী না মিলিত, বিচারক চার দ্বারা গোপনানুসন্ধানও করাইতে পারিতেন। স্ত্রীপুত্রাদির শিরস্পর্শ দ্বারা শপথ প্রবল হইত। মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে সাক্ষীর দণ্ড ব্যবস্থাও ছিল। কেহ বারম্বার মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে তাহার নির্ব্বাসন পর্য্যন্ত দণ্ড হইতে পারিত।

পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালকের ধন তাহার বয়ঃপ্রাপ্তিকাল পর্য্যন্ত রাজাই রক্ষা করিতেন। ঐরূপ পতি-পুত্রহীনা নারীর ধনরক্ষার ভারও রাজা লইতেন। রাজা প্রজার নিকট ভূমির রাজস্ব-স্বরূপ ষষ্ঠাংশ বা সময়ে সময়ে চতুর্থাংশ শস্য গ্রহণ করিতেন, কুত্রাপি অর্থও লওয়া হইত। উৎপন্ন ফসল চাষীর অনবধানতায় কম জন্মিলে রাজা আপন প্রাপ্যের অতিরিক্ত দশগুণ লইতেন। ভূমির সীমা লইয়া বিবাদ হইলে রাজা স্বয়ং তাহার মীমাংসা করিতেন। প্রত্যেক গ্রামের চতুর্দ্দিকে চারিশত হস্ত পরিমিত গোচর ভূমি রাখিতে হইত। ব্রাহ্মণ যে অপরাধই করুন কায়িক-দণ্ড হইত না। প্রথমাপরাধে সদুপদেশ, দ্বিতীয়ে ধিক্কার, তৃতীয়ে অর্থদণ্ড, চতুর্থে অঙ্গচ্ছেদাদি দণ্ড হইত। তাহাতেও যদি সে পুনরায় অপরাধ করিত, তাহা হইলে তাহাকে উপরিউক্ত চতুর্ব্বিধ দণ্ডই ভোগ করিতে হইত। তাহাতেও ক্ষান্ত না হইলে তাহাকে নির্ব্বাসিত করিয়া দেওয়া হইত। এক জিনিস আর এক জিনিসের সঙ্গে মিশাইয়া বিক্রয় করিলে অথবা খাঁটী বলিয়া ভেজাল জিনিষ বিক্রয় করিলে বিক্রেতার দণ্ড হইত। ক্ষত্রিয়কে কটুবাক্য প্রয়োগ করিলে ব্রাহ্মণের পঞ্চাশ পণ, বৈশ্যকে গালি দিলে এবং শূদ্রকে কটূক্তি

করিলে দ্বাদশ পণ দণ্ড হইত। দ্বিজাতীয়দিগের মধ্যে সবর্ণের প্রতি কটুভাষা প্রয়োগে ঐ দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। শূদ্র দ্বিজাতীয় ব্যক্তিকে কটু বলিলে তাঁহার জিহ্বাচ্ছেদ করা হইত। শূদ্র দ্বিজাতীয়ের প্রতি দণ্ডোত্তলন করিলে দশাঙ্গুল উত্তপ্ত লৌহ-শলাকা দ্বারা তাহার মুখ-গহ্বর দগ্ধ করিয়া দেওয়া হইত। শূদ্র ব্রাহ্মণকে দর্পিতভাবে ধর্ম্মোপদেশ দিলে তাহার কর্ণাভ্যন্তরে উত্তপ্ত তৈল ঢালিয়া দেওয়া হইত। স্ত্রীপুরুষের ব্যভিচারে অঙ্গবিশেষ ছেদ বা উত্তপ্ত লৌহ-শলাকা দ্বারা তাহা দগ্ধ করিয়া দিবার ব্যবস্থা ছিল। স্বর্ণ হরণের অপরাধে অপহৃত ধনের মাত্রানুসারে হস্তচ্ছেদ পর্য্যন্ত দণ্ড দেওয়া হইত। জার পুরুষকে তপ্ত লৌহময় শয্যায় শয়ান করাইয়া দগ্ধ করা হইত। ব্রাহ্মণের অপরাধ যতই গুরুতর হউক প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল না, মস্তক মুণ্ডন, নাসা-কর্ণচ্ছেদ, মস্তকের অর্দ্ধাংশ মুণ্ডন ইত্যাদি বহুবিধ লজ্জাজনক দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। মুণ্ডনাদি শূদ্রের পক্ষেও চলিত।

পালিত পশুর উপযুক্ত যত্ন না হইলে পালকের দণ্ড হইত। বস্ত্র ক্ষালনের সময় রজক একের কাপড় অন্যের সহিত মিশাইতে পারিত না বা একজনের কাপড় অন্যকে দিতে পারিত না।

তন্তুবায় বস্ত্রবয়ন জন্য দশপল (৮০ তোলা) সূতা পাইলে পিষ্ট (অন্নাদির মাড়) অনুপ্রবেশ জন্য একাদশ পল ওজনের বস্ত্র না দিলে তাহার দ্বাদশ পল দণ্ড হইত।

মিগাস্থিনিসের পাটলীপুত্র নগরে অবস্থিতি কালে তিনি এ দেশের বিচারালয় সমূহে যেরূপ শাসন ও বিচার-প্রণালী দেখিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন তাহাতে বোধ হয়, তৎকালেও মনুর ব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল।

মিগাস্থিনিশ হিন্দুরাজত্বের শাসনপ্রণালী সম্বন্ধে বলিয়াছেন।

A person convicted of bearing false witness suffers multilation of his extremities. He who maimed any one, not only suffers in return the loss of the same limb, but his hair is also cut off. If any one causes an artizan to lose his hand or eye he is put to death.

Mc. Crindle's Ancient India as described by Megasthenes.

If one is guilty of a very hienous offence the King orders his hair to be cropped, this being a punishment to the last degree infamous.

* * * * *

Theft is of very rare occurrence.

* * * * *

The simplicity of their laws and their contracts is proved by the fact that they seldom go to law. They have no suits about pledges or deposits nor do they require either seals or witnesses but make their deposits and confide in each other—Ibid—

ভারতবাসী দেনাপাওনার জন্য আদালতের আশ্রয় লয় না। এ কথা বলায় বোধ হয় তিনি দেনাপাওনার বিচার দেখেন নাই, অথবা মনুর আমল হইতেই ভারতবাসী তাঁহার ব্যবস্থানুসারে

এতই সৎ হইয়া উঠিয়াছিল যে দেনাপাওনার কাজ বিশ্বাসের উপরেই চলিত। কাহাকেও তজ্জন্য আদালতের আশ্রয় লইতে হইত না। ইহাই প্রকৃত বলিয়া বিশ্বাস হয়, কারণ আমরা পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দেখিয়াছি যে সে সময় এইরূপেই দেনাপাওনা চলিত।

মনুসংহিতায় উল্লিখিত আছে—প্রত্যেক গ্রামে এক এক জন করিয়া বিশ্বাসী সচ্চরিত্র গ্রামাধিপ থাকিতেন। তেমন দশখানি গ্রামের উপর একজন, বিংশতি গ্রামের উপর একজন, শত গ্রামের উপর একজন এবং সহস্র গ্রামের উপর একজন কর্ত্তৃত্ব করিতেন। গ্রামে চৌর্য্যাদি ঘটিলে গ্রামাধিপ স্বয়ং তাহার প্রতীকারে প্রবৃত্ত হইতেন, তাঁহার অসমার্থতায় দশগ্রামাধিপ, এইরূপ ক্রমানুসারে সহস্র গ্রামাধিপ পর্য্যন্ত সকলেই চেষ্টা করিতেন। রাজার প্রাপ্য অন্নপানীয় ও ইন্ধনাদি গ্রামাধিপের প্রাপ্য, দশগ্রামাধিপ ষড়্গবাকৃষ্ট হলদ্বয়ে কর্ষণযোগ্য ভূমি ভোগ করিতেন, বিংশ গ্রামাধিপ তাহার পাঁচগুণ ভূমি, শতগ্রামাধিপ এক খানি গ্রাম এবং সহস্রগ্রামাধিপ একটী নগর বৃত্তি স্বরূপ ভোগ করিতে পাইতেন। তাঁহারা উৎকোচাদি গ্রহণ দ্বারা প্রজাপীড়ক না হয়েন এজন্য চার দ্বারা তাহার অনুসন্ধান করিয়া বিহিত ব্যবস্থা করা রাজার কর্ত্তব্য। এরূপ ব্যবস্থায় সুনিয়মে রাজ্যশাসন হইত সে পক্ষে সন্দেহ নাই। হস্তপদাদি ছেদন, অঙ্গবিশেষে উত্তপ্ত লৌহ দ্বারা দাগ দেওয়া, অতি কঠোর দণ্ড হইলেও চিরস্মরণীয় হইত,—সেরূপ পাপের পুনর্ঘটনা প্রায় হইত না বলিয়া মিগাস্থিনিশ বিশ্বাস করিতে পারিয়াছিলেন—Their houses and property they generally leave unguarded, theft is of very rare occurrence তাহারা (প্রজারা) ঘর বাড়ী খুলিয়া নিশ্চিন্ত

মনে নিদ্রা যাইত। সৈনিকেরা রাজবৃত্তি দ্বারা পরিপোষিত হইত, শত্রু উপস্থিত হইলেই যুদ্ধার্থ দলে দলে বাহির হইত, হয় হস্তী কতই ছিল! গজযুদ্ধে এদেশের সৈন্য অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিত।

প্রাচ্যাশ্চ দাক্ষিণত্যাশ্চ প্রবরা গজযোধিনঃ।
অঙ্গবঙ্গাশ্চ পুণ্ড্রাশ্চ মগধা তাম্রলিপ্তিকাঃ॥
গজযুদ্ধেষু কুশলাঃ কলিঙ্গ-সহ ভারতঃ।
তৈ ম্লেচ্ছৈঃ প্রেরিতা নাগা নরানশ্বান রথানপি॥
হস্তৈরাক্ষিপ্য মমৃদু পদ্ভিশ্চাপ্যতি মন্তবঃ॥

এই জন্যই গ্রীসরাজ আলেকজন্দর এই দেশ আক্রমণে নিরস্ত হইয়াছিলেন। Thus Alexander, the Macedonian, after conquering all Asia, did not make war upon the Gangaridai, as he did on all others : for when he had arrived with all his troops at the river Ganges and had subdued all the other Indians, he abondoned as hopeless an invasion of the Gangaridai when he learned that they possessed four thousand elephants well trained and equipped.

Mc. Crindall's Ancient India as described by Megasthenes and Arrian Page 34.

রাঢ়কেই গ্রীকেরা গঙ্গরিদাই বলিতেন। প্রধানতঃ এখন যেখানে হুগলী জেলা। রাঢ়বাসিগণের পূর্ব্ব পুরুষেরাই এককালে প্রভূত পরাক্রমশালী ভুবনবিজয়কামী আলেকজন্দরের ভীতি উৎপাদন করিয়াছিলেন। সে রাঢ়ও নাই—গজযুদ্ধ নিপুণ সে রাঢ়-বাসীও নাই, এখন তাঁহাদের বংশধরেরা—

"হস্তী হস্ত সহস্রেণ।"

এই বাক্যের অনুসরণ করিয়া হাতীর হাজার হাত দূরে পলায়ন করে। কালের এমনি প্রাধান্য। হিন্দু রাজাদের আমলে দেশ ও শান্তিরক্ষার জন্য ওভারসিয়ার বা পর্য্যবেক্ষক ছিলেন। তাঁহারা নগরের শান্তি রক্ষা করিতেন—গ্রামগুলির শান্তিরক্ষার ত্রুটি হইতেছে কি না দেখিতেন, আর সৈন্যগণের উপর কর্তৃত্ব করিতেন। রাজা তিনজন সভাসদ লইয়া বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। রাজকর্ম্মচারিগণের মধ্যে ব্যবসাবাণিজ্য করিবার নিষেধ ছিল। কেহ একাধিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পাইত না। মিগাস্থিনিশ যেরূপ লিখিয়া গিয়াছেন তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় না কি যে, তৎকালে মনুর অনুশাসনই প্রবল ছিল? প্রাচীন ব্যবস্থানুসারেই রাজারা রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। বৌদ্ধ রাজগণের শাসনকালে তাহার কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছিল—জীবহিংসায় তাঁহাদের বড়ই আপত্তি ছিল। মিগাস্থিনিশ দেখিয়াছিলেন—হিন্দুরাজগণ বিদেশীয়দিগের বড়ই যত্ন লইতেন, তাঁহাদিগকে বাসস্থান দিতেন, আহারাদির নিয়মপালন জন্য যথেষ্ট সাহায্য করিতেন, তাঁহাদিগকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইবার জন্য লোক সঙ্গে দিতেন, পীড়িত হইলে তাঁহাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতেন, দৈবাৎ কেহ মারা পড়িলে তাঁহার যাহা কিছু থাকিত তাঁহার উত্তরাধিকারীকে পাঠাইয়া দিতেন।

পালরাজাদের তাম্রশাসন পত্রে নিম্নলিখিত কর্ম্মচারিগণের পরিচয় পাওয়া যায়;—রাজামাত্য, বিষয়পতি, ষষ্ঠাধিকৃত, সেনাপতি, ভোগপতি, দণ্ডশক্তিক, দণ্ডপাশিক, চৌরোদ্ধারণিক, দোহসাধ, সাধনিক, দূত, খোল, গমাগমিক, অভিত্বরমাণ, হস্তী অশ্ব গো

মহিষ্য জীবিকাধ্যক্ষ, নৌকাধ্যক্ষ, বলাধ্যক্ষ, তরিক, শৌলকিক, গৌলমিক, তদাযুক্তক, বিনিযুক্তক, জ্যেষ্ঠকায়স্থ, মহামহত্তর, দশক্রমাদি, বিষয়ব্যবহারিক, মহাসামন্তাধিপতি। এই সকল পদের নাম পরিবর্ত্তন জন্য নূতন শব্দের সৃষ্টিও হইত। তাহা বহু পরবর্ত্তী সেনরাজগণের তাম্রশাসনপত্রে পরিবর্ত্তিত আকারে দৃষ্টি-গোচর হয়। এক একটী রাজ্য ভুক্তি বিষয় এবং মণ্ডলে বিভক্ত ছিল। ভুক্তির অন্তর্গত ছিল—বিষয়। বিষয়ের অন্তর্গত ছিল—মণ্ডল, মণ্ডলের অন্তর্গত ছিল গ্রাম।

ধর্ম্ম।—হিন্দুরাজত্বে হিন্দু বই অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর বাস ছিল না, হিন্দু—শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, সৌর, গাণপত্য এই পাঁচ সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। খৃঃ পূঃ অষ্টম শতাব্দী হইতে জৈন-ধর্ম্ম, এবং তাহার পরবর্ত্তী দুইশত বর্ষ, অর্থাৎ ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে রাঢ়দেশের নানাস্থানে প্রায় খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী পর্য্যন্ত বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অখণ্ড প্রতাপপ্রতিপত্তি ছিল। বৌদ্ধ গৌড়েশ্বরেরা হিন্দু ধর্ম্মের অনাদর করিতেন না—তাঁহারা অতি যত্নের সহিত রামায়ণ মহা-ভারত ও পুরাণাদি পাঠ করাইয়া ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিতেন, কোনরূপে হিন্দুর নিগ্রহনির্য্যাতনে প্রবৃত্ত হইতেন না। প্রায় দ্বাদশ শত বর্ষ রাঢ়ে বৌদ্ধ-প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল, তাহার পর শ্রীশঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবে বৌদ্ধ পরাভব ঘটিলে তাহা মন্দীভূত হইয়া ক্রমে এদেশ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায়।

জাতি।—বৌদ্ধ প্রভাবে হিন্দুর জাতিভেদ নষ্ট হয় নাই। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবে যেমন সকল জাতির মধ্যে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছিল, বৌদ্ধদিগের আমলেও সেইরূপ ছিল বুঝিতে পারা যায়—তবে মহাপ্রভুর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে যেমন

বৈষ্ণব নামে একটী পৃথক্ জাতি বা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে বৌদ্ধ প্রভাবকালেও সেইরূপ একটী সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল, এখন এদেশের চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট ও আসামের স্থানে স্থানে তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। রাঢ়ের কুত্রাপি তাহাদের বসবাস নাই। এদেশ হইতে বৌদ্ধ-বিদায় কালে তাহারা তিব্বত চীন জাপান প্রভৃতি স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তত্তদ্দেশে বৌদ্ধ প্রাদুর্ভাব বিস্তার করিয়াছিল। ক্রমে তাহাদের বংশধরেরা সেই সকল দেশবাসিদের সহিত যৌন সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়া নূতন নূতন জাতির সৃষ্টি করিয়াছে। আজি-কালিকার প্রত্নতত্ত্ববিৎগণের সিদ্ধান্ত এই যে বৌদ্ধধর্ম্ম এখনও প্রচ্ছন্নভাবে রাঢ়দেশের ধর্ম্মপূজার ভিতর অবস্থিতি করিতেছে। রাঢ়ের ধর্ম্মঠাকুর যে বুদ্ধদেব রামাই পণ্ডিতের শূন্য পুরাণাদিতে তাহার আভাস পাওয়া যায়। "রাঢ়ে ধর্ম্মপূজা" প্রবন্ধে আমরা ইহার বিস্তৃত আলোচনা করিব।

ব্যায়ামাদি।—এ দেশের প্রাচীন অধিবাসিগণকে যে রাঢ় চুয়াড় বলে তাহা আমরা এই গ্রন্থের প্রথমেই বলিয়াছি। তাহারা সকল গ্রামেই দলবদ্ধ হইয়া বাস করিত। নিয়মিতরূপে প্রতিদিন ঢাল তলোয়ার তীর ধনুক শড়কী বল্লমাদি চালনা অভ্যাস করিত, বাহু-যুদ্ধের জন্য কুস্তি শিখিত, দেশীয় রাজন্যগণের আপৎকালে তাহারাই তাঁহাদের অনুমত্যানুসারে রণস্থলে উপস্থিত হইয়া শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিত। তাহারা অশ্বপৃষ্ঠে গজস্কন্ধে আরোহণ করিয়া শত্রু-সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিত, তাহাতে তাহারা সিদ্ধহস্ত ছিল। আইন-আকবরী পাঠে বুঝিতে পারা যায় যে প্রত্যেক সরকার হইতে নিয়মিত রাজস্বের অতিরিক্ত দীল্লির সম্রাট্ নিয়মিত সংখ্যক পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য পাইতেন। বঙ্গদেশের বাগড়ী

অঞ্চল বহুল নদনদীসমাকুল ছিল বলিয়া জলপথে শত্রু মিত্র সকলেই এ দেশের ভিতর আসা যাওয়া করিত তজ্জন্য এদেশ বাসিরা জলযুদ্ধেও অনিপুণ ছিল না।

হিন্দুরাজত্বের পরিসমাপ্তি।—এতদূরে আসিয়া আমরা রাঢ়ে হিন্দু রাজত্ব সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিলাম। ইহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক রাজ্য ছিল, সেই সকল রাজ্যের অধিপতিগণ যিনি যখন প্রাধান্যলাভে সমর্থ হইতেন, তিনিই তখন অপরের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতেন, কিন্তু তাহার ধারাবাহিক কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বিবরণগুলি আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে পাণ্ডুয়া একটী প্রবল পরাক্রান্ত রাজ্য ছিল। ইহা বুদ্ধদেবের পিতৃব্যপুত্র পাণ্ডুশাক্যের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে হয়। দ্বিতীয় সপ্তগ্রাম, ইহাকে বলিরাজপুত্র সুহ্মের সংস্থাপিত বলিতে পারা যায়। তৃতীয় তাম্রলিপ্ত ইহা কত কালের স্থাপিত তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন, সম্ভবতঃ তাম্রধ্বজ রাজাই ইহার প্রতিষ্ঠাতা। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মহাভারতে তাম্রলিপ্তির উল্লেখ আছে। ভারতযুদ্ধে, দ্রৌপদীর সয়ম্বর সভায়, এবং অশ্বমেধযজ্ঞে তাম্রলিপ্তের রাজা উপস্থিত ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। চতুর্থ মল্লভূমি বা বিষ্ণুপুর রাজবংশ। আদিমল্ল রাজা রঘুনাথ ইহার প্রতিষ্ঠাতা। আরও দুইটী রাজ্য বিশেষ উল্লেখ যোগ্য—ময়নাগড় এবং বীরভূমের ইছাইগড়। এই সকল রাজার অনেকেই স্বাধীনভাবে আপনাপন রাজ্যশাসন করিতেন, যখন যিনি হীনবল হইতেন তখন তিনি বলবানের বশ্যতা স্বীকার করিতেন, কখন কিছু করও দিতেন। পাণ্ডুশাক্য বা তাঁহার বংশধরগণ যখন পাণ্ডুয়ায় রাজত্ব করিতেন তখন এদেশে মুসলমান প্রভাব ছিল না,

এমন কি গৌড় রাজ্যও প্রসার প্রতিপত্তিলাভে সমর্থ হয় নাই। মহাভারতে সুহ্মরাজের উল্লেখ আছে, সেই সময় হইতে দ্বাদশ শতাব্দীতে গৌড়েশ্বর মহারাজা লক্ষ্মণসেনের অধিকার কাল পর্য্যন্ত, কত কাল ব্যাপিয়া কত হিন্দু রাজা সপ্তগ্রাম শাসন করিতেন তাহার পরিচয় পাইবার উপায় নাই। তাম্রলিপ্তে প্রাচীন হিন্দু রাজত্বের বিবরণও বড়ই দুজ্ঞের্য়। তমলুক রাজগণের যে বংশপত্রী প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে গরুড়ধ্বজ, তাম্রধ্বজ, ময়ূরধ্বজ ও হংসধ্বজের পরেই রায়বংশের তালিকা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা নিতান্ত অসম্ভব বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। "ধ্বজ" ধারী রাজার পরে অপর দুই একটী বা ততোধিক রাজবংশ রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করিতে ঐতিহাসিকগণকে বাধ্য হইতে হয়। তাহার কারণ এই যে বিষ্ণুপুরের আদিমল্লের রাজত্বের আরম্ভ খৃঃ ৭১৫ অব্দে—মল্ল বংশীয় রাজাদের বংশ-তালিকায় দেখা যায় তাঁহাদের ৫৮ জন বিষ্ণুপুর শাসন করিয়াছিলেন। তমোলুক রাজবংশেও ধ্বজধারী চারিজন রাজাকে বাদ দিলে ৫৭ জনকে আজি পর্য্যন্ত তমোলুকে রাজত্ব করিতে দেখা যায়। তাম্রধ্বজ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকালে বিদ্যমান থাকিলে তদবধি আজি পর্য্যন্ত প্রায় ৪ হাজার বৎসর মধ্যে ৫৭ জনের রাজত্ব করা কেমন করিয়া সম্ভবপর হয়। বিষ্ণুপুরের রাজারা কি এতই অল্পজীবী ছিলেন যে আদিমল্লের খৃঃ ৭১৫ অব্দ হইতে তাঁহাদের ৫৭ পুরুষ-চৈতন্য সিংহ ১১২৩ মল্লাব্দ বা খ্রীঃ ১৮৩৮ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব ১১২৩ বৎসর রাজত্ব করিলেন, আর তমলুকের ৫৭ জন রাজা দুই একশত বর্ষ কম চারি হাজার বৎসর রাজত্ব করিলেন। আদিমল্ল হইতে ৫৯ পুরুষ সকলে মিলিয়া ১১৩৪ বৎসর মাত্র রাজত্ব

করিয়াছেন, এতদুভয় রাজবংশেই প্রায় সমসংখ্যক রাজা (দুই এক পুরুষের ন্যূনাধিক্য থাকিলেও) ৩।৪ হাজার বৎসর রাজ্যকালের বিভিন্নতা বড় কম নহে। এরূপ স্থলে কেমন করিয়া কল্পনায় আনিতে পারা যায় যে তমলুক রাজবংশের ৫৭ পুরুষে প্রায় চারি হাজার বৎসর রাজত্ব করিয়াছেন আর বিষ্ণুপুর রাজবংশের ৫৭ জন রাজার ১১২৩ বৎসর রাজ্যশাসন করিয়াছেন। সাধারণতঃ প্রত্ন-তাত্ত্বিকগণ এক এক পুরুষে ২০ হইতে ৩০ বৎসর ধরিয়া থাকেন। কিন্তু প্রায়শঃ ২৫ বৎসররই গণনায় পাওয়া যায় তাহা হইলে তমলুক রাজবংশ ৫৭ পুরুষে কখনই ২৫ বৎসরের বেশী কাল রাজত্ব করিতে পারেন না। যদি ধ্বজযুক্ত নামের চারিজন রাজাকে এক বংশীয় বলিয়া গণ্য করা যায় তাহা হইলেও ৬১ পুরুষে ১৫২৫ বৎসরের বেশী হয় না অর্থাৎ গরুড়ধ্বজের রাজ্যারম্ভ কাল খৃষ্টীয় শকের ৩৮৯ বৎসরে গিয়া দাঁড়ায়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ-ঘটনা খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে হইয়াছিল একথা হিন্দুর মুখে শোভা পায় না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও তাহা বলেন নাই। অতএব যখন তাম্রধ্বজাদির নাম মহাভারতে আছে তখন তাঁহারা ভারত-যুদ্ধের সমসাময়িক সে পক্ষে আর সন্দেহ মাত্র থাকিতে পারে না। যদি একান্তই তাঁহাদের পরেই ময়ূরবংশের রাজ্যাধিকার কাল হয় তাহা হইলে মধ্যে কোন একটী দুইটী বা ততোধিক রাজবংশ যে হাজার দুই বৎসর কাল তমলুকে রাজত্ব না করিয়াছিলেন একথা কে না বলিবে। তবে যদি কেহ বলিতে চাহেন যে ওসকল যুক্তি তর্ক কিছুই নহে - বিষ্ণু-পুর রাজবংশের ৫৭ পুরুষে ১১২৩ বৎসর রাজত্ব করিলেও তমলুকের ৫৭জন রাজায় ন্যূনাধিক চারি হাজার বৎসর রাজ্য করাই ঠিক, এরূপ কথা শুনিয়া তাহাতে সায় দিবার কতগুলি ব্যক্তি আছেন

তাঁহাদের সংখ্যা গণনা করিলে ভোটের সংখ্যায় মত স্থির হইতে পারে।

ময়নাগড়ের রাজা লাউসেনকেও আমরা খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে আবির্ভূত বলিয়া মনে করি, কেননা তিনি ধর্ম্মপূজা প্রবর্ত্তক রামাই পণ্ডিতের সমসাময়িক, এবং রামাই পণ্ডিত যে বিষ্ণুপুর রাজ্য স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে বিষ্ণুপুরের অদূরবর্ত্তী দ্বারকাপুরী আধুনিক দোয়ারকা নামক দারকেশ্বর তীরবর্ত্তী গ্রামে অবস্থিতি করিতেন, তাহা রাঢ়ে ধর্ম্মপূজা প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিব। লাউসেনের সমসাময়িক বীরভূমের গোপরাজ ইছাই ঘোষ। বর্দ্ধমান সহর তাহারও পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে—অর্থাৎ খৃষ্টীয় শকের পূর্ব্ব-বর্ত্তী ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত, ইহা তীর্থঙ্কর মহাবীরের জীবনী আলোচনা করিলেই যে বুঝিতে পারা যায় তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। পূর্ব্বকালে বর্দ্ধমান যে এক রাজা রাজত্ব করিতেন তাহা মাণিক গাঙ্গুলী এবং ঘনরাম চক্রবর্ত্তীর ধর্ম্মমঙ্গলে দেখিতে পাওয়া যায়। ময়নাগড়ের রাজা লাউসেন গৌড় হইতে প্রত্যাগমন কালে বর্দ্ধমানের রাজা কালিদাসের দুই কন্যা সুরাগা ও বিমলাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। যথা—

এথা রাজা কালিদাস অধিবাস করে।
গৌর্য্যাদি করিয়া পূজা জ্ঞান অনুসারে॥

মাণিক গাঙ্গুলী ১৩৩ পৃঃ।

সুরাগা বিমলা সঙ্গে, বাসর বঞ্চিয়া রঙ্গে
লাউসেন উঠিয়া প্রভাতে।

ঐ ঐ

পরম সন্তোষে সেন আসেন নিবাস।
বর্দ্ধমানে শুনিল ভূপতি কালিদাস॥

*　　*　　*

তবে রাজা আনন্দিত বেদের বিধানে।
বিধুমুখী বিমলা বিবাহ দিল সেনে॥

ঘনরাম ১৮৯ পৃঃ।

লাউসেনের বিবাহিতা রাজকন্যাগণের উভয় কাব্যে একতা না থাকিলেও বর্দ্ধমানে কালিদাসের অস্তিত্বে সন্দেহ করা চলে না। কবি কল্পনার বশে চলেন তাই তাঁহারা নায়ক নায়িকার নাম আপনাদের পছন্দ মত রাখিয়া থাকেন, কিন্তু ঐতিহাসিক সত্যের দিকেও তাঁহাদিগকে দৃষ্টি রাখিতে হয় বলিয়া কাব্যের নায়ককে ভিন্ন নাম দিতে পারেন না, অন্ততঃ প্রাচীন কবিদের যেন ইহাই প্রচলিত পদ্ধতি ছিল। ফলে হিন্দু রাজত্বে রাঢ়দেশ যে কত ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল, এবং তত্তৎ রাজ্যের রাজারা যে নিয়মে রাজ্য শাসন করিতেন যথাসাধ্য তাহা লিখিত হইল।

পাঠান-রাজত্বে রাঢ়।

হিন্দুরাজত্বে রাঢ়দেশের যে যে স্থানে দেশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেন, পূর্ব্ববর্ত্তী পরিচ্ছেদে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। যেদিন জন ষ্টুয়ার্ট জন মার্শমান প্রমুখ পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকেরা মুসলমান পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের পন্থা ও পরামর্শানুসারে এ দেশের ইতিহাস সঙ্কলন করিয়া গিয়াছিলেন এখন আর সেকাল নাই, ইতিহাস সম্বন্ধে বঙ্গবাসীর এখন চক্ষু ফুটিয়াছে, জ্ঞানগবেষণা বৃদ্ধি পাইয়াছে, আপনাদের তত্ত্ব আপনারা অনুসন্ধান করিতেছে, সে বিষয়ে আর পূর্ব্বের ন্যায় পরাঙ্মুখ নহে। এখন জানিতে পারা গিয়াছে—কিজন্য অশীতিপর বৃদ্ধ বাণপ্রস্থী গৌড়াবনিপতি লক্ষ্মণসেন সপ্তদশ সংখ্যক অশ্বারোহী দর্শনে ভীত হইয়া পুরুষোত্তম তীর্থে পলায়ন করিয়াছিলেন। তিনি পিতার ন্যায় বার্দ্ধক্যে রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণে সাধারণ বাণপ্রস্থধর্ম্মীর ন্যায় বনবাস আশ্রয় না করিয়া গঙ্গাবাসী হইয়াছিলেন, তৎকালে তাঁহার হস্তে শাসনদণ্ড থাকিলে নিশ্চিতই রক্ষীপুরুষ এস্থলে তাঁহার সঙ্গে থাকিত,—কিন্তু তাহাও ছিল না। সুতরাং যবন-সৈনিকের হস্তে নিগৃহীত হইলে তাঁহার ধর্ম্ম-নাশের সম্ভাবনা বোধে তাঁহার তীর্থান্তরে প্রস্থান বই অন্য উপায় ছিল না। তৎকালে যদি তাঁহার হস্তে বঙ্গের শাসনভার থাকিত তাহা হইলে নিশ্চিতই নবদ্বীপ হইতে রাজ্যরক্ষার জন্য রাজধানী যাত্রা করিতেন। যাঁহার অপ্রতিহত প্রভাবে এক কালে কাশী কোশল অবন্তী উজ্জয়িনী কাঞ্চী কাবেরী কম্পিত ছিল তিনি যে শত্রুর সম্মুখীন না হইয়া ভীরুর ন্যায় তীর্থান্তরে প্রস্থান করিবেন ইহা

সম্ভাবনার নিতান্ত অতিরিক্ত। আর তাঁহার পলায়ন মাত্র সেই দিনেই যে সমস্ত বঙ্গদেশ বখ্‌তিয়ার খিলিজীর পদানত হইয়াছিল তাহাও নহে। পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে যে তাহার বহু পরবর্ত্তী কাল পর্য্যন্ত সপ্তগ্রাম, পাণ্ডুয়া, মঙ্গলকোট, বিষ্ণুপুর হিন্দুর রাজ্যে হিন্দুরাজগণ আপনাদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন। সমগ্র বঙ্গদেশ আয়ত্তাধীন করিতে মুসলমানদের তিন চারি শত বৎসর লাগিয়াছিল। হিন্দুরাজার বীরত্ব পরিচয় মঙ্গলকোটে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, সেখানকার রাজা বিক্রমজিৎ সতেরজন গাজির আক্রমণ ব্যর্থ করিয়াছিলেন. সুকৃতী স্বদেশ-তত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণকে * ভগবান দীর্ঘজীবী করুন আমাদের ইতিহাসের অভাব আর কতকাল থাকিবে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, লক্ষ্মণসেনের রাজত্ব কালে তাঁহার অভীষ্টদেব মুরারি শর্ম্মা সুহ্মদেশে রাজত্ব করিতেন। সম্ভবতঃ সপ্তগ্রামই তাঁহার রাজানী ছিল।

তস্মিন্ সেনান্বয়নপতিনা দেবরাজ্যাভিষিক্তো।
দেবঃ সুহ্মাদ বসতি কমলাকেলীকারো মুরারিঃ॥
পাণৌ লীলাকমলসুহৃদ্ সৎসমীপে বহত্যো।
লক্ষ্মীশঙ্কাং প্রকৃতিসতগাঃ কুর্ব্বন্তে বাররামাঃ॥

ধোয়ীকবির পবনদূত।

সেখানে সেনবংশীয় নরপতির ইষ্টদেবতা মুরারি দেবরাজ্যে অভিষিক্ত—তিনি সুহ্মদেশেই থাকেন। সেখানকার বাররামাগণের

হস্তে সকল সময়েই লীলাকমল বিরাজ করে। তাহাদিগকে দেখিলেই নারায়ণের লক্ষ্মী বলিয়া ভ্রম হয়।

ইহা দ্বাদশ শতাব্দীর শেষের কথা—কারণ সেই সময়েই লক্ষ্মণ সেনের রাজ্যাধিকার শেষ হয়। তাহার পর প্রায় একশত বর্ষ কাল সপ্তগ্রাম আপন স্বাধীনতা রক্ষায় সমর্থ ছিল। যেদিন জাফর খাঁ বিপুল বিক্রমে খৃঃ ১২৯৮ অব্দে মুসলমান সৈন্য লইয়া সপ্তগ্রাম আক্রমণ করিলেন, সেদিন সপ্তগ্রামবাসীর কি দুর্দ্দিন—যবন সেনার অত্যাচারভয়ে ভীত হইয়া হিন্দু জৈন ও বৌদ্ধ পরিবারগণ আপনাদের ধর্ম্ম কূল মান মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য হাহাকার করিতে লাগিল—হিন্দুরাজা দুর্ব্বল—শত্রুর সহিত সম্মুখ যুদ্ধে দাঁড়াইতে না পারিয়া প্রাণ হারাইলেন। তাঁহার মস্তক মুসলমানের ভল্লে বিদ্ধ হইল—প্রজা কাহার অশ্রয় লয়। যবনসেনা তাহাদের দুর্গতির একশেষ করিয়া সপ্তগ্রামের হিন্দুদুর্গে আপনাদের বিজয় নিশান উড়াইয়া সপ্তগ্রাম দখল করিল। সপ্তগ্রামের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইল। জাফর খাঁ তুরস্ক বংশ সম্ভূত, তাঁহার প্রকৃত নাম—বহরম ইৎগিন—হুমায়ুন জাফর খাঁ উপাধি মাত্র। তিনি পনর বৎসর কাল—১৩১৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সপ্তগ্রামে শাসন কর্ত্তৃত্ব করিয়াছিলেন।

জাফর খাঁর সমাধিগাত্রে ছিদ্রমধ্যে এক লৌহকুঠার সংলগ্ন আছে, তাহা যতই নাড়াচাড়া কর নড়িতে থাকে, কিন্তু স্থানভ্রষ্ট হয় না—এজন্য লোকে বলে "দফরা গাজির কুড়ুল—নড়েচড়ে পড়ে না"। পথিক মাত্রই তাহা না নড়িয়া ছাড়িয়া যায় না। প্রবাদ এইরূপ জাফর খাঁই দফরা গাজি—কিন্তু যে দফর খাঁ গাজির স্তোত্র—

সুরধুনী মুণিকন্যে তারয়েৎ পুণ্যবন্তং।
স তরতি নিজপুণ্যে স্তত্র কিন্তে মহত্ত্বং॥
যদি চ গতিবিহীনং তারয়েঃ পাপিনং মাং।
তদপি চ তন্মহত্ত্বং তন্মহত্ত্বং মহত্ত্বং॥

এই কবিতা যাঁহার রচিত তিনি যে হিন্দুদ্বেষী হইবেন একথা স্বপ্নেও আসে না, তবে শুনা যায় যে সপ্তগ্রাম বিজয়োপলক্ষে বহুহিন্দুর প্রাণ নাশের পর স্বয়ং গঙ্গামাহাত্ম্য প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি অতীব গঙ্গা-ভক্ত হইয়াছিলেন। সে সম্বন্ধে একটী গল্পও শুনিতে পাওয়া যায়—এক উন্মত্ত বৃষ শৃঙ্গদ্বারা গঙ্গাগর্ভের মৃত্তিকা উৎক্ষিপ্ত করিতেছিল এমন সময় বৃষপালক তাহার সম্মুখস্থ হইলে সে শৃঙ্গদ্বারা তাহাকে আঘাত করিবামাত্র তাহার প্রাণবিয়োগ হয়, তাহার অপমৃত্যু ঘটলেও বৃষ-শৃঙ্গে গঙ্গামৃত্তিকা স্পর্শে সে স্বর্গে গমন করিল। জাফর খাঁ স্বচক্ষে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন. তদবধি গঙ্গার প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি জন্মে। ইহা জাফর খাঁর পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত তপস্যার ফল। নতুবা গঙ্গাবক্ষে কত লোকের অপমৃত্যু ঘটিতেছে তাহাদের কি গতি হইতেছে, কয়জনই বা তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেছে। সার হাণ্টারাদি প্রত্নতাত্ত্বিক সাহেবেরা বলেন জাফর খাঁ হিন্দুরাজা ভূদিয়ার সহিত যুদ্ধে নিহত হয়েন।

অতঃপর দিল্লীর সিংহাসনে গিয়াসউদ্দীন তোগলক স্থান প্রাপ্ত হয়েন। তিনি বঙ্গদেশকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন—পশ্চিম ভাগের রাজধানী সপ্তগ্রাম, উত্তর ভাগের রাজধানী গৌড় এবং পূর্ব্বভাগের রাজধানী হইয়াছিল সুবর্ণগ্রাম। এই সময়ে ইজুদ্দিন মাহিয়া আজিম উলমুলুক নামে এক ব্যক্তি খৃঃ ১৩২৩ অব্দে সপ্তগ্রামের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হয়েন। তাঁহারই অধিকার কালে

খৃঃ ১৩২৮ অব্দে এখানে একটী টাকশাল প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি খৃঃ ১৩৩৯ অব্দ পর্য্যন্ত সপ্তগ্রামের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ইহার পরবৎসর খৃঃ ১৩৪০ অব্দে আফ্রিকাবাসী ইবন্ বটুটা নামক এক-জন পর্য্যাটক এদেশ পর্য্যটনে আসিয়া লিখিয়া গিয়াছেন—"আমরা মালদ্বীপপুঞ্জের মাহাই দ্বীপ হইতে ৪৩ দিন সমুদ্রবক্ষে অতিবাহিত করিয়া বঙ্গদেশে আসিয়া উপস্থিত হই। এই দেশ অতি বিস্তীর্ণ। এখানকার সকল পণ্যই সুলভ, কিন্তু বায়ুমণ্ডল সর্ব্বদা তমসাচ্ছন্ন—খোরাসানবাসিগণ ইহাকে মঙ্গলময় নরক বলিয়া থাকে।"

"বঙ্গদেশে এক রৌপ্য দিনারে (একটাকা চারি আনায়) দিল্লীর এক রিথলের (প্রায় সাত পোয়া) ওজনের ২৫ রিথল (এক মণ তিনসের তিন পোয়া) চাউল বিকাইতে দেখিলাম। একটী রৌপ্য দিনার প্রায় দশ পয়সা। আমাদের দেশের রৌপ্য দিরাম ও বঙ্গ-দেশের দিরামের মূল্য সমান। দিল্লীর এক রিথল "মাঘরিবের" * কুড়ি রিথলের তুল্য। আমি বঙ্গদেশবাসীদিগকে বলিতে শুনিয়াছি যে ইহা দুর্ম্মূল্য—পূর্ব্বে ইহা অপেক্ষা সুলভ ছিল।"

"মহম্মদ উল মসমদী উল মাঘরাবি নামে এক মহাজন পূর্ব্বে বঙ্গদেশে বাস করিতেন, পরে তিনি দিল্লীনগরে আমারই আশ্রয়ে থাকিয়া দেহত্যাগ করেন, তিনি বলিয়াছিলেন—তিনি, তাঁহার পত্নী ও এক-জন ভৃত্যের খোরাকি খরচ বৎসরে আট দিরাম মাত্র লাগিত। তিনি আট দিরামে দিল্লীর ৮০ রিথল ধান্য ক্রয় করিতেন তাহাতে ৫০ রিথল চাউল প্রস্তুত হইত। আমি আপনি তিন রৌপ্য দিনারে একটী পয়স্বিনী গাভী বিকাইতে দেখিয়াছি। এখানকার বলদ ঠিক

* উত্তর পশ্চিম আফ্রিকায়।

মহিষের ন্যায় বলশালী। হাঁস মুরগী প্রভৃতি পক্ষী এক দিরামে আটটী এবং পায়রা ১৫টী বিকাইত। একটী মোটাসোটা ভেড়া দুই দিরামে, এক রিথল শর্করা তিন চারি দিরামে এবং এক রিথল গোলাপজল আট দিরামে, এক রিথল ঘৃত চারি দিরামে এবং এক রিথল সার্ষপ তৈল দুই দিরামে কিনিতে পাইয়াছিলাম।"

"সূক্ষ্মকার্পাসসূত্রে প্রস্তুত অতি উত্তম ত্রিশ হাত বস্ত্র দুই দিরামে আমার চক্ষের উপর বিকাইয়াছে। সুন্দরী দাসীর মূল্য এক স্বর্ণ দিরাম (মাঘরিবের সাড়ে আট স্বর্ণ দিরামের তুল্য)। আমি ঐ মূল্যে মাসুয়া নাম্নী এক পরম রূপলাবণ্যবতী বালিকা ক্রয় করিয়াছিলাম। আমার একজন সঙ্গী লুলু নাম্নী একটী সুরূপা কন্যা দুই স্বর্ণ দিরামে ক্রয় করিয়াছিলেন।"

"আমরা সর্ব্বাগ্রে সাতগাঁ দর্শন করি—বঙ্গ সাগরের উপকূলে ইহা একটী প্রকাণ্ড এবং প্রসিদ্ধ নগর। ইহার নিকটেই গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম, অনেক হিন্দু তথায় তীর্থস্নান করিয়া থাকে। গঙ্গা-বক্ষে বহুতর সজ্জিত সৈন্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতেই দেশবাসীরা লক্ষ্ণৌতিবাসিদের সহিত যুদ্ধ করিয়া থাকে। এই সময়ে বাঙ্গালার সিংহাসনে সুলতান ফকরুদ্দীন রাজত্ব করিতেন। তাঁহার বেশ সুযশ সুখ্যাতি ছিল, বিদেশীয় বিশেষতঃ ফকির ও সুফীগণকে সস্নেহ দৃষ্টিতে দেখিতেন। দেশের শাসনভার সুলতান গিয়াসুদ্দীন বলবনের পুত্র সুলতান নাসিরুদ্দীনের হাতে ছিল। ইনি আপন পুত্র মুইজামুদ্দীনকে দিল্লীর সিংহাসনে স্থাপিত করেন, কিন্তু পশ্চাৎ তাঁহারই বিরুদ্ধে সমর সজ্জা করিয়াছিলেন। পরে পিতা পুত্রে গঙ্গাতীরে দেখা সাক্ষাৎ হইলে সকল বিরোধ মিটিয়া যায়।

পিতা বঙ্গদেশে ফিরিয়া যত দিন জীবিত ছিলেন ততদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন তাঁহার পরলোক গমনে তৎপুত্র সামসুদ্দীন শাসন ভার গ্রহণ করেন।”

“ফকরুদ্দীন খাঁ ফকিরদিগকে বড় শ্রদ্ধাভক্তি ও বিশ্বাস করিতেন। এই সুযোগে সইদা (প্রেম-পাগলা) নামে এক ফকির সাতগাঁর শাসন কর্ত্তা হয়েন। সুলতান বিদ্রোহ দমন জন্য স্থানান্তর গমন করিলে সইদা তাঁহার একমাত্র পুত্রকে নষ্ট করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে। সুলতান তাহা অবগত হইয়া রাজধানীতে উপস্থিত হয়েন, সইদা পলায়ন করে, পথিমধ্যে ধৃত ও বিনষ্ট হয়।

“আমি সাতগাঁয়ে পঁহুছিয়া সেখানকার সুলতানকে দেখিতে পাই নাই, দেখা করিবার চেষ্টাও করি নাই, কারণ এই সময়ে তিনি দিল্লীর সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। সুলতানের সহিত সাক্ষাতের ভাবীফলে আশঙ্কিত হইয়া আমি তাড়াতাড়ি সাতগাঁ ত্যাগ করিয়া কামরূপ যাত্রা করিলাম।”

১৩৪৫ খৃঃ অব্দে সমসুদ্দীন বাঙ্গালার সমস্ত অধিকার করিয়া স্বয়ং স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। তিনি সুবর্ণগ্রাম হইতে গৌড়ের নিকটবর্ত্তী পাণ্ডুয়ায় রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। দিল্লীর সম্রাট সেই সংবাদ পাইয়া গৌড় নগরে আসিয়া তাহা অধিকার করেন। সমসুদ্দীন একডালা দুর্গে আশ্রয় লইলেন। সম্রাট ফিরোজ সাহের সৈন্য, বর্ষার জলে চারিদিক মগ্ন হইয়া যাওয়ায়, খাবার পাইল না। কাজেই ফিরোজকে দিল্লীতে ফিরিতে হইল। সমসুদ্দীনের মৃত্যুর পর তৎপুত্র সেকেন্দর সাহ পিতৃ সিংহাসনে অধিরূঢ় হয়েন। ফিরোজ সাহ তাহা শুনিয়া পুনরায় তাঁহার

আশ্রয় লইলেন, এবারেও সম্রাট বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইলেন। সেকন্দর সাহের দুইটী কীর্ত্তি অদ্যাপি তাঁহার নাম রক্ষা করিয়াছে। পাণ্ডুয়ার প্রকাণ্ড আদিনা মসজিদ এবং ভূমি মাপিবার গজ, যাহা সেকেন্দরী গজ নামে প্রসিদ্ধ। আদিনা মসজিদ ১৩৬১ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র গয়সুদ্দীন সিংহাসন অধিকার করেন। ১৩৭০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র, তৎপরে তাঁহার পৌত্র রাজ্যাধিকার করিয়া তাহা রক্ষা করিতে পারিলেন না। বিঠুরিয়ার হিন্দু জমিদার গণেশ তাঁহার রাজ্য হস্তগত করিয়া কিয়দ্দিন সুখে রাজ্য পালন করেন। এই সময়ে হিন্দু মুসলমান সকলেই সুখে স্বচ্ছন্দতায় কালযাপন করিতে পারিয়াছিল। পাণ্ডুয়া নগরে রাজা গণেশ অনেকগুলি হিন্দু দেবালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র যদু * জেলালুদ্দীন নাম গ্রহণে মুসলমান ধর্ম্ম আশ্রয় করেন। তিনি পাণ্ডুয়া হইতে গৌড়ের রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়া তথায় বহু সংখ্যক বিচিত্র হর্ম্ম্যাবলী নির্ম্মাণ, জলাশয় খনন, প্রান্থনিবাস স্থাপন দ্বারা রাজধানীর শোভাসমৃদ্ধি বর্দ্ধিত করেন। প্রজাগণ তাঁহার ন্যায়বিচারে সুখী ছিল। তিনি খৃঃ ১৪০৯ অব্দে পরলোক বাস করিলে তাঁহার পুত্র আহম্মদ সা পিতৃ সিংহাসন অধিকার করিলেন বটে কিন্তু পিতা পিতামহাদির ন্যায় বলবীর্য্যশালী না হওয়া প্রযুক্ত অতি কষ্টে রাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন। খৃঃ ১৪২৬ অব্দে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তিতে তাহাকে দিয়াই তাঁহার পিতামহের হিন্দুরাজত্ব লুপ্ত হয়। তাঁহার পুত্র কন্যাদি ছিল না। এজন্য

---

* ষ্টুয়াট বলেন, চৈতমল।

মুসলমান ওমরাহগণ সুলতান নসিরদ্দিন সাহকে বঙ্গের সিংহাসনে সংস্থাপিত করেন। তিনি ৩১ বৎসরকাল রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজত্বকালে তবরিয়ৎ খাঁ নামক এক ব্যক্তি ১৪৫৮ খৃঃ অব্দে সপ্তগ্রামের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি একটী মসজিদ নির্ম্মাণ করেন। তৎসংলগ্ন শিলালিপি এখনও ত্রিশবিঘা ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী জামালুদ্দিনের সমাধিপাশে পতিত আছে। তৎপূর্ব্ব বৎসরে ইকরার খাঁ নামক এক ব্যক্তিকে সপ্তগ্রামের শাসনকর্ত্তৃত্ব করিতে দেখা যায়। তিনি নসিরদ্দিনের পুত্র বুরবক সাহের রাজত্বকালে হিজিরা ৮৬০ অব্দে সপ্তগ্রামে এক মসজিদ নিশ্মাণ করাইয়াছিলেন।

সপ্তগ্রামে আবিষ্কৃত আর একখানি শিলালিপিতে জানা যায় খৃঃ ১৪৮৭ অব্দে মজলিশ নূর নামে এক ব্যক্তি সপ্তগ্রামের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। এই সময়ে হাবসী ক্রীতদাসকে বিশ্বাস করিয়া তাহাদের হস্তে সুলতান বুরবক সাহ নিধনপ্রাপ্ত হয়েন। সুলতান সেকেন্দর সাহ এবং ফতে সাহেরও সেই দশা ঘটে। এই সময়ে মুসলমান নবাবগণের অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়া উঠে, তাঁহাদের ক্ষমতা গৌড়ের দুর্গপ্রাকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। খৃঃ ১৪৯৭ অব্দে হোসেন সাহ বঙ্গদেশে একাধিপত্য লাভ করেন। হোসেন সাহের রাজ্যকালের তিনটী শিলালিপি সপ্তগ্রামে পাওয়া গিয়াছে।

সাতগাঁয়ে গঙ্গা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থলে যে একটী প্রাচীন ভগ্নসেতু আছে তাহার গাত্রসংলগ্ন একখানি শিলালিপি জাফরখাঁর মসজিদে আছে, তাহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে ৯১১ হিজিরায় মসনদ খাঁ নামক এক ব্যক্তি সপ্তগ্রামের শাসনকর্ত্তা ছিলেন—তিনিই এই সেতু নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন (খৃঃ ১৫০৬ অব্দে) হোসেন সাহের সময়ে অনেক বঙ্গবাসী বড় বড় রাজপদ প্রাপ্ত হয়েন। তিনি বঙ্গীয়

গ্রন্থকারগণের উৎসাহদাতা ছিলেন। তাঁহারই রাজত্বকালে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারার্থ সন্ন্যাস গ্রহণে গৃহত্যাগ করিয়া গৌড় ও উড়িষ্যার নানা স্থান পরিভ্রমণ করেন। তাঁহার সঙ্কীর্ত্তন শুনিয়া হোসেন সাহের দুইজন প্রধান রাজকর্ম্মচারী রূপ ও সনাতন সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৃন্দাবনে বাস করিয়াছিলেন।

খৃঃ ১৫১৩ অব্দে বীরভূম সরটবাসী আলাউদ্দিনের পুত্র রকনুদ্দিন সপ্তগ্রামের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। খৃঃ ১৫২৩ অব্দে হোসেন সাহের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র নাসরৎ সাহ বঙ্গদেশের শাসন কর্ত্তা হইয়াছিলেন।

খৃঃ ১৫২৬ অব্দে বাবর সাহের পুত্র হুমায়ুন দীল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময় হইতে রাঢ়দেশ মোগল শাসনাধীন বলিতে হইবে। পাঠান রাজত্বে যে সকল হিন্দুরাজা রাঢ়দেশে রাজ্য স্থাপনকরিয়াছিলেন অতঃপর তাঁহাদের বিষয় বলা হইতেছে।

মেদিনীপুর।—ইহার অপর নাম ভঞ্জভুম। ভঞ্জভূমের রাজপরিচয় পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। কি সূত্রে যে ভঞ্জভূমের নাম মেদিনীপুর হইয়াছে তাহা জানা যায় না। বর্দ্ধমান জেলার নীলপুরের একজন সৎগোপ লক্ষ্মণ সিং ও শ্যাম সিং নামক দুইটী পুত্রকে সঙ্গে লইয়া ভঞ্জভূমে আসিয়া সেখানকার রাজা সুরত সিংহের পুরোহিতের বাড়ীতে জ্যেষ্ঠপুত্র লক্ষ্মণকে গরুর রাখালী করিবার জন্য রাখিয়া দেয়। এক দিন লক্ষ্মণ বনে গরু চরাইতে গিয়া বেলা দ্বিতীয় পেহর পর্য্যন্ত ফিরিল না দেখিয়া রাজার পুরোহিতব্রাহ্মণ বালক লক্ষ্মণের অনুসন্ধানে বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—সে একটী বৃক্ষতলে শয়ন করিয়া ঘুমাইতেছে,

তাহার মুখে রোদ লাগিতে না পায় এজন্য একটী প্রকাণ্ড কৃষ্ণসর্প লক্ষ্মণের মুখের উপর ফণা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে, গরুগুলি আশেপাশে চরিয়া বেড়াইতেছে। ব্রাহ্মণ তাহা দেখিয়া ভাবিলেন—লক্ষ্মণ সাধারণ লোক নহে, কালে রাজদণ্ড পরিচালনক্ষম হইবে। সেদিন হইতে ব্রাহ্মণ লক্ষ্মণকে গোরু চরাইতে দিলেন না। লক্ষ্মণ বিলক্ষণ সাহসী ও বলশালী ছিলেন, রাজা সুরত সিংহ লক্ষ্মণকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন, লক্ষ্মণ অচিরকাল মধ্যে স্বীয় কার্য্যদক্ষতাগুণে সুরত সিংহের দেওয়ান ও সেনাপতিপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাহার পর তিনি কিরূপে উড়িষ্যার রাজা মুকুন্দ দেবকে ও মুসলমান সৈন্যের আক্রমণ হইতে তাঁহার রাজ্য রক্ষা করিয়া পুরস্কার-স্বরূপ মেদিনীপুর রাজ্যলাভ করেন এবং প্রভুহত্যা দ্বারা তাঁহার রাজ্য কাড়িয়া লয়েন তাহা ভঞ্জভূম বিবরণে লিখিত হইয়াছে। বিশ্বাসহত্যার পাপের প্রতিফল-স্বরূপ তাঁহার অনুজ শ্যামসিংহ সন ১০৬৮ সালে বা খৃঃ ১৬৬১ অব্দে তাঁহাকে দূরীকৃত করিয়া স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইয়াছিলেন। লক্ষ্মণ সিংহের জীবদ্দশাতেই তাঁহার পুত্র পুরুষোত্তম সিংহ এবং পৌত্র সংগ্রাম সিংহ পরলোক প্রাপ্ত হয়েন। সংগ্রাম সিংহের তিন পুত্র ছিল—ছটুরায়, রঘুনাথ রায় এবং দুর্গদাস রায়। তাঁহারা শ্যামসিংহ দ্বারা আপনাদের প্রপিতামহের অবমাননার প্রতিশোধ লইবার জন্য তাঁহাকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ছটু খৃঃ ১৬৬৮ অব্দে তাঁহার রাজ্যাধিকার কাড়িয়া লয়েন। হুদ্দা দোগেছিয়ায় একটী বৃহৎ জলাশয় অদ্যাপি তাঁহার নাম রক্ষা করিতেছে। খৃঃ ১৬৭০ অব্দে ছটু দেহত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার অনুজ রঘুনাথ রায়ের পুত্র বীর

সিংহ এবং ভ্রাতা দুর্গাদাসের পুত্র যোগী মহাপাত্রকে * লইয়া রাজ-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

খ্রীঃ ১৬৯৩ অব্দে রাজা রঘুনাথ রায়ের পুত্র রাজা রামসিংহ রাজ্যাধিকার গ্রহণ করেন। রাজ্যশাসনে তাঁহার বিলক্ষণ সুযশ সুখ্যাতি জন্মিয়াছিল। তিনি কর্ণগড় এবং আবাস-গড় নামে দুইটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। কর্ণগড় মেদিনীপুর সহরের তিন ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত, এখন ধ্বংসাবশিষ্ট—ইহা দুইভাগে বিভক্ত। সম্মুখ ভাগে সেনানিবাস ও বাজার ছিল। রাজবংশের প্রতিষ্ঠিত দণ্ডেশ্বর শিব এবং মহামায়া দেবীর মন্দির এখনও এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুইটী মন্দির প্রস্তরে নির্ম্মিত—মহামায়ার মন্দির মধ্যে সাধকের বসিবার জন্য পঞ্চমুণ্ডের † আসন আছে। বরদা পরগণার যদুপুর নিবাসী রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য এই পঞ্চমুণ্ডের আসনে বসিয়া তন্ত্রশাস্ত্র মতে যোগচর্য্যা দ্বারা সিদ্ধিলাভ করেন। দেবী ভগবতী তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে একছড়া রুদ্রাক্ষ মালা দিয়াছিলেন, এবং তাঁহারই আজ্ঞা পাইয়া তিনি শিবায়ণ বা শিব-সংকীর্ত্তন রচনা করেন। উহাতে শিবদুর্গার মহিমা অতি সুন্দর ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। শিবায়ণ বঙ্গ-ভাষার মহকাব্য বলিয়া পরিগণিত। অদ্যাপি মেদিনীপুর হুগলী ও বর্দ্ধমান জেলার

---

* রঘুনাথ রায়ের সহোদরের পুত্র কি হেতু মহাপাত্র হইল খোলসা লেখা না থাকিলেও মহাপাত্র বলিতে প্রধান মন্ত্রীকে বুঝায়, যোগী প্রধান মন্ত্রীর কাজ করিতেন বলিয়াই মহাপাত্র হইয়া থাকিবেন।

† পঞ্চমুণ্ড—বানর, শৃগাল, পেচক, বাদুড়, কুম্ভীর কাহার মতে শার্দ্দূল, এই পাঁচ জন্তুর মস্তক প্রোথিত করিয়া তাহার উপর যে আসন প্রতিষ্ঠিত হয় তাহাই পঞ্চমুণ্ডাসন।

নানাস্থানে মাল-জাতীয় সর্প-চিকিৎসকেরা উহা গান করিয়া বেড়ায়। রামেশ্বর রাজা যশোমন্ত সিংহের সাভসদ ছিলেন। মেদিনীপুর জেলার যত্নপুরে মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার গোপাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাস—অনুমান হয় তাঁহারই বংশে রামেশ্বরের জন্ম হইয়া থাকিবে।

শিবায়ণে রামেশ্বর এইরূপে আত্মপরিচয় দিয়াছেন,—

ভট্ট নারায়ণ মুনী, সন্তান কেশরকণী,
যতি চক্রবর্ত্তী নারায়ণ।
তস্য সুত কৃতকীর্ত্তি, গোবর্দ্ধন চক্রবর্ত্তী,
তস্য সুত বিদিত লক্ষ্মণ॥
তস্য সুত রামেশ্বর, শম্ভুরাম সহোদর,
সতী রূপবতীর নন্দন।
সুমিত্রা পরমেশ্বরী, পতিব্রতা দুই নারী,
অযোধ্যা নগর নিকেতন॥
পূর্ব্ববাস যত্নপুরে হেমৎ সিংহ * ভাঙ্গে যারে,
রাজারাম সিংহ কৈল প্রীত।
স্থাপিয়া কৌশিকী তটে, বরিয়া পুরাণ পাঠে,
রচাইল মধুর সঙ্গীত॥

শিবায়ণ ৫৯ পৃঃ।

কেশরকণী কষ্টশ্রোত্রিয় কুলে ভট্ট নারায়ণ বংশধর যোগানুরক্ত নারায়ণ চক্রবর্ত্তীর পুত্র গোবর্দ্ধন চক্রবর্ত্তী—তাঁহার পুত্র প্রসিদ্ধ লক্ষ্মণ চক্রবর্ত্তী, তাঁহার পুত্র রামেশ্বর এবং শম্ভুচন্দ্র মাতার নাম

* হেমৎ সিংহ শোভা সিংহের ভ্রাতা।

রূপবতী, কবির দুই পত্নী সুমিত্রা ও পরমেশ্বরী উভয়েই পতিব্রতা। পূর্ব্বে যদুপুরে বাস ছিল, রাজা শোভাসিংহের ভ্রাতা হিম্মৎ সিংহ ঘরবাড়ী ভাঙ্গিয়া দিলে রাজারাম সিংহ কৌশিকী (কাঁশাই) নদী তীরবর্ত্তী অযোধ্যানগর নামক গ্রামে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পুরাণ পাঠে ব্রতী করেন এবং এই মধুর সঙ্গীত গ্রন্থ রচনা করান— উপজীব্য রাজা যশোমন্ত সিংহের পরিচয় –

রঘুবীর মহারাজা, রঘুবীর সমতেজা,
ধার্ম্মিক রসিক রণবীর।
যাহার পুণ্যের ফলে, অবতীর্ণ মহীতলে,
রাজা রাম সিংহ মহাবীর॥
তস্যসুত যশোমন্ত, সিংহ সর্ব্ব গুণমন্ত,
শ্রীযুক্ত অজিত সিংহের তাত।
মেদিনীপুরাধিপতি কর্ণগড়ে অবস্থিতি,
ভগবতী যাহার সাক্ষাৎ॥
রাজা রণে ভৃগুরাম, দানে কর্ণ রূপে কাম,
প্রতাপে প্রচণ্ড যেন রবি।
শক্রের সমান সভা, বেদান্ত পাবকপ্রভা,
সুবেষ্টিত পণ্ডিত সৎকবি॥
দেবীপুত্র নৃপবরে, স্মরণে পাতক হরে,
দরশনে আনন্দ বর্দ্ধন।
তস্য পোষ্য রামেশ্বর, তদাশ্রয়ে করি ঘর,
বিরচিল শিব সঙ্কীর্ত্তণ॥

বঙ্গবাসী শিবায়ণ ২—৩ পৃঃ।

কর্ণগড়—মেদিনীপুর সহরের তিন ক্রোশ উত্তরে অতি প্রাচীনকালে এই গড় প্রস্তুত হয়। প্রবাদ এই যে অঙ্গরাজ সুপ্রসিদ্ধ দাতা মহারাজ কর্ণ এই গড় প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাঁহারই নামানুসারে ইহার নাম হইয়াছে—কর্ণগড়। অঙ্গরাজ দাতাকর্ণ কি সূত্রে, কোন সময়ে এই গড় স্থাপিত করিয়াছিলেন তাহার নির্ণয় করা কঠিন। তবে মেদিনীপুর সহরের অনতিদূরে যে গোপ নামে একটী প্রাচীন দুর্গের ধ্বংশাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা এখন "গোপ" নামে পরিচিত, উহা বিরাট রাজার দক্ষিণ গোগৃহ বলিয়া কথিত, মহারাজ কর্ণের রাজধানী অঙ্গ বা ভাগলপুর অঞ্চলে হইলেও এস্থানে দুর্গনির্ম্মাণ যে একেবারে অসঙ্গত হয় তাহা বলিতে পারা যায় না। সে কালে রেলপথ না থাকিলেও বহুদূরবর্ত্তী স্থান একবারে অগম্য ছিল না। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে ভারতের কোন দেশের রাজা অনাগত ছিলেন না, তাঁহাদের সঙ্গে সৈন্য সামন্তও অনেক আসিয়াছিল। কেহ কেহ বলেন অতি প্রাচীন কালে কর্ণসেন নামে এক রাজা এখানে রাজত্ব করিতেন তাঁহারই নির্ম্মিত এই কর্ণগড়। তাঁহার বংশলোপ হইলে রাজা রাম সিংহ এই দুর্গ অধিকার করেন।

রাজারাম কেশপুরে এক প্রকাণ্ড দীঘি খনন করাইয়াছিলেন, অদ্যাপি তাঁহার নামানুসারে উহা রাম-সাগর নামে খ্যাত। তাঁহার ১২ হাজার সৈন্য ছিল। রাজা রামের রচিত গড় কেন কর্ণগড় নামে প্রসিদ্ধ হইল ইহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। এই স্থানের সহিত দাতাকর্ণের কোন সংশ্রব থাকার সম্ভাবনা নাই—কেন না তিনি অঙ্গদেশের রাজা ছিলেন। মেদিনীপুরের নিকট যে "গোপ" নামে প্রসিদ্ধ একটী স্থানের কথা বলা হইল তাহাকে

সাধারণ লোকে বিরাট রাজার দক্ষিণ গোগৃহ বলিলেও দাতাকর্ণের সহিত কোন সংস্রব-সূত্রে ইহার নাম কর্ণগড় হওয়া বই অন্য কিছু অনুমানে আইসে না।

রাজারামের পরলোক গমনের পর তাঁহার পুত্র যশোমন্ত সিংহ খৃঃ ১৭১১ অব্দে মেদিনীপুরের রাজ্যাধিকার লাভ করেন। তাঁহার পিতার জীবদ্দশায় তিনি বঙ্গদেশের নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর অধীনে চাকরী করিয়া বেশ প্রশংসা প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নবাব সরফরাজ খাঁর দেওয়ানী পাইয়া ঢাকা নগরীকে অতুল ঐশ্বর্য্যশালিনী করিয়াছিলেন, তাঁহার সুশাসনে প্রজাগণ সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে কালযাপন করিত। রাজ্যের অবস্থা সমুন্নত হইয়াছিল। যশোমন্ত রায়ের সুযশ সুখ্যাতিতে বঙ্গভুমি পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সায়েস্তা খাঁর বঙ্গশাসন কালে রাজ্যের সর্ব্বত্র টাকায় ৮ মণ চাউল বিকাইত, তৎকালে ঢাকা নগরী তাঁহার রাজধানী ছিল। তিনি চাউলের সুলভতার স্মৃতিরক্ষার জন্য ঢাকা নগরীর একটী তোরণ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এবং যখন ঢাকা হইতে বিদায় গ্রহণ করেন তখন তাহা দিয়াই বহির্গত হয়েন এবং যাইবার সময় সেই দ্বার বন্ধ করিয়া বলিয়া যান—যে ব্যক্তি রাজ্যমধ্যে চাউল ধানের এইরূপ সুলভ মূল্য করিতে পারিবেন তিনিই এই দ্বার উদ্ঘাটন করিবেন নতুবা চিরদিনের জন্য বন্ধই থাকিবে। যশোমন্ত রায় তাহা করিতে পারিয়াছিলেন এবং সেই দ্বারও উদ্ঘাটিত হইয়াছিল।

যশোমন্ত সিংহ সিদ্ধপুরুষ ছিলেন, মহামায়া তাঁহার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, যশোমন্তের মস্তকে তাঁহার হস্তের পাঁচটী অঙ্গুলির দাগ রহিয়া গিয়াছিল।

একদা বিষ্ণুপুরের রাজা তাঁহার দেবতা মদনমোহনকে সঙ্গে লইয়া যশোমন্তের রাজ্য আক্রমণ করেন, তৎকালে তিনি মহামায়ার পূজায় বসিয়াছিলেন। শত্রু-সৈন্য নগর আক্রমণ ও দখল করিল—রাজা পূজাগৃহ হইতে বাহির হইয়া যুদ্ধের অনুমতি না দেওয়ায় তাঁহার সৈন্য ও সেনাপতিগণ পলায়ন করিয়াছিল। শত্রু-সৈন্যের আনন্দ ধ্বনিতে যশোমন্তের যোগভঙ্গ হইল। তখন তাঁহার সৈন্য সামন্ত কেহই নাই দেখিয়া তিনি কাতরকণ্ঠে মহামায়াকে ডাকিতে আরম্ভ করিলেন, তিনি ভক্তের রোদনধ্বনি শুনিয়া উগ্রচণ্ডী মূর্ত্তি ধরিয়া আবির্ভূত হইলেন—"মাভৈ মাভৈ" শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে শত্রুসৈন্যের বিনাশের আজ্ঞা দিলেন। যশোমন্ত একাকী দেবীর কৃপায় শত্রুসৈন্য সমস্ত নষ্ট করিয়া ফেলিলেন। তাহারা সকলে পরাজিত হইয়া বিষ্ণুপুরে পলায়ন করিল।

খ্রীঃ ১৭৪৮ অব্দে যশোমন্ত সিংহ প্রাণত্যাগ করেন। এই সময়ে মেদিনীপুর পরগণার ২৯,৪৬৩ ৷৶১১৷০ মেদিনীপুর সহরের ৯৪৬ ৷৶৪ পরগণা মনোহর-গড়ের ৩৮৭/১০ পরগণা ঢেকি বাজারের ৬,৮৯৪৷/০ পরগণা বাহাদুরপুরের ২৪৩৪৸০৲১৬ মোট ৪০,১২৬৸০ ১৷০ সরকারী খাজনা বাকী পড়িয়াছিল।

যশোমন্ত সিংহের পুত্র অজিত সিংহ পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া সাত বৎসর মাত্র রাজ্যভোগের পর নিঃসন্তান অবস্থায় কেবল রাণী ভবানী ও রাণী শিরোমণিকে রাখিয়া প্রাণত্যাগ করেন। এই সময়ে তাঁহাদের রাজত্বের বড়ই শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছিল—ধনাগারে ধনাল্পতা, সৈন্য সংখ্যা কম, সকলই বিশৃঙ্খল। স্ত্রীলোকের রাজত্ব নানা দিকে, নানা রকমে গোলযোগ। দস্যুগণ মধ্যে মধ্যে রাজ্য লুণ্ঠন করে। এই সকল দস্যুগণের অধিনায়ক

গোবর্দ্ধন দিকপতি নামে একজন ব্রাহ্মণ। তিনি বগড়ীর বনমধ্যে ভূগর্ভস্থ গৃহে বাস করিতেন, তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধ * ছিলেন। গোবর্দ্ধনের অত্যাচারে রাণীরা বিব্রত হইয়া উঠেন। পরিত্রাণের উপায় না দেখিয়া রাজা যশোমন্ত সিংহের মাতুল সম্পর্কিত নাড়াজোলের জমিদার ত্রিলোচন খাঁর সাহায্য প্রার্থিনী হয়েন। তাঁহার সহিত এই সর্ত্ত হয় যে যতদিন রাণীরা জীবিত থাকিবেন ততদিন তিনি সুনিয়মে রাজকার্য্য চালাইবেন, তাঁহাদের পরলোকান্তে রাজ্যের যাহা কিছু স্বত্ব স্বামিত্ব সমস্তই তাঁহার হইবে। রাণীদের সহিত ত্রিলোচনের যেস্থানে সাক্ষাৎ হয় তাহার নাম "রাণীপাটনা" হইয়াছে। রাণী ভবানী ও রাণী শিরোমণিকে দিয়া লক্ষ্মণ সিংহের বংশ লোপ পাইল।

ত্রিলোচন চুয়াড় দিগকে বশীভূত করিয়া রাজ্যের সুব্যবস্থা করিলেন। তাহার দুই বৎসর পরে রাণী ভবানীর মৃত্যু হয়। অল্প দিন পরে ত্রিলোচনও কালগ্রাসে পতিত হয়েন। ত্রিলোচনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র মতিরাম রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করেন। খৃঃ ১৭৬৩ অব্দে মতিরামের লোকান্তর ঘটিলে ত্রিলোচনের দ্বিতীয় ভ্রাতার পুত্র সীতারাম তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া বেশ দক্ষতার সহিত কার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

খৃঃ ১৭৮৫ অব্দে এক প্রতিকূল ঘটনা উপস্থিত হইল—ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট মেদিনীপুর জমিদারীর রাজস্ব নির্দ্ধারিত করিলেন বার্ষিক ১,১১,৭৯৭।০৮, জমিদারীর আয় বড়ই কমিয়া গিয়াছিল।

* মৎপ্রণীত বঙ্গের গুপ্ত কথা নামক গ্রন্থে (২৮ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত) গোবর্দ্ধন দিক্‌পতির বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

রাজস্বের ভার বহন করা রাণী শিরোমণির পক্ষে বড়ই কষ্টকর হইয়া উঠিল। গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বাকী পড়িতে লাগিল। খৃঃ ১৭৯২ অব্দে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট মেদিনীপুর জমিদারী খাস করিয়া লইলেন। সীতারামের ভাগ্যেও তাহাই ঘটিল, গবর্ণমেণ্ট নাড়াজোলেরও রাজস্ব বৃদ্ধি করিলেন—সীতারাম তাহা দিতে না পারায় নাড়াজোলও গবর্ণমেণ্টের খাস হইয়া গেল। সন ১১৯৭ সালে সীতারাম কর্ণগড়ে দেহত্যাগ করিলেন। তাঁহার তিন পুত্র ছিল—জ্যেষ্ঠ আনন্দ লাল—রাণী শিরোমণির বড় প্রিয়পাত্র ছিলেন, রাণী তাঁহাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন। সন ১১৯৩ সালে তিনি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে বার্ষিক ১৩৩৩ ॥৶০ খাজনা ধার্য্য করিয়া নাড়াজোলের উদ্ধার সাধন করিলেন। সীতারামের অপর দুই পুত্রের নাম নন্দলাল ও মোহনলাল।

নাড়াজোল—নাড়াজোল পূর্ব্বে কতুবপুর পরগণার অন্তর্গত ছিল। এখন তুপা-নাড়াজোল নামে উহা একটী পৃথক পরগণা হইল। ইহার মধ্যে ৩০ খানি বড় এবং ১০ খানি ক্ষুদ্র গ্রাম মাত্র রহিল। ইহার উত্তরে ব্রাহ্মণভূম বরদা এবং চন্দ্রকোণা পরগণা, পূর্ব্বদিকে চেতুয়া পরগণা, দক্ষিণে কতুবপুর পরগণা এবং পশ্চিমে ব্রাহ্মণভূম এবং ভঞ্জভূম বা মেদিনীপুর। ইহার আয়তন ১৪০০০ বিঘা এবং অধিবাসীর সংখ্যা আনুমানিক ৮০০০ মাত্র। পূর্ব্বে এই পরগণা বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল, এখন আর তাহা নাই। শিলাই কাঁসাই পরাং বুড়ীগাং এবং দনাই নদী ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত। প্রতি বৎসর বন্যারজলে ভূমি বেশ উর্ব্বরা হয়—ধান্য ইক্ষু, সরিষা, তিসি, আম কাঁঠাল লিচু নারিকেল কলা আরও নানা প্রকার ফলমূল প্রচুর জন্মে ঘৃত দুগ্ধ যথেষ্ট। এখানে অতি সুন্দর

কাপড় এবং মাতুর প্রস্তুত হয়। ইহার এক তৃতীয়াংশ লোক ব্রাহ্মণ কায়স্থ এবং নবশাক —অবশিষ্ট কৈবর্ত্ত। তাহারা সাধারণতঃ তুঁত চাষ ও গুটিপোকা হইতে রেশম প্রস্তুত দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

খাঁ জমিদারগণই নাড়াজোলের আদিম নিবাসী। বহুকাল পূর্ব্বে তাঁহারা নাড়াজোলে আসিয়া বসবাস করেন। সুদৃঢ় দুর্গ মধ্যে তাঁহাদের বাস ইহাকে গড় নাড়াজোল বলে, ইহার আয়তন ৩৩০ বিঘা এবং চতুর্দ্দিকে গভীর পরিখা ও উচ্চ প্রাকার। পূর্ব্ব দিকে একটী মাত্র প্রবেশ দ্বার। গড়টী দুই ভাগে বিভক্ত— ভিতর ও বাহির। দুইভাগেই পৃথক প্রাকার ও পরিখা ছিল। বাহির গড়ে গোয়ালা ডোম, এমন কি মুসলমান পর্য্যন্ত বাস করিত, তাহারা যুদ্ধের সময় রাজার পক্ষে লড়াই করিত। তাহাদের যুদ্ধাস্ত্র ছিল গুলি তীর ধনুক তরোয়াল কালীবন্দুক। ভিতরের গড়ে খাঁয়েরা বাস করিতেন। তাহার মধ্যে বহু দেবদেবীর মন্দির পঞ্চরত্ন নবরত্নাদি ছিল। তদতিরিক্ত ফতেগড় ও বাহির গোপীনাথপুর নামে আরও দুইটী গড় ছিল। তাহাদের ধ্বংসাবশেষ এখনও নাড়াজোলে দেখিতে পাওয়া যায়। বহিঃশত্রু বিশেষতঃ মারহাট্টাদের আক্রমণ কালে তাঁহারা আপনাদের ধন সম্পত্তি লইয়া তাহাতে লুকাইয়া থাকিতেন।

রাজা মোহন লাল খাঁ নাড়াজোল ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে ত্রিশটী জলাশয় খনন করাইয়াছিলেন—তাহাদের মধ্যে যেটীর নাম লঙ্কাগড় সেইটীই অতি বৃহৎ। ইহার আয়তন ৬০॥ বিঘা—পাশে পাশে নানাজাতীয় সুন্দর ফলকর বৃক্ষ। এই দীর্ঘিকার মধ্যস্থলে রাজাদের গ্রীষ্মাবাসের জন্য একটী রমণীয় অট্টালিকা আছে। বাগান সমেত জলাশয়টী খনন করাইতে ৮০ হাজার টাকা ব্যয় হইয়া-

ছিল। সন ১২২৫ সালে তিনি গড়-নাড়াজোলে একটী পাথরের দেব-মন্দির প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। ইহাতে রামসীতা লক্ষ্মণ ভরত ও শত্রুঘ্নের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা এবং রামসীতার বিবাহোপলক্ষে বারাণসী দ্রাবিড় প্রভৃতি দুরবর্ত্তী স্থান হইতে বড় বড় পণ্ডিত নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার ১৫০০০০ টাকা খরচ হইয়াছিল। সন ১২৩৫ সালে তিনি মেদিনীপুর জেলার চেতুয়া পরগণায় একটী মঠ প্রতিষ্ঠার জন্য লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত নানা প্রকার ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানেও তাঁহার বহু অর্থ ব্যয় হইয়াছিল। নাড়াজোল ও আবাসগড়ে তাঁহার দুইটী সদাব্রত ছিল।

ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট নাড়াজোল বন্দোবস্ত করিয়া লইবার কালে রাণী শিরোমণি বড়ই বিপাকে পড়িয়াছিলেন। তাঁহার সেনাগণ ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট দ্বারা আপনাদের জায়গীর সম্পত্তিতে বঞ্চিত হইয়া নাড়াজোলের চতুর্দ্দিগ্বর্ত্তী স্থানে বড়ই উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছিল। তাহাদের দ্বারা বিলক্ষণ প্রজাপীড়ন ও তাঁহাদের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠিত হইয়াছিল। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট রাণীকে তাহাদের সাহায্যদাত্রী সন্দেহে কর্ণগড় দুর্গে অবরুদ্ধ করেন। এই বিপদের সময় চুনিলাল খাঁ ব্যতীত তাঁহাকে সাহায্য করিবার আর কেহ ছিল না। তিনি শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার পক্ষভুক্ত থাকিয়া বহু কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন। সৈন্যেরা কর্ণগড় দুর্গে প্রবেশ করিয়া রাণীগণের স্বর্ণ রৌপ্যনির্ম্মিত জিনিষপত্র ও অলঙ্কারাদি লুণ্ঠন করিয়াছিল। রাণী শিরোমণি কিছুমাত্র বাধা না দিয়া চুনিলালকে লইয়া সেনাপতির হস্তে আত্মসমর্পণ করেন।

সেনাপতি তিন চারি দিন তাঁহাদিগকে আবাসগড় দুর্গে অবরুদ্ধ রাখিয়া তাঁহাদের প্রার্থনা মতে আনন্দলালের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া কলিকাতা পাঠাইয়া দেন, সেখানে তাঁহাদিগকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করা হয়। আনন্দলাল তাঁহাদের নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ জন্য যতদূর সাধ্য সাহায্য করিলে খৃঃ ১৭৯৯ অব্দে কলিকাতা সদর নিজামত হইতে রাণী মুক্তিলাভ করেন এবং সেই বৎসর জুন মাসে তিনি বারুদ সহিত ২৮টী বন্দুক, একটী হাতী ও একটী সোণার হুঁকা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ফেরত পান। তৎকালে প্রজারা রাণীকে খাজনার টাকা নগদ দিত না, উৎপন্ন ফসলের অংশ দিত। পাইকেরা পাইকান জমির খাজনা একবারে বন্ধ করিল। রাণী যে গবর্ণমেণ্টকে রাজস্ব আদায় দিবেন তাহারও সঙ্গতি সমাবেশ রহিল না। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহার জমিদারীর বার্ষিক রাজস্ব কমাইয়া ৮৫ হাজার টাকা ধার্য্য করিলেন। রাণী তাহাতে অনিচ্ছুক হইয়া খৃঃ ১৮০০ অব্দের ৩০শে জুন (সন ১২০৭ সালের ২৭শে আষাঢ়) মেদিনীপুর জমিদারীর চারিটী পরগণা দানপত্র দ্বারা আনন্দলাল খাঁকে অর্পণ করেন। পরবর্ত্তী ৩০শে জুলাই তাহা রেজেষ্ট্রী হয়। এইরূপে আনন্দলাল সমস্ত রাজ্যের একাধিপত্য লাভ করিয়া তাহা স্ববশে আনয়ন এবং খৃঃ ১৮০৫ (সন ১২১২ সাল) পর্য্যন্ত নিরুপদ্রবে রাজ্য করেন। কিন্তু এই বৎসরের শেষে রাণী শিরোমণি দুষ্ট লোকের কুপরামর্শে রাজত্ব ফেরত পাইবার জন্য এক মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। সেই মোকদ্দমা নিষ্পত্তির পূর্ব্বে সন ১২১৭ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে (খৃঃ ১৮১০ অব্দে) নিরপত্য অবস্থায় আনন্দলালের মৃত্যু হয়। তিনি এক হেবানামা দ্বারা মেদিনীপুর রাজত্বের চারিটী

পরগণার স্বত্বাধিকার আপনার সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজা মোহনলাল খাঁকে এবং অপর একখানি হেবানামা দ্বারা পৈতৃক জমিদারী নাড়াজোল প্রভৃতি মধ্যম ভ্রাতা নন্দলাল খাঁকে দিয়া যান।

আনন্দলাল খাঁর মৃত্যুর পর রাজা মোহনলাল খাঁ তাঁহার উত্তরাধিকারী ও স্থলাভিষিক্তরূপে মোকদ্দমার পক্ষভুক্ত হয়েন। কিন্তু রাণী শিরোমণি খৃঃ ১৮১১ অব্দে ৩০শে মার্চ্চ তদানীন্তন প্রভিন্সিয়াল কোর্টের বিচারের প্রতিকূলে কলিকাতা সদর দেওয়ানী আদালতের আপিল বিচারে জয়লাভ করেন। আপিল আদালত এই বলিয়া রাণীকে ডিক্রী দেন যে, হিন্দু-বিধবা পতিবিয়োগের পর কোন কারণেই তাঁহার ত্যক্ত ভূসম্পত্তির সমগ্র দান বিক্রয়াদির দ্বারা হস্তান্তর করিতে পারেন না; অথবা স্বামীর উত্তরাধিকারিগণের সম্মতি না লইয়া, বিশেষ বিশেষ স্থল ব্যতীত, ঐরূপে তাহার কোন অংশও ত্যাগ করিতে পারেন না; বাহিরের কোন ব্যক্তিকে দানপত্র লিখিয়া দিয়া তাহা সিদ্ধ করিতে হইলে, তাহাতে তাঁহার স্বামীর উত্তরাধিকারিগণ যে সম্মত তাহার প্রমাণ দেওয়া চাই।

রাজা মোহনলাল খাঁ এই মীমাংসার বিরুদ্ধে বিলাতের প্রিভি কৌন্সিলে আপিল করেন। এই সময়ে রাজত্বের কার্য্য-নির্ব্বাহভার কোর্ট অফ ওয়ার্ডের তরফ মেদিনীপুর জেলার কালেক্টর সাহেবের হাতে থাকে।

রাণী শিরোমণি ১২২০ সালের ৪ঠা আশ্বিন (খৃঃ ১৮১২ অব্দের ১৭ই সেপ্টেম্বর) পরলোক বাস করেন। তাঁহার মৃত্যুর অল্পকাল পরেই রাজা অজিত সিংহের সাত পুরুষ পরবর্ত্তী কন্দর্প সিংহ নামে এক ব্যক্তি মেদিনীপুর রাজ্যের চারিটী পরগণা রাণী শিরোমণি

মৃত্যুর পূর্ব্বদিন দানপত্র দ্বারা তাঁহাকে দিয়া গিয়াছেন বলিয়া, এবং দানপত্রে রাজা অজিত সিংহের উত্তরাধিকারী বলিয়া যাঁহারা উল্লিখিত হইয়াছেন তাঁহারা সকলে সম্মত পক্ষীয় হইলে দানপত্র তাঁহার স্বত্বাধিকারের পোষক এই বলিয়া মোহনলাল খাঁও দাবি করিলেন।

মেদিনীপুরের কালেক্টর সাহেব ২৫শে সেপ্টেম্বর রাজা মোহনলাল খাঁ কন্দর্প সিংহ এবং অন্যান্য ব্যক্তি যাঁহারা উত্তরাধিকর-সূত্রে বা অন্য প্রকারে জমিদারীর স্বত্বদখলের দাবি করেন তাঁহাদের সকলকে জেলার জজ সাহেবের নিকট আবেদন করিবার আজ্ঞা দিলেন।

রাজা লোহনলাল খাঁ এবং কন্দর্প সিংহ উভয়ে দরখাস্ত দাখিল করিলে জেলার জজ সরাসরি মতে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের ২৪শে ডিসেম্বর তাঁহাদের দাবির বিচার করিয়া নিম্নোক্ত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিলেন ;—

১। যে দলিলের বলে কন্দর্প সিংহের দাবি তাহা কৃত্রিম এবং রাণীর মৃত্যুর পরে প্রস্তুত। কন্দর্প সিংহের স্বত্ব শাস্ত্রানুসারে পৈতৃক বলিয়া বা দলিল দ্বারা সাব্যস্ত বা সপ্রমাণ নহে।

২। খৃঃ ১৮১২ অব্দের ৩১শে আগষ্টের ডিক্রীতে যে ব্যবস্থার উল্লেখ হইয়াছে তদনুসারে অজিত সিংহের মাতুল-পুত্রগণই উত্তরাধিকারী, রাণীর মৃত্যুর পর তাঁহারাই হকদার।

৩। ঐ সকল ওয়ারিস তাহাদের স্বত্ব মোহনলাল সিংহকে ছাড়িয়া দিয়াছে।

৪। এরূপ অবস্থায় মোহনলাল সিংহের মোকদ্দমার বিলাত আপিল নিষ্পন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত জমিদারী কোর্ট অফ ওয়ার্ডে থাকে।

সদর দেওয়ানী আদালতে উহা মঞ্জুরের জন্য পাঠাইলে খৃঃ ১৮১৪ অব্দে ১৪ই ফ্রেব্রুয়ারী সদর দেওয়ানীর জজেরা আপিল না চলিবার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া এবং কোর্ট অফ ওয়ার্ডের কর্ত্তৃত্ব স্থগিত হইয়াছে বলিয়া বিবেচনা করেন যে জেলার জজ এই সরাসরি বিচারানুসারে কার্য্য করিবেন এবং খৃঃ ১৮১৩ অব্দের ২৪শে ডিসেম্বর তারিখের কার্য্য-বিবরণীতে (Proceeding) যাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহার বিশেষত্ব বিবেচনায় যদি তিনি মোহনলাল খাঁকে জমিদারীর মালিক বিবেচনা করিয়া থাকেন এবং যদি মোহনলাল খাঁ প্রিভিকৌন্সিলে ডিক্রী কায়েম থাকিবার ও অন্যান্য দাবি পূরণ করিবার জামিন দিতে সক্ষম হয়েন তাহা হইলে কোর্ট অফ ওয়ার্ড হইতে জমিদারী লইয়া মোহনলাল খাঁর অধিকারে দেওয়াই উপযুক্ত এবং ন্যায়সঙ্গত হইবে।

এই সকল কার্য্য-বিবরণী দ্বারা রাজা মোহনলাল খাঁই জমিদারীর স্বত্বাধিকার প্রাপ্ত হইলেন। তাহার পর উভয় পক্ষে অনেক মামলা মোকদ্দমা চলিতে লাগিল। খৃঃ ১৮২৭ অব্দের ৩রা ডিসেম্বর প্রিভিকৌন্সিলের বিচারে রাজা মোহনলাল খাঁরই জয়লাভ হয়। তিনি বড় চালাক চতুর দয়ালু এবং সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। খৃঃ ১৮৩০ অব্দের ফ্রেব্রুয়ারী মাসে (১২৩৭ সালের ফাল্গুনে) তাঁহার দেহান্তর ঘটে। তাঁহার দুই রাণীর গর্ভের ছয়টী পুত্রই তখন নাবালগ, সন ১২৩৭ সালের ১৯শে ফাল্গুন (১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ফ্রেব্রুয়ারী মাসে) একখানি দানপত্র দ্বারা জ্যেষ্ঠপুত্র রাজা অযোধ্যা-রাম খাঁকে সমস্ত সম্পত্তি দিয়া যান, এবং তাঁহার নাবালগ অবস্থায় দুই রাণী তাঁহার অভিভাবকতা করিবেন এবং তাঁহার পিতৃব্য চুনিলাল খাঁ সরবরাহকার থাকিবেন। খৃঃ ১৮৪১ অব্দে অযোধ্যা-

রাম খাঁ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া এতই মামলা মোকদ্দমায় জড়িত হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহাকে প্রায় সমস্ত জীবনকাল তাহাতেই অতিবাহিত করিতে হইল। তাঁহার মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বে মেদিনীপুর রাজ্য নির্ব্বিবাদ ও আপত্তিশূন্য হয়। তিনি খৃঃ ১৮৭৯ অব্দে ৫৮ বৎসর বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃপঞ্চক ও ভাগিনেয়গণের সহিত বিবাদ বিসম্বাদে ২৫ বৎসরের অধিককাল অতিবাহিত হইয়াছিল। যদিও সুদীর্ঘকাল আত্মীয়-স্বজন ও অন্যান্য ব্যক্তিগণের দ্বারা রাজা অযোধ্যারাম নানা সময়ে নানা আপদ-বিপদ সহ্য করিয়াছিলেন তথাপি ধর্ম্মপথে থাকিয়া জয়লাভ করিয়াছিলেন, বিপদে পড়িয়াও কখনও বিচলিত হয়েন নাই. অথবা ধর্ম্মবুদ্ধি হারান নাই। তিনি এক জন খাঁটী হিন্দু ছিলেন। ইংরাজরাজের প্রতি তাঁহার অবিচলিত শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল। তাঁহার বিনয় ও শিষ্টাচারে বশীভূত হইয়া মেদিনীপুরের সমস্ত রাজকর্ম্মচারীই তাঁহাকে ভাল বাসিতেন, শ্রদ্ধা করিতেন। খৃঃ ১৮৬৩ অব্দের ২০শে মে বঙ্গদেশের লেঃ গবর্ণর তাঁহাকে ১১টী কামান রাখিবার অনুমতি দেন এবং খৃঃ ১৮৭৭ অব্দে ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ভারত সাম্রাজ্ঞী উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে রাজা অযোধ্যারাম মেদিনীপুর হাইস্কুল পরিচালনায় ব্যয়ভারবহন ও অন্যান্য বহুবিধ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং বিপুল জমিদারীর কার্য্য সুনিয়মে নির্ব্বাহ জন্য সম্মানের প্রশংসা পত্র (সার্টিফিকেট) পাইয়াছিলেন। দেবদেবীর পূজার্চ্চনায়, বিবিধ ধর্ম্মানুষ্ঠানে, নিরন্নের অন্নসংস্থানে, ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকে বৃত্তিবিতরণে এবং সঙ্গীতালোচনায় তিনি অগ্রগণ্য ছিলেন; জমিদারীর কার্য্য স্বয়ং নির্ব্বাহ করিতেন,

প্রজাহিতসাধনে, শিক্ষা বিস্তারে তাঁহার অসাধারণ আন্তরিকতা ছিল। জমিদারীতে দুর্ভিক্ষ ও ম্যালেরিয়ার প্রাধান্য হইলে তিনি প্রাণপণ যত্নে তাহাদের প্রতীকার করিয়াছিলেন।

তাঁহার ষাণ্মাসিক দানসাগর শ্রাদ্ধে ৬৫ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল। ষোল রকমের রূপার বাসন, ষোল প্রস্ত পিতল কাঁসার বাসনের স্তূপ, শাল, জামিয়ার বনাত, গরদের জোড় অসংখ্য উৎসর্গ করিয়া নদীয়া, ময়মনসিং, কলিকাতা, ভাটপাড়া, নবদ্বীপ, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান ও অন্যান্য নানা স্থানের নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-গণকে বিতরণ করা হইয়াছিল, নগদ বিদায়েও তাঁহারা বহু অর্থ লাভ করিয়াছিলেন। কাঙ্গালিগণও উদর পূরিয়া ভোজ্য বস্ত্র ও বিদায় পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছিল।

রাজা অযোধ্যারাম খাঁয়ের দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠ রাজা মহেন্দ্রলাল খাঁ এবং কনিষ্ঠ বাবু উপেন্দ্রলাল খাঁ। রাজা মহেন্দ্রলাল খৃঃ ১৮৪৩ অব্দের ১লা সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তিনি পনর বৎসর বয়স পর্য্যন্ত যথারীতি বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিয়া সংস্কৃত ইংরাজী ও পারস্য ভাষা পড়িতে আরম্ভ করেন। সংস্কৃত ও পারস্য ভাষার উপক্রমণিকা তিন বৎসরকাল শিক্ষা করিয়া তত্তৎ-ভাষায় কিঞ্চিৎ অধিকার লাভ করিলে তাহার পর সাত বৎসরকাল উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট ইংরাজী পড়েন। জমিদারী কার্য্য নির্ব্বাহে এবং বহুতর জটিল মামলা মোকদ্দমায় পিতার সাহায্যার্থ সর্ব্বদাই তাঁহাকে কলিকাতা ও মেদিনীপুরে অবস্থিতি করিতে হইত—অগত্যাবাধ্য হইয়া খৃঃ ১৮৬৬ অব্দে তাঁহাকে লেখা পড়া ত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু এরূপ অবস্থাতেও শিক্ষা প্রবৃত্তির বলবত্তাপ্রযুক্ত তিনি নানা প্রকার ইংরাজী

বাঙ্গলা পুস্তক ও সংবাদপত্র পাঠে অবসরকাল ক্ষেপণ করিতেন। তাহাতেও তাঁহার প্রভূত জ্ঞান সঞ্চিত হয়। তিনি কোন প্রকার মাদক দ্রব্য, এমন কি তামাক পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতেন না। মোকদ্দমার দায়ে তাঁহারও অব্যাহতি ছিল না, তবে তাঁহার পিতার স্থায় নহে। বাল্যাবধি তাঁহার সঙ্গীত শাস্ত্রে বিলক্ষণ আসক্তি ছিল। খৃঃ ১৮৭১ অব্দে তিনি "সঙ্গীত-লহরী" খৃঃ ১৮৭৮ অব্দে "মনমিলন" নামে নাট্যগীতি (খৃঃ ১৮৮২ অব্দে তাহার দ্বিতীয় সংস্করণ হয়) খৃঃ ১৮৮০ অব্দে "গোবিন্দ-গীতিকা" (দিবা এবং রাত্রির ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যে ভিন্ন ভিন্ন রাগ-রাগিণী গীত হইয়া থাকে সেই সকল রাগিণীর ৯২ গীত ইহাতে সন্নিবিষ্ট) খৃঃ ১৮৮১ অব্দে "শারদোৎসব" এবং খৃঃ ১৮৮৩ অব্দে "মথুরা-মিলন" নামে পুস্তকগুলি রচিত ও মুদ্রিত হয়। তাঁহার পিতা খৃঃ ১৮৭০ অব্দে মেদিনীপুর রাজ্যের অবিসম্বাদিত স্বত্বলাভ করিয়া যাবতীয় বৈষয়িক কার্য্যে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন, ক্রমে জমিদারী কার্য্য-নির্ব্বাহে তাঁহার এরূপ পারদর্শিতা জন্মে যে তাঁহার পিতা সময়ে সময়ে তাঁহার উপর জমিদারীর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইতেন।

খৃঃ ১৮৭৯ অব্দের জুন মাসে তাঁহার পিতা তাঁহাকে বর্দ্ধমানের মহারাণী নারায়ণ কুমারীর (মহারাজা মহাতাপচাঁদ বাহাদুরের পত্নী) নিকট পৈতৃক জমিদারী নাড়াজোল ক্রয়ের বন্দোবস্ত করিবার জন্ত তাঁহাকে বর্দ্ধমান পাঠাইয়া দেন। রাজা মহেন্দ্রলাল তথায় প্রায় একমাস কাল অবস্থিতি করিয়া স্বকার্য্য সাধনান্তে প্রত্যাগমনের পূর্ব্বেই রাজা অযোধ্যারাম অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। তৎকালে উপস্থিত থাকিয়া পিতার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পন্ন করিতে না পারায় রাজা মহেন্দ্রলাল বড়ই দুঃখিত হইয়া:

ছিলেন। রাজা অযোধ্যারাম কোন উইল বা দানপত্রাদি কিছুই করিয়া যান নাই। রাজবংশের চিরপ্রচলিত প্রথানুসারে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর তিনি মেদিনীপুরের জজ আদালত হইতে খৃঃ ১৮৬০ অব্দের ২৭ আইন অনুসারে সার্টিফিকেট পাইয়া রাজা হইয়াছিলেন। মেদিনীপুর রাজত্বের একমাত্র স্বত্বাধিকারী বলিয়া উক্ত জেলার কালেক্টরীতে তাঁহার নাম রেজিষ্ট্রী হইয়াছিল।

খৃঃ ১৮৮৭ অব্দে ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জুবিলি উপলক্ষে ভারতের রাজ-প্রতিনিধি গবর্ণর জেনেরল তাঁহাকে রাজা উপাধি দান করেন। বঙ্গের তাৎকালিক ছোটলাট সার রিভার্স-টমশন নিম্নোদ্ধৃত পত্রে তাহা রাজা মহেন্দ্রলালকে জ্ঞাপন করেন—

Belvedere, 18th February, 1887.

Raja,

It gives me great pleasure to congratulate you on your accession to the title of Raja which H. E. the Viceroy has been pleased to confer upon you, in recognition of your public spirit and liberality on many occasions, on the auspicious celebration of Her Majesty, the Queen Empress' Jubilee in India.

I trust you may be spared many years in the enjoyment of an honour which is appropriate to the representation of a family of ancient lineage.

I am,
Your sincere friend.
RIVERS THOMPSON.
Lieutentant Governor of Bengal.

এই উপাধি প্রাপ্তিকালে ছোট লাট টমশন অবসর লইয়াছিলেন বলিয়া, খ্রীঃ ১৮৮৭ অব্দের ১৫ই জুলাই দিবা ৪॥ টার সময় সার ষ্টুয়ার্ট বেলি বেঙ্গল সেক্রেটেরিয়েট গৃহে এক সভা করিয়া অন্যান্য উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সহিত রাজা মহেন্দ্রলাল খাঁকে পেটী সমেত একখানি তলোয়ার দিয়া স্বহস্তে এক ছড়া মুক্তার মালা তাঁহার গলায় পরাইয়া দেন তদুপলক্ষে তিনি যে সংক্ষিপ্ত ব্যক্তৃতাটুকু করেন, তাহাতে তাহার সৎকর্ম্মের ভূয়সী প্রশংসা করেন। *

রাজা মহেন্দ্রলাল সাধারণের হিতানুষ্ঠানে সর্ব্বদা নিবিষ্টমনা হিন্দু-ধর্ম্মানুরাগী, দেবদ্বিজে ভক্তিবান এবং গরিবদুঃখীর দুঃখ দুরী-করণে যত্নবান ছিলেন। মেদিনীপুর রাজত্বের ইংরাজী ইতিহাস তিনিই লিখিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার পরলোক প্রাপ্তিতে তাঁহার পুত্র রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁ রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি খৃঃ ১৮৬৭ অব্দের ১৭ই সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন, এক্ষণে তাঁহার বয়ঃক্রম ৪৬ বৎসর। তাঁহার দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠ কুমার দেবেন্দ্রলাল এবং কনিষ্ঠ কুমার বিজয়লাল। মেদিনীপুর রাজবংশ চিরদিন ইংরাজরাজের অনুগত ও আশ্রিত বলিয়া পরিচিত। ইংরাজরাজও যাহাতে এদেশের প্রাচীন রাজ-বংশগুলির সম্মান সম্পত্তি অক্ষুণ্ণ থাকে তাহার জন্য সদা সচেষ্ট। এরূপ স্থলে উভয় পক্ষে সদ্ভাব সহানুভূতি দেখিলে সাধারণে সুখী ও সন্তুষ্ট হয়। তাহার ব্যতিক্রম ঘটিলে তাহাদের মনোবেদনার সীমা থাকে না।

---

* Vide page 22 ; History of the Midnapur Raj.

পূর্ব্বস্থলী।—ইহা বৰ্দ্ধমান জেলার পরগণা জাহাঙ্গিরাবাদের অন্তর্গত একটী সমৃদ্ধিশালী জনপদ। পূর্ব্বস্থলীর খ্যাতি এ পর্য্যন্ত লোপ পায় নাই। এখানে অনেক কৃতবিদ্য ব্রাহ্মণ সজ্জনের বাস। ইহা পূবধুল নামেও পরিচিত। ১৩৩৮ হইতে ১৩৬৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পাঠান-বংশীয় নবাব সমসুদ্দিন এবং তৎপুত্র সেকেন্দর সাহের অধীনে মুকুট রায় নামক এক প্রবলপ্রতাপ জমিদার বৰ্দ্ধমান পাবনা, ফরিদপুর, যশোহর, নদিয়া ও খুলনা জেলার নানাস্থানে আধিপত্য করিতেন। তিনি পরম ধার্ম্মিক এবং যারপর নাই প্রজা-বৎসল জমিদার ছিলেন—অত্যাচারী মুসলমান শাসনকর্ত্তৃগণের সহিত হিন্দু প্রজার হিন্দুত্ব রক্ষার জন্য ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া অনেক স্থলেই তিনি জয়লাভ করিয়াছিলেন। মুকুট রায় রাঢ়ীয় বারেন্দ্র এবং বৈদিক শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণের তিনটী কন্যা বিবাহ করিয়া যে যে স্থানে আপনার আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন সেই সেই স্থানে সুরম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করাইয়া বাস করিতেন। তাঁহার বলবিক্রমের পরিচয় পাইয়া দীল্লির পাতসাহ তাঁহাকে জমিদারী সনন্দ দিয়াছিলেন। তাঁহার পরলোক গমনে তাঁহার পতিব্রতা পত্নী চিতারোহণে অনুমৃতা হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রগণ গৃহবিচ্ছেদে দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়েন—পিতৃনাম রক্ষার শক্তি না থাকায় মুসলমান নবাবগণের অধীন হইয়া কালযাপন করেন। মুকুট রায়ের প্রভূত সৈন্যবল ছিল। শুনা যায় তাঁহার আজ্ঞামাত্র পাঁচ হাজার অশ্বারোহী, পাঁচ হাজার পদাতিক এবং পাঁচশত হস্তী যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইত। ঈদৃশ বঙ্গীয়-বীরের বীরত্ব কাহিনী ইতিহাসে নিবদ্ধ নাই। না হইবারই কথা, মুসলমান ঐতিহাসিকেরা সর্ব্বত্রই আপনাদের কথাই ঘোষণা করিতেন। কয়জন বঙ্গীয় বীরের বলবীর্য্যের পরিচয় তাঁহাদের

লিখিত ইতিহাসে প্রাপ্ত হওয়া যায় যে মুকুট রায়ের অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যাইবে। মুকুট রায়, প্রতাপাদিত্য, সীতা-রাম রায় প্রভৃতি বীর অপেক্ষা হীন ছিলেন না। তাঁহার বংশধরগণ এখনও সামান্য জমিদাররূপে পূর্ব্বস্থলী ও পূর্ব্বোক্ত জেলার নানাস্থানে বসবাস করিতেছেন। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের পরিচয় অনেকেই অবগত নহে। কালের কঠোর করাবমর্ষণে মুকুট রায়ের মহীয়সী কীর্ত্তির হানি হইয়াছে, তাঁহার নাম মাত্র অবশিষ্ট আছে।

কাঁকশা।—বর্দ্ধমান জেলায় যে বুদ্‌বুদ্ নামে একটী প্রসিদ্ধ স্থান আছে কাঁকশা তাহারই নিকটবর্ত্তী। মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস প্রণীত মহাভারতে যে প্রত্যর্দ্দনের উল্লেখ আছে তাঁহার বৎস নামে এক মহাবলশালী পুত্র ছিলেন তিনি গোষ্ঠ বৎসকুল কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াছিলেন বলিয়া স্বয়ং "বৎস" নামে খ্যাত ছিলেন এবং জাতিতে গোপ সংজ্ঞা লাভ করেন। এই বৎস দাক্ষিণাত্যের কন্‌কন্ (অধুনা কোকন) দেশের অধিপতি ছিলেন। এজন্য ইহাকে কন্‌কন্‌ও বলা হইত। কন্‌কন্ শব্দের অপভ্রংশ কাঁকশা—তাঁহার বংশধরেরা তদনুসারে কাঁকশা উপাধি ধারণ করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে ভবানীপতি কাঁকশা কন্‌কন্ দেশ হইতে আসিয়া বর্দ্ধমান জেলার যেস্থানে উপনিবিষ্ট হয়েন তাহার নাম হয় কাঁকশা গড়। তাঁহাদের প্রচলিত উপাধি সিংহ ও রায়। ভবানীপতির পুত্রের নাম বরেন্দ্র সিংহ কাঁকশা, তৎপুত্র জয়সিংহ, তৎপুত্র সুরেন্দ্র, তৎপুত্র নীলকণ্ঠ, তৎপুত্র চন্দ্রকান্ত, তৎপুত্র বিনোদবিহারী সিংহ কাঁকশা। ভবানীপতি কাঁকশার প্রতিষ্ঠিত কঙ্কেশ্বর নামক শিব এখনও কাঁকশাগড়ে দেখিতে পাওয়া যায়। ইনি এই রাজবংশের

কুলদেবতা। প্রতিদিন ষোড়শোপচারে তাঁহার পূজা হইয়া থাকে। রাজবংশ সৎগোপ জাতীয়।

ভালুকী।—ইহা বর্দ্ধমান জেলার মানকরের নিকটবর্ত্তী এবং গন্ধ-বণিক জাতীয়ের একটী সমাজ—মহাভারতোল্লিখিত বিদুরথের পুত্র ধর্ম্মবান পর্ব্বতে ভল্লুকদিগের পদতলে রক্ষিত বলিয়া তাঁহার বংশধরগণের উপাধি হয় ভল্লুকপদ তাঁহারা দাক্ষিণাত্যের সৌরাষ্ট্রে রাজত্ব করিতেন। তাঁহাদের চলিত উপাধি সিংহ। ৮৪৮ বঙ্গাব্দের মাঘমাসে রাঘব সিংহ ভল্লুকপদ মানকরের নিকটবর্ত্তী অরণ্যমধ্যে উপস্থিত হইয়া বাসস্থান স্থাপন করেন। তিনি নানাশাস্ত্রদর্শী ও ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। দৈবযোগে এক সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎকার লাভে তাঁহার নিকট তিনি বেদাধ্যয়ন করিয়া তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করেন। পরে আপন ভুজ-বলে নিকধবর্ত্তী স্থানে অধিপত্য বিস্তারে এক রাজ্য স্থাপন করিয়া-ছিলেন, বংশোপাধি অনুসারে রাজধানীর নাম রাখেন ভালুকী। কালে তাহা ভালুকী-নামে প্রসিদ্ধ হয়। পরে তিনি নীলপুরের পরম রূপবতী রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। যথাকালে তাঁহার এক পুত্র জন্মে, তাঁহার নাম গোপাল। ৯৫৫ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে রাঘবের পরলোক প্রাপ্তি ঘটিলে তাঁহার পুত্র পিতৃ রাজ্যের আধিপত্য লাভ করেন। তিনি স্বীয় ভুজবলে ৩৬০ খানি গ্রামে আধিপত্য বিস্তার করিয়া আপনার নামানুসারে রাজ্যের নাম রাখেন—গোপালভূম, কালে তাহা গোপভূম নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। তিনি পরমসুখে রাজ্যভোগ করিয়া শতক্রতু নামক পুত্রকে রাজ্যভার অর্পণপূর্ব্বক ১০৪২ বঙ্গাব্দে পরলোক প্রস্থান করেন। রাজা শতক্রতু কর্ণহারাধিপতি রাজা নীলধ্বজের কন্যার পাণিগ্রহণ

করিয়াছিলেন। কর্ণহার এক্ষণে বীরভূম জেলার কীর্ণহার বলিয়াই বোধ হয়। তিনি মহেন্দ্র নামক পুত্রকে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া ১১২৫ বঙ্গাব্দে ইহলোক হইতে অবসর গ্রহণ করেন। মহেন্দ্র পিতৃরাজ্য বহুদূর বিস্তৃত করিয়া অমরগড় নামক স্থানে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন এবং আপন গড়ের চতুর্দ্দিক সাত সাতটী পরিখা দ্বারা বেষ্টিত করিয়া রাজধানীকে সমধিক সুদৃঢ় ও দুরাক্রম্য করিয়াছিলেন। রাজা মহেন্দ্র ওড়ম্বরাধিপতি পীতাম্বরের কন্যাকে বিবাহ করেন। তিনি জাতিতে সৎগোপ ছিলেন এবং আপন স্বজাতীয়ের মধ্যে কন্যা আদানপ্রদানার্থ আটঘরের সমীকরণ করেন যথা,—সুসনে, বৈঁচি, কীর্ণহার, শিউরে, কাঁকশা, থটঙ্গী, ওড়ম্বর ও প্রতিহার। পরে তিনি যোগেন্দ্র নামক পুত্রের হস্তে রাজ্যভার দিয়া ১১৯৫ বঙ্গাব্দে পরলোক যাত্রা করেন। রাজা মহেন্দ্র একজন পরাক্রমশালী ও প্রতিষ্ঠাপন্ন রাজা ছিলেন। নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনী মধ্যে তাঁহার কথা সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। কাশিমবাজারের সুবিখ্যাত ধনবান জগৎশেঠের বাটীতে নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে রাজ্যচ্যুত করিবার জন্য যে সভা হয় তাহাতে রাজা মহেন্দ্র একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, সম্ভবতঃ তিনিই এই রাজা মহেন্দ্র। কেন না মুর্শিদাবাদ কাশিমবাজারের সভা তাঁহারই জীবদ্দশায় আহূত হইয়াছিল।

যোগেন্দ্র পিতৃসিংহাসন লাভ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে ও নিরাপদে রাজত্ব করিয়া পরলোকবাসী হইলে তাঁহার দুই পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ধীরচন্দ্র অল্পদিন মাত্র রাজ্যভোগ করেন, এই বংশে আরও দুই তিনজন রাজত্ব করিয়াছিলেন। পরে দীলিপ নামক এক

ব্যক্তি রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়া কিছুদিন রাজত্ব করেন কিন্তু বৈদ্যনাথ নামে তাঁহার পুত্র রাজ্যরক্ষায় সমর্থ না হইয়া শত্রুহস্তে নিধন প্রাপ্ত হয়েন।

রাজা শিবাদিত্য সিংহের বংশধরেরা এখনও সেখানে আছেন। বোধ হয় রাজা দ্বারপালের বংশধরগণের সহিত কোন সম্বন্ধ থাকায় তৎপূর্ব্বে দেবীকে তাঁহারা তথায় লইয়া গিয়া থাকিবেন।

বাঁশবেড়িয়া।—বাঙ্গালা দেশের মধ্যে হুগলীর সন্নিহিত বাঁশবেড়িয়ার মহাশয়দিগের বংশ অতি প্রাচীন। ইঁহারা উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ—দিল্লীর সম্রাট আকবর সাহের সময় হইতে তাঁহারা রায়, মজুমদার, রাজা, মহাশয় ইত্যাদি বহুবিধ সম্মানের উপাধি ভোগ করিয়া আসিতেছেন। বহু পূর্ব্বকালে যখন উত্তর ভারতে বিজয় সিংহ এবং আদিশূর রাজত্ব করিতেন, তখন দেবাদিত্য দত্ত নামে এক ব্যক্তি কান্যকুব্জ হইতে আধুনিক মুর্শীদাবাদের নিকট মায়াপুর গ্রামে আসিয়া অবস্থিতি করেন, এবং সেখান হইতে উঠিয়া তিনি বঙ্গের তৎকালিক রাজধানীর সমীপে দত্তবাটী নামক গ্রাম পত্তন করিয়া তথায় বসবাস করিতে থাকেন। দেবাদিত্যের বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি হইয়া উঠে। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র বিনায়ক দত্ত পিতৃ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া কালযাপন করেন। তাঁহার পরবর্ত্তী পাঁচ পুরুষের মধ্যে কোন যোগ্য ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন নাই। রাজা বল্লাল সেনের রাজত্বকালে ঐ বংশে মাধব দত্তের আবির্ভাব হয়, তিনি স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন, বিষয়বৈভব অনেক করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজা বল্লাল সেনের বিরাগ-ভাজন হওয়ায় তাঁহাকে সবংশে নিধনপ্রাপ্ত হইতে হইয়াছিল। তাঁহার এক পুত্রের নাম মহেশ, তিনি আত্মরক্ষায় সমর্থ না হইলেও তাঁহার

অন্তঃসত্ত্বা পত্নী পলাইয়া জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। যথাকালে মহেশ-পত্নী কোন এক অজ্ঞাত স্থানে এক পুত্র প্রসব করেন, তাঁহার নাম—উবরু, এই আত্মীয় স্বজনহীন শিশু বড় হইয়া কিছুই করিতে পারেন নাই. মৃত্যুকালে কুলপতি নামে এক পুত্র রাখিয়া যান। তিনিও কিছুই করিয়া যাইতে পারেন নাই, কেবল পুত্র কন্যায় নয়টীকে রাখিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একের নাম কবিদত্ত—ভাগ্যদেবীর প্রসন্নতায় তিনি দেবাদিত্যের বংশ-মর্য্যাদা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তৎকালে বঙ্গের সিংহাসনে লক্ষ্মণ সেন অধিষ্ঠিত ছিলেন। কবিদত্ত পৈতৃক বাসভূমিতে ফিরিয়া আসিয়া বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়া উঠেন,—বিষয় বৈভবও যথেষ্ট অর্জ্জন করিয়া রাজ সরকার হইতে তৎকালের মহাসম্মানিত খাঁ * উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, দত্তবাটীর খাঁ নামেই তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার ছয় পুত্র ছিল, তাঁহাদের মধ্যে ঈশ্বর দত্তই সমধিক কৃতী ছিলেন, তাঁহার পিতামহ কুলপতির ন্যায় তাঁহারও আট পুত্র এবং নয়টী কন্যা ছিল। পুত্রদের মধ্যে কিশু (কেশব) এবং বিষু (বিষ্ণু) সমধিক প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তিশালী। কেশব হইতেই পাটুলী বংশের উদ্ভব। বিষু তদানীন্তন মুসলমান নবাব সরকারে উচ্চ রাজপদলাভে দিনাজপুর জেলায় প্রভূত ভূসম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। অবস্থার উন্নতির সহিত তিনি "ঠাকুর মহাশয়" উপাধি লাভ করেন। শ্রীমন্ত নামে এক পুত্র রাখিয়া তিনি পরলোক বাস করেন। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর

---

* হিন্দু রাজত্বে খাঁ উপাধির কথা এই প্রথম শুনা গেল। উহা পারস্য ভাষার শব্দ বলিয়াই মনে হয়। তখন এদেশে মুসলমান প্রভাব ছিল না।

শেষভাগে বিষু মুসলমান নবাব সরকারে কানুনগোগিরি পাইয়া প্রবল প্রতাপান্বিত হইয়া উঠেন। তখন বঙ্গদেশের রাজধানী রাজমহলে ছিল। তাঁহার একমাত্র পুত্র পিতার জীবদ্দশাতেই ইহলোকলীলা সম্বরণ করেন, এজন্য আপনার জীবদ্দশাতেই বিষু আপন জামাতা হরিরাম ঘোষ নামে এক কুলীন কায়স্থ সন্তানকে আপনার সমস্ত সম্পত্তি দান করিয়া যান। তাঁহার দুই পুত্র ছিল। তাঁহাদের মধ্যে শুকদেব পিতৃ সম্পত্তির অধিকার লাভ করিয়া বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়াছিলেন। নবাব তাঁহাকে রাজা উপাধি দান করিয়াছিলেন। সন ১০৬৩ সালে বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা সা সুজার নিকট তিনি এক সনন্দ পাইয়াছিলেন। খৃঃ ১৬৭৭ অব্দে শুকদেব আপনার নামানুসারে শুকসাগর নামে এক দীর্ঘিকা খাত করাইয়াছিলেন, যদ্দ্বারা তাঁহার নাম অদ্যাপি স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। তিনি খৃঃ ১৬৪৪ অব্দ হইতে খৃঃ ১৬৮১ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহাকে দিয়াই দিনাজপুর রাজবংশের পত্তন।

তাঁহার প্রথম পুত্র রামদেব তাঁহার জীবিতাবস্থায় পরলোকবাসী হইলে কনিষ্ঠ জয়দেব রাজ্যাধিকার লাভ করেন, তিনি অল্প দিন মধ্যে গতাসু হইলে তৎকনিষ্ঠ প্রাণনাথ পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার ঔরসপুত্র না থাকায় রামনাথকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। তিনি পৈতৃক জমিদারীর অনেক বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহাকে বার্ষিক পাঁচ লক্ষ টাকা সরকারী রাজস্ব দিতে হইত। বহুল সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা তিনি মহারাজ উপাধি লাভ করেন। তাঁহার পর আমরা মহারাজা তারকনাথের নাম দেখিতে পাই, তাঁহার পুণ্যপ্রাণা পতিব্রতা সহধর্ম্মিণী ৺মহারাণী শ্যামমোহিনী নিরপত্যতা হেতু যে

পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন তিনিই এখন দিনাজপুর রাজবংশের নাম উজ্জ্বল করিয়াছেন, তাঁহার সুনাম সুযশ দেশে বিদেশে প্রকটিত, তিনি বঙ্গদেশের রত্নস্বরূপ। বিষুর দুই ভ্রাতার মধ্যে শেষোক্তের পরিচয় দেওয়া হইল, অতঃপর কিশু বা কেশবের কথা বলিব। তিনিও সাধারণ পুরুষ ছিলেন না, ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহারও প্রতি সুপ্রসন্ন ছিলেন।

কেশবের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র দ্বারকানাথ পৈতৃক সম্পত্তির অধিকার লাভ করিয়া দেখিলেন যে মুকসুদাবাদের নবাবের অত্যাচারে হিন্দুগণ জর্জ্জরীভূত। এই রাজাত্যাচার হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য তিনি বৰ্দ্ধমান জেলার বৰ্ত্তমান কটোয়া মহকুমার অন্তর্গত পাটুলী গ্রামে উপনিবিষ্ট হইলেন। পাটলী সুজলা জহ্নুতনয়ার পশ্চিম তীরবর্ত্তী। দ্বারকানাথ তথায় সুরম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিয়া সুখে বাস করিতে লাগিলেন। কালক্রমে দ্বারকানাথের অপূর্ব্ব অট্টালিকা গঙ্গার গর্ভগত হইয়া যায়। দ্বারকানাথের পৌত্র সহস্রাক্ষ অতিশয় ধার্ম্মিক ও সৎক্রিয়াশীল ছিলেন। খৃঃ ১৫৭৩ অব্দে দিল্লীর পাতসাহ আকবর সাহের সনন্দ দ্বারা তিনি নদীয়া জেলার ফৈজুল্লাপুর পরগণার জমিদার বলিয়া অভিহিত হয়েন। তৎকালের জমিদারেরা আপনাপন অধিকার মধ্যে ফৌজদারী ও দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচার করিতেন, সৈন্য সেনাপতি রাখিতেন, আপনাপন বাসস্থান নির্ম্মাণ জন্য বাড়ীর চতুৰ্দ্দিকে গড় খাত করিতেন।

সহস্রাক্ষের পুত্রের নাম উদয়—তিনি একজন প্রতিভাশালী ও বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন জমিদার ছিলেন। দিল্লীর সম্রাট আকবর সাহের নিকট তিনি "রায়" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

উদয়ের চারি পুত্র ছিল। তন্মধ্যে জয়ানন্দ অন্যান্য সকলের নিরপত্যতা প্রযুক্ত সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। তৎকালে দিল্লীর সিংহাসনে জাহাঙ্গীর সমাসীন। জয়ানন্দ তাঁহার নিকট হইতে কোন রূপ অনুগ্রহ প্রাপ্ত না হইলেও তৎপুত্র সাহাজেহান সিংহাসন লাভ করিয়া তাঁহাকে মজুমদার উপাধি দান করেন। সেকালের মজুমদার যেমন-তেমন পদ নহে—একটী সমগ্র সরকারের জমানবীশ। তৎকালে সরকার সপ্তগ্রামের মজুমদার ছিলেন ভবানন্দ। তজ্জন্যই তিনি ভবানন্দ মজুমদার নামে খ্যাত। জয়ানন্দ মজুমদার "কোট এক্তিয়ারপুর পরগণা" জায়গীর স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বঙ্গের তদানীন্তন নবাব কাশিম খাঁ জুয়ানী প্রভুর দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া তাঁহাকে কানুনগো নিযুক্ত করেন। কানুনগোগণের নির্দ্দিষ্ট বেতন ছিল না, রুসম বা কমিশন পাইতেন। জমির নিরিখ ধার্য্য করাই তাঁহাদের প্রধান কাজ ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষাশেষি জয়ানন্দ পরলোক প্রাপ্ত হয়েন।

তাঁহার পাঁচ পুত্র ছিল। তাঁহাদের মধ্যে রাঘব সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। তিনি পিতৃধনের অধিকারী হইয়া খৃঃ ১৬৪৯ অব্দে দিল্লীর সম্রাট সাজাহানের নিকট হইতে চৌধুরী এবং তৎপরবৎসর মজুমদার উপাধি লাভ করেন। রাঘবের প্রচুর ভূসম্পত্তি ছিল, দিল্লীর সম্রাট তাঁহাকে প্রচুর নিষ্কর জমি তদতিরিক্ত নিম্নোক্ত একুশটী পরগণার জমিদারী স্বত্ব দিয়াছিলেন। যথা—আর্ষা, হালদহ, মামদানীপুর, পাজনোর, বোরো, সাহাপুর, জাহানাবাদ, সায়েস্তা নগর, সাহানগর, রায়পুর কোতোয়ালি, পাউনন, খোসালপুর, মইয়াট, বক্সবন্দর (হুগলী), হাবেলি সহর, পাইকান, মজফরপুর, হাতীকান্দা, সেলিমপুর, আমিরাবাদ এবং জঙ্গলিপুর। ইহাদের আয়তন প্রায় সাত

শত বর্গমাইল—বড় কম নহে। একটা বড় রাজার রাজ্য। এইসকল পরগণার অধিকাংশই সরকার সাতগাঁয়ের অন্তর্গত বলিয়া তাহাদের সুবন্দোবস্ত জন্য রাঘবকে সপ্তগ্রামের (হুগলীর) নিকটবর্ত্তী স্থানে বাস করিতে হইল। তৎকালে হুগলীই নিম্ন বঙ্গের রাজধানী ছিল। বাঁশবেড়িয়াই তাঁহার মনোনীত হইল। তিনি বৎসরের মধ্যে অনেক সময় এখানে থাকিয়া জমিদারী কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন, কেবল পূজার সময় পৈতৃক বাসভূমি পাটুলী যাইতেই হইত। রাঘব একজন সুবিখ্যাত এবং বৈভবশালী জমিদার ছিলেন। একমাত্র আর্ষা পরগণার হস্তবুদ দুই লক্ষ টাকার উপর ছিল, সরকারী রাজস্ব দিয়া যাহা বাকী থাকিত তাহাই সুপ্রচুর। রাঘব সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন পুণ্যধর্ম্মে তাঁহার বলবতী প্রবৃত্তি ছিল।

রাঘব রায় চৌধুরীর দুই পুত্র—রামেশ্বর এবং বাসুদেব। কিছুদিন তাঁহাদের দুই জনের বিলক্ষণ সৌহার্দ্দ্য ছিল, পরে আর সেরূপ রহিল না, পারিবারিক কলহে ভ্রাতৃবিচ্ছেদ ঘটিল। বিপুল বিস্তৃত পৈতৃক সম্পত্তি বিভক্ত হইল। জ্যেষ্ঠত্বের সম্মানস্বরূপ রামেশ্বর ৳ অংশ এবং বাসুদেব ৳ অংশ পাইলেন। অগ্রজ পাটুলীর পৈতৃক বাসভূমি পরিত্যাগ করিয়া বাঁশবেড়িয়ায় বাস করিলেন, এবং বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, কায়স্থ পরিবারকে আনিয়া বাঁশবেড়িয়ায় সংস্থাপিত করিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে অন্যান্য অনেক জাতীয় লোক আসিয়া তথায় বসবাস করিল। পল্লী বিভাগ করিয়া রামেশ্বর তাঁহাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। কতকগুলি মুসলমান আসিল। তাহারা রাজ বাড়ীতে দরোয়ানী ও জমাদারের কাজ করিতে লাগিল।

বারাণসী হইতে ন্যায় সাংখ্যাদি দর্শন এবং সাহিত্যালঙ্কারে পারদর্শী বহু ব্রাহ্মণ এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলে তাঁহারা আপনাপন অধীত বিদ্যার অধ্যাপনার জন্য তাঁহার সাহায্যে চতুষ্পাঠী সংস্থাপিত করিলেন। ঐ সকল পণ্ডিতের মধ্যে রামশরণ তর্কবাগীশ সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ছিলেন, তাঁহার বংশধরেরা অদ্যাপি পূর্ব্ব পুরুষের ন্যায় অধ্যাপনা করিয়া আসিতেছেন। মুসলমান রাজত্বে নানা বিষয়ে বিশৃঙ্খলা ছিল, সুবিধা মত সকল জমিদারের নিকট প্রাপ্য রাজস্ব নিয়মিতরূপে আদায় হইত না, কেহ কেহ বা অবাধ্যতা প্রকাশে রাজস্ব আদায় দিত না রামেশ্বর তদ্রূপ অবাধ্য অবশীভূত জমিদারদিগের বিরুদ্ধে সৈন্য চালনা দ্বারা তাহাদের জমিদারী হস্তগত করিয়া সম্রাটকে রীতিমত রাজস্ব পাঠাইয়া দিতেন। সম্রাট আওরঙ্গজেব হিন্দুদ্বেষী হইলেও গুণের মর্য্যাদক ছিলেন, খৃঃ ১৬৭৩ অব্দে তাঁহাকে পাঞ্জাপার্চা খেলাত সহ "রাজা মহাশয়" উপাধি অর্পণ করিলেন, এই সম্মানসূচক উপাধি ব্যক্তিগত ছিল না পুরুষানুক্রমিক, তাই তাঁহার বংশধরেরা অদ্যাপি "রাজা মহাশয়" উপাধি ভূষিত আছেন। সেই সনন্দের ইংরাজী অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

TO RAJA RAMSWAR RAI MAHASAY,

Paragana Arsha of Satgaon.

(Government of Satgaon.)

As you have promoted the great interest of Government in getting possession of Perganas and making assessment thereof, and as you have performed with care whatever services were entrusted to you, you are entitled to reward. The Khelat

of Panja Percha (five cloths *i.e.* dresses of honour) and the title of "Raja Mahasay" are therefore given to you in recognition thereof, to be inherited by the eldest children of your family, Generation after Generation, without being objected to by any one. 10 Safar. 1090 Hijar.

ইহাতে দিল্লীর সম্রাট সা গাজি আলামগীরের শীল মোহর ও পাঞ্জা সহী আছে। মূল সনন্দখানি পারস্য ভাষায় লিখিত। ভারতীয় সিবিল সার্ভিসের হেনরি বিভারিজ একজন পারস্যভাষাবিৎ—উপরি লিখিত ইংরাজী অনুবাদ খৃঃ ১৯০২ অব্দে ৫ই ফেব্রুয়ারি এসিয়াটিক সোসাইটীর তদানীন্তন প্রেসিডেণ্ট ও লেঃ গঃ সার জন উড্‌বারণ এম, এ, কে, সি, এস, আই মহোদয়ের অনুমতি অনুসারে প্রকাশ করিয়াছেন। ১০৯০ হিজিরায় আর একখানি সনন্দ দ্বারা রাজা রামেশ্বর রায় মহাশয়কে বসবাসের জন্য ৪০১ বিঘা নিষ্কর জমি এবং নিম্নোক্ত বারটী পরগণার জমিদারী স্বত্ব প্রদত্ত হইয়াছিল। যথা—কলিকাতা, খাড়ষা, আমিরপুর, বালন্দা (মেদিনীপুর জেলায়) খালোড় হাওড়া জেলায় (বাঘননের নিকট) মানপুর, * সুলতান পুর, হাতিয়াগড়, মেদমোল্লা, কুজপুর, কাউনিয়া এবং মাগুরা।

এই সময় এদেশে বর্গীর হাঙ্গামা উপস্থিত হয়। বর্গীরা মহারাষ্ট্র বাসী। শিবাজীর সময় হইতে তাহারা এদেশের সর্ব্বত্র রাজস্বের এক চতুর্থাংশ দাবি করিত, তজ্জন্য ইহার নাম চৌথ, এই চৌথ না পাইয়া তাহারা পঙ্গপালের ন্যায় দলে দলে আসিয়া দেশ লুণ্ঠন

* মানপুর নহে—মানকুর হইবে, ইহা হাওড়া জেলায় এবং রূপনারায়ণ নদের তীরে।

করিত, যাহার যে কিছু থাকিত সর্ব্বস্ব লুঠিয়া লইয়া যাইত, কেহ বাধা দিতে উদ্যত হইলে তাহার প্রাণ নষ্ট করিত, বঙ্গের নিরীহ প্রজা তাহাদের উৎপীড়নে যার পর নাই সন্ত্রস্ত থাকিত। বর্গীর হাঙ্গামার বিস্তৃত বিবরণ যথাস্থানে লিপিবদ্ধ হইবে।

রাজা রামেশ্বর বর্গীর হাঙ্গামায় নিরাপদ থাকিবার জন্য এক মাইল পরিধি বিশিষ্ট গড়খাত রাজবাটীর চতুর্দ্দিকে খনন করাইয়াছিলেন তজ্জন্য ইহার নাম হয় গড়বাড়ী অর্থাৎ গড়বেষ্টিত বাড়ী। ইহার মধ্যে একটী সুদৃঢ় দুর্গও রচিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে বহুসংখ্যক অস্ত্রধারী সৈন্য ঢাল তলোয়ার তীর ধনু বন্দূক লইয়া অবস্থিতি করিত। দ্বদশটা কামানও থাকিত। দুর্গ প্রাকার অত্যুচ্চ এবং কণ্টকাকীর্ণ তরুলতা দ্বারা পরিবেষ্টিত। বর্গী আসিয়া ত্রিবেণীর নিকট উপস্থিত হইলেই অধিবাসীরা গড়বাড়ীতে আসিয়া প্রাণ বাঁচইত।

রাজা রামেশ্বর পরম ভাগবৎ ছিলেন। ভগবানে তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল। কোন দেব-দেবীই তাঁহার অপূজ্য ছিলেন না। সকলের প্রতি সমান ভাব ছিল—তবে বিষ্ণুভক্তি প্রবলা। ১৬০১ শাকে (খৃঃ ১৬৭৯ অব্দে) তিনি এক অতিসুন্দর-বিষ্ণুমন্দির নিম্মাণ করাইয়াছিলেন, তাহার কারুকার্য্যের তুলনা হয় না। বঙ্গদেশে ইহার তুল্য দেবমন্দির আর কোথাও দেখা যায় না। মন্দির গাত্রে যে সকল ইষ্টক সংলগ্ন আছে তাহার এক এক খানিতে দেব দেবীর মূর্ত্তি অতি সুন্দরভাবে খোদিত। বাস্তবিকই সেগুলি স্থপতিবিদ্যাপারদর্শিতার উৎকৃষ্ট পরিচয়। এই মন্দিরের দ্বার দেশের উপরিভাগে নিম্নোক্ত শ্লোকটী খোদিত আছে।—

মহীব্যোমাঙ্গ শীতাংশু গণিতে শক বৎসরে *।
শ্রীরামেশ্বর দত্তেন নির্ম্মমে বিষ্ণুমন্দিরং। ১৬০১

মন্দির প্রতিষ্ঠার বিনীত ভাব অতি প্রশংসনীয়—তিনি বিপুল বিত্তশালী, মহাযশস্বী এবং প্রবল পরাক্রান্ত হইয়াও শ্লোকটীতে আপনার "রাজা মহাশয়" উপাধির উল্লেখ না করিয়া বংশোপাধি "দত্তই" লিখিত করাইয়াছেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রামেশ্বর দিব্যধাম লাভ করেন। তৎকালে তাঁহার তিন পুত্র বর্ত্তমান ছিলেন। রঘুদেব, মুকুন্দ এবং রামকৃষ্ণ। ভ্রাতৃত্রয় অবিভিক্ত সম্পত্তিভোগে সম্মত হইলেন না, পৃথক হইলেন। বংশের প্রচলিত প্রথানুসারে জ্যেষ্ঠত্বের সম্মান-স্বরূপ রঘুদেব পৈতৃক সম্পত্তির অর্দ্ধেক—অপর দুই ভ্রাতা বাকী অর্দ্ধেক সমানাংশে পাইলেন অর্থাৎ রামেশ্বর মূল সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ পাইয়াছিলেন তাহারই অর্দ্ধেক অর্থাৎ এক তৃতীয়াংশ রঘুদেব এবং অপর দুই ভ্রাতায় অবশিষ্ট এক তৃতীয়াংশ সমান ভাগে পাইয়াছিলেন।

এই সময়ে মুর্শীদকুলি খাঁ বঙ্গদেশের সুবদার ছিলেন। তিনি নানা স্থানের ফৌজদারের ক্ষমতা হ্রাস করিয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে আপনার অধীন করিয়াছিলেন; অনেক জমিদারই মাথা তুলিয়া উঠিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদেরও অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতে ছাড়েন নাই। অনেকের সঙ্গেই নূতন বন্দোবস্তের ব্যবস্থা করিতে থাকেন। প্রায় সকলের নিকট হইতেই রাজস্বের জামিন

* মহী—অর্থে ১ ব্যোম ০ অঙ্গ ৬ এবং সিতাংশু স্থলে শীতাংশু (ভাস্কর প্রমাদ) অর্থে ১—অঙ্কস্য বামা গতি প্রথানুসারে ১৬০১ শাক (খৃঃ ১৬৭৯ অব্দ)।

গ্রহণ করিতে এবং যাঁহারা তাহা না দিতে পারিতেন, তাঁহাদের জমিদারী কড়িয়া লইয়া অন্যের সহিত বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। এতদ্দ্বারা সরকারী রাজস্ব যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইল। বাকীদার জমিদারগণকে তিনি বড়ই উৎপীড়ন করিতেন—কারাগারে আবদ্ধ করিয়া এবং খাইতে না দিয়া অনশন উপবাসে রাখিতেন, দুর্বাক্য বলিতেন, ধিকার দিতেন, নির্য্যাতনের কিছুই বাকী রাখিতেন না। তাহাতেও যদি নিয়মমত রাজস্ব আদায় না হইত, তাহা হইলে বাকীদার জমিদারকে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া মূত্রপুরীষাদিপূর্ণ বৈকুণ্ঠ নামক খাতের উপর দিয়া এক দিক হইতে অন্য দিকে টানিয়া লইয়া যাওয়া হইত। ইহাতে কেবলমাত্র অবমাননা নহে হিন্দুর জাতিধর্ম্মে আঘাতও লাগিত। একদা এক ব্রাহ্মণ জমিদার বাকী খাজনার দায়ে এই দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রঘুদেব রায় মহাশয় এই ব্রহ্মনির্য্যাতন বার্ত্তা অবগত হইয়া তাঁহার বাকী রাজস্ব সমস্ত নবাব সরকারে আদায় দিয়া ব্রাহ্মণ জমিদারের জাতিধর্ম্ম ও প্রাণ বাঁচাইয়াছিলেন। নবাব রাজস্ব আদায়ে যতই নিষ্ঠুর ও নির্য্যাতক হউন যখন তিনি রঘুনাথ রায় মহাশয়ের এই অসাধারণ বদান্যতার কথা শুনিলেন তখন তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া "শূদ্রমণি" উপাধি দ্বারা তাঁহার সদাশয়তার পুরস্কার করিলেন। তদবধি রাজা রঘুনাথ রায় "শূদ্রমণি" বলিয়া সর্ব্ব সাধারণে পরিচিত হইলেন। কেহ কেহ বলিয়া থাকে শূদ্রমণি উপাধি পাটুলীর জমিদার মনোহর রায়ের অর্জ্জিত। বস্তুগত্যা তাহা নহে। *

---

* "বাঁশবেড়িয়া—রাজ" নামক গ্রন্থে শ্রীযুক্ত শম্ভু চন্দ্র দে সপ্রমাণ করিয়াছেন যে শূদ্রমণি উপাধি রাজা রঘুদেবের নিজস্ব।

রঘুদেব বহু সংকীর্ত্তি দ্বারা আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া অনেক ব্রাহ্মণকে নিষ্কর ভূসম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন।

রঘুদেবের একমাত্র পুত্র গোবিন্দ দেব রায় মহাশয়। পিতৃ-বিয়োগে তিনি পিতৃপরিত্যক্ত সম্পত্তির অধিকার লাভ করিয়া পিতৃ-দৃষ্টান্তের অনুসরণ দ্বারা অনেক ব্রহ্মোত্তর ভূমি দান করিয়াছিলেন, বেশীদিন বাঁচিয়া থাকিলে আরও অধিক দান করিতেন কিন্তু নির্ম্মম কাল অল্প বয়সেই তাঁহাকে আপনার করাল কবলস্থ করিয়া তাঁহার সমস্তই ফুরাইয়া দিয়াছিল। খৃঃ ১৭৪০ অব্দ এই দুর্ঘটনার কাল। তাঁহার রাজত্বকালে তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষের প্রতিষ্ঠিত অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ বিগ্রহ নদীয়ারাজের অধিকারস্থ হয়েন। ব্যাপার এই যে, প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে অগ্রদ্বীপের মেলায় বহু সংখ্যক যাত্রীর সমাগম হয়, বিপুল জনতার মধ্যে ৫।৬টী যাত্রী একবৎসর মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মুর্শিদাবাদের নবাব এই সংবাদ অবগত হইয়া বড়ই বিরক্ত হইয়া অগ্রদ্বীপ কাহার জমদারী-ভুক্ত জানিবার জন্য অনুসন্ধান করেন। নবাবের বিরাগভাজন হইবার ভয়ে পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের জমিদারের কর্ম্মচারীগণ কেহই স্বীকার করিলেন না যে, অগ্রদ্বীপ তাঁহার প্রভুর জমিদারী। তৎকালে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পিতা রঘুনাথ রায় নদিয়ায় রাজত্ব করিতেন, তাঁহার কর্ম্মচারী উহাকে কৃষ্ণনগর রাজের অধিকৃত বলিয়া বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া এবং বিপুল জনতার প্রতিরোধ অসম্ভব ও অপ্রতি-কার্য্য বলিয়াই এরূপ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, নতুবা চেষ্টার কোন ত্রুটী হয় নাই, নবাবকে বুঝাইয়া দেওয়ায় তিনি রাজকর্ম্মচারীকে ভবিষ্যতে সতর্ক করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। নদিয়ার রাজা আপন কর্ম্মচারীকে প্রভূত পুরস্কার দিয়া মহাসমারোহে এই স্থান

দখল করিলেন। ইহা খৃঃ ১৭২৯ অব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা—কারণ এই বৎসরেই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পিতৃবিয়োগ হয়।

রাজা গোবিন্দ দেবের স্বর্গারোহণ কালে তাঁহার পত্নী অন্তঃস্বত্বা ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর তিন মাস পরে রাণী এক পুত্র সন্তান প্রসব করেন। কিন্তু গোবিন্দদেবের নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুর কথাই সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। এই সুযোগে বর্দ্ধমান রাজ্যের পেস্কার মাণিকচাঁদ মুর্শিদাবাদের নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর দরবারে বাঁশবেড়িয়ার রাজা গোবিন্দদেবের অনপত্য অবস্থায় মৃত্যুর সংবাদ দিয়া তাঁহার ত্যক্ত সম্পত্তি ১১৪৮ সালে (খৃঃ১৭৪১ অব্দে) বর্দ্ধমান রাজষ্টেট ভুক্ত এবং নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও হল্‌দা পরগণা বলপূর্ব্বক স্বাধিকার ভুক্ত করিয়া লয়েন, মজকুরী তালুক মৌজা কুলীহাণ্ডা হুগলীর ফৌজদার পীর খাঁর যত্নে হস্তান্তরিত হইতে পায় নাই।

গোবিন্দ দেব রায় মহাশয়ের এই পুত্রের নাম নৃসিংহ দেব রায় মহাশয়। তিনি আপনার স্মারক লিপিতে এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন "সন ১১৪৭ সালের মাহ আশ্বিনে আমার পিতা গোবিন্দ দেব রায়ের কাল হয়, সেকালে আমি গর্ভস্থ ছিলাম, বর্দ্ধমানের জমিদারের পেস্কার মাণিকচন্দ্র নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর নিকট আমার পিতার অপুত্রক কাল হইয়াছে খেলাপ জাহির করিয়া আমার পুস্ত পুস্তামের জর খরিদা সনন্দী জমিদারি আপন মালিকে জমিদারি সামিল করিয়া লয়। সন ১১৪৮ সালে মাহ বৈশাখে খামকা দখল করে ও হলদা পরগণা কিশমতের মালগুজারি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র

রায়ের সামিল ছিল। তিনিও ঐ সন কিশতম মজকুর আপন পুত্র শ্রীশম্ভু চন্দ্র রায়ের তালুকের সামিল করিয়া দখল করেন। মৌজে কুলিহাণ্ডা মজকুরি তালুক হুগলী চাকলার সামিল ছিল। পীরখাঁ ফৌজদার বর্দ্ধমানের জমিদারকে দখল দিলেন না, অতএব তালুক মজকুর আমার দখলে আছে। সুবে বাঙ্গালার কোন জমিদার ও তালুকদারের পর এমন বেইনসাজী ও বেদায়ত হয় নাই।"

নাবালগ নৃসিংহ দেবের পক্ষসমর্থন করিবার কেহই না থাকায় তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি বিনা আপত্তিতে ১৭৪২ অব্দে কতক বর্দ্ধমান রাজষ্টেট এবং কিয়দংশ কৃষ্ণনগর রাজষ্টেটের অন্তর্গত হইয়া যায়। নৃসিংহ দেবের জন্ম সংবাদ এখন পর্য্যন্ত সাধারণে জানিতে পারে নাই বা মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারেরও সুগোচর হয় নাই।

ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সিলেক্ট কমিটীর পঞ্চম রিপোর্টে বাঁশবেড়িয়া জমিদারী রাজা গোবিন্দ দেবের বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে বস্তুতঃ সেই সময় নৃসিংহ দেব পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। উক্ত রিপোর্টে বাঁশবেড়িয়া রাজসম্পত্তির যে বিবরণ লিখিত আছে তাহা সরকার সপ্তগ্রামের অন্তর্গত চাকলা হুগলীর অন্তর্নিবিষ্ট ছিল—তাহা এইরূপ।

আর্ষাকিশমত	...	...	৮৩৭৮৲
হাবেলীসহর	...	...	১৯২০৲
সেলিমপুর	...	...	৫৫৭৪৲
মহম্মাদামীনপুর	...	...	১২৩৯৪৲
হেঞ্জরাখালী	...	...	৯২৲

আবওয়াব ফৌজদারী	...	৩০৯১৲
ফৈজুল্লাপুর	... ...	২৭২৲
খরাড় জায়গীর সরকার	...	৮৬২৩৲—৯৭৫২৲
বোরো	... ...	১৯৫৭৲
পাউনান	... ...	২০৩৬২৲
ঔহর	... ...	৪০৬৬৲
সায়েস্তানগর	... ...	৫২১৫৲
ছুটীপুর	... ...	২৭৬৯৲
পাইঘাটী	... ...	৩৮৲

যদিও ঐ সমস্ত সম্পত্তি হুগলী চাকলার অন্তর্গত কিন্তু কোনটীই হুগলীর ফৌজদারের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অধীন বলিয়া মনে হয় না। অতি বড় আর্ষা পরগণা ভাঙ্গিয়া বোরো পরগণার কতক অংশ লইয়া মহম্মদামীনপুর জমিদারীর পত্তন হইলে আর্ষাকিসমত গোবিন্দ দেবের পিতা রঘুদেবের সম্পত্তির অংশগত হইয়াছিল। হাবেলী সহর গঙ্গার পরপারে হইলেও চাকলা হুগলীর অন্তর্গত এবং গঙ্গার উভয় পারেই উহার অধিকার বিস্তার পাইয়াছিল। মহম্মদামীনপুর সম্ভবতঃ একটী পৃথক জমিদারী বলিয়া অনুমান হয়। হুজুরীখালী কোথায় ছিল জানা যায় নাই। খরাড় জায়গীর * এবং ঔহর সম্বন্ধেও কিছু নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তদ্ব্যতীত নদীয়ার অন্তর্গত হালদা পরগণা বাঁশবেড়িয়া রাজের অন্তর্গত হইলেও রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাহা বেদখল করেন।

---

* মেদিনীপুর জেলার ঘাটালের নিকট খরাড় গ্রাম আছে।

বাঁশবেড়িয়া জমিদারী বঙ্গদেশের মধ্যে একটী সুবিস্তৃত ও সুপ্রসিদ্ধ হইলেও মুসলমান রাজত্বের শেষে অতি ক্ষুদ্রাকারে পরিণত হইয়াছিল। ইহাতে মালিকের বা তাঁহার কর্ম্মচারিগণের কাহার কোন ত্রুটী ছিল না, খাজনাও বাকী পড়ে নাই—কেবল নাবালগের সম্পত্তির উপযুক্ত তত্ত্বাবধায়ক না থাকায় এরূপ ঘটিয়াছিল। নৃসিংহ দেব শৈশবাবস্থায় সহায়হীন, কোথায় তিনি আত্মীয়স্বজনগণের আনুকূল্য পাইয়া পৈতৃক সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন, তাহা না হইয়া, তাঁহাকে কেবলমাত্র লাট কুলিহাণ্ডার আয়ের উপর নির্ভর করিয়া বহুব্যয়সাধ্য দেবসেবাদি এবং সাংসারিক খরচপত্র নির্ব্বাহ করিতে হইয়াছিল। এই সময়ে মুসলমানের ভাগ্যলক্ষ্মীও চঞ্চলা হইয়াছিলেন—বর্গির হাঙ্গামায় নিম্নবঙ্গের প্রায় সর্ব্বত্রই অরাজকতা, বৃদ্ধ নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ তাহাদের চৌথের দায়ে অব্যাহতি লাভের বহু চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। খৃঃ ১৭৫৬ অব্দে তিনি আদুরে দৌহিত্র সিরাজ উদ্দৌলার হাতে এই বিশাল বঙ্গের রাজ্যভার অর্পণ করিয়া পরলোক বাস করিলেন। সিরাজ উদ্দৌলার শাসনের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের বহু বিশৃঙ্খলা—যিনি যাহাই বলুন যদি মুসলমান ঐতিহাসিকের কথা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে যে মাতামহ তাঁহাকে প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তর জ্ঞান করিতেন, সকল রকম অবৈধ অত্যাচারে প্রশ্রয় দিতেন সেই আলিবর্দ্দির প্রাণহানির জন্য যিনি প্রস্তুত হইতে পারেন, তাঁহার অসাধ্য কার্য্য নাই—তাঁহার দ্বারা সবই হইতে পারে। এই সময় শ্বেতদ্বীপের সৌভাগ্যবান শ্বেতাঙ্গ বণিকেরা সুযোগ বুঝিয়া স্বার্থ সাধনের উপায় দেখিতে লাগিলেন, ভাগ্যক্রমে তাঁহাদের চেষ্টা ফলবতী হইল। এই সময়ে রাজা নৃসিংহ দেবের বয়ঃক্রম

সতের বৎসর মাত্র। পৈতৃক সম্পত্তির উদ্ধার সাধনের জন্য বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া তিনি সময়ের উপর আপন অবস্থা নির্ভর করিলেন, এবং সংস্কৃত, পারস্য ও বাঙ্গালা ভাষার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া অল্পদিনেই ঐ সকল ভাষায় বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন হইলেন।

পলাশীর যুদ্ধে ইংরাজের জয়লাভ হইলেও সুচতুর ক্লাইবের দূরদর্শিতায় দেশের অবস্থা ভালরূপে না বুঝিয়া ইংরাজ স্বহস্তে রাজদণ্ড গ্রহণ করিলেন না। বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার সিংহাসনে নাম মাত্র মীরজাফরকে সংস্থাপিত করিয়া নবাবের হইয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। মুসলমান রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে বর্গীর হাঙ্গামা মিটিল বটে, কিন্তু ১৭৭০ অব্দে দুর্ভিক্ষ রাক্ষসী বিকট বদন বিস্তার করিয়া বহুল বঙ্গীয় প্রজার প্রাণসংহার করিল। বক্রী যাহারা রহিল তাহারা বাস্তভিটা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নানাস্থানে পলাইল। বঙ্গবিজয়ের পর ক্লাইব স্বদেশ যাত্রা করেন, কিন্তু বিলাতের ডিরেক্টর সভার অনুরোধে তাঁহাকে আবার এদেশে আসিতে হইয়াছিল। যে রাজ্য ক্লাইবের কৌশলে হস্তগত হইল সে রাজ্যের বন্দোবস্ত হইল ওয়ারেন হেষ্টিংসের হাতে—তিনি খৃঃ ১৭৭১ অব্দে বঙ্গদেশের শাসন কর্ত্তৃত্বলাভ করিয়া পর বৎসর যে আইন (Regulating Act) পাশ করাইলেন তদ্দ্বারা তিনি ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল হইলেন, চারিজন সভ্য সমন্বিত একটী সভা সংস্থাপিত হইল, সেই সভার সাহায্যে গবর্ণর জেনেরল এ দেশের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন এরূপ ব্যবস্থা হইল। বিচার-কার্য্যের জন্য ইহার সঙ্গে সঙ্গেই সুপ্রীম কোর্টের প্রতিষ্ঠা হইল, তাহাতে একজন প্রধান বিচারপতি Chief Justice ও তিনজন পিউনি

জজের আসন পড়িল। প্রধান কৌন্সিলের চারিজন সভ্যের মধ্যে কর্ণেল মনসন, জেনেরল ক্লেভারিং, ফিলিপ ফ্রান্সিস বিলাত হইতে আসিলেন, অবশিষ্ট রিচার্ড বারোয়েল পূর্ব্বাবধি এদেশেই ছিলেন। সার্ ইলাইজা হুম্পে, সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হইলেন কিন্তু ইহাতে যে সুব্যবস্থার আশা করা গিয়াছিল তাহা ব্যর্থ হইল। বিলাত হইতে যে তিনজন সভ্য আসিয়াছিলেন তাঁহারা সকল কাজেই হেষ্টিংসের প্রাধান্যনাশের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তাহাতে বড়ই বিশৃঙ্খলা জন্মিল, রাজা নৃসিংহ দেবকে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করিতে হইল।

মন্ত্রীসভার ক্লেভারিং ও মনসনের মৃত্যু হইলে হেষ্টিংসের অক্ষুণ্ণ আধিপত্য সংস্থাপিত হইল, রাজকার্য্যও অনেকটা শৃঙ্খলাবদ্ধ হইল দেখিয়া রাজা নৃসিংহ দেব স্বয়ং ওয়রেণ হেষ্টিংসের দরবারে পৈতৃক জমিদারীর উদ্ধার সাধনার্থ দরখাস্ত দাখিল করিলেন। ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ তদন্তের আজ্ঞা দিলেন, কিন্তু তখনও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এদেশের দেওয়ানী স্বত্বে সত্ত্ববানমাত্র অগত্যা গবর্ণর জেনেরল ২৪ পরগণার জমিদার রূপে রাজা নৃসিংহ দেবের পৈতৃক সম্পত্তির যেটুকু ২৪ পরগণার অন্তর্গত তাহাই তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিলেন। রাজা বাহাদুর আপনার দৈনিক লিপি মধ্যে তৎসম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন—"সন ১১৮৫ সালে গবর্ণর জেনেরল শ্রীযুক্ত মেস্তর হিষ্টীন সাহেব ও সাহেবান কৌষিল হক ইনসপ মতে তজরিজ তহকীক করিয়া আমার মিরাষ জানিয়া আমার পৈতৃক জমিদারীর মধ্যে যে সকল মহাল বর্দ্ধমান জমিদারের দখল হইতে চব্বিষ পরগণার সামিল হইয়াছিল সেই মহালতের জমিদারিতে ইস্তক সন ১১৮৬

সাল আমাকে সরফরাজ করিয়াছেন ও কৌষিল ও কমিট হইতে সনন্দ দিয়াছেন।"

ইহা দ্বারা নিম্নোক্ত পরগণাগুলি তাঁহার স্বাধিকার ভুক্ত হয় যথা—বারিদহাটী * এক্তিয়ারপুর, হাতিয়াগড়, মোবাই, নিমক ও ময়পাজা, ময়দা, মাগুরা, মানপুর এবং খোর্দ্দা।

নৃসিংহ দেব আপনি সুনাম সুখ্যাতি ও সাধারণ হিতকর কার্য্যের জন্য গবর্ণর জেনেরলের অনুগ্রহভাজন হইয়াছিলেন। রাজা নৃসিংহ দেব বহুগুণান্বিত ছিলেন। তিনি আরবী পারসী এবং সংস্কৃত ভাষা সুন্দর জানিতেন, আয়ুর্ব্বেদেও তাঁহার দখল ছিল, জ্যোতিষ ও উড্ডীশ তন্ত্রের বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন, সঙ্গীত বিদ্যায় বিলক্ষণ বিজ্ঞতা ছিল, এবং চিত্রাঙ্কণে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ওয়ারেণ হেষ্টিংসের অনুরোধে রাজা নৃসিংহ বঙ্গদেশের একখানি উৎকৃষ্ট মানচিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন, তদ্দর্শনে গবর্ণর জেনেরল যারপর নাই প্রীত হইয়া তাঁহাকে উপযুক্ত পুরস্কার দিয়াছিলেন, কিন্তু গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ তাহা স্বয়ং গ্রহণ করিয়া তদ্বিনিময়ে রাজা নৃসিংহ দেবকে ধানঘাটা পরগণা দিয়াছিলেন। তৎকালে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের অসাধারণ প্রতিপত্তি—তিনি যাহা মনে করিতেন, তাহাই করিতে পারিতেন। গঙ্গাগোবিন্দ পাইকপাড়া রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ—ওয়ারেণ হেষ্টিংশ তাঁহার নিকট পারস্য ভাষা শিখিয়াছিলেন। তাহার পর তাঁহার দেওয়ানি পাইয়া গঙ্গাগোবিন্দ অসাধারণ প্রতাপশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন।

---

* বারিদবাটী, ডায়মণ্ডহারবারের পশ্চিম বারুইপুর মহকুমার অন্তর্গত। ইহার মধ্যে বিষ্ণুপুর জয়নগর ও মগরাহাট সন্নিবিষ্ট।

খৃঃ ১৭৮৫ অব্দে ওয়ারেণ হেষ্টিংস বিলাতযাত্রা করিলে লর্ড কর্ণওয়ালিস এদেশের গবর্ণর জেনেরল হইয়া আইসেন। এখানে আসিয়া তাঁহাকে রাজস্ব বন্দোবস্তের জন্য এতই বিব্রত থাকিতে হইয়াছিল যে রাজা নৃসিংহ দেব তাঁহার অবশিষ্ট পৈতৃক সম্পত্তির পুনরুদ্ধারার্থ কোন কথা বলিবার সুযোগ পাইলেন না, কিয়দ্দিন পরে যখন তিনি বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া অন্যান্য বিষয়ে মনঃসংযোগ করিবার সুযোগ পাইলেন তখন রাজা নৃসিংহ তাঁহার নিকট পৈতৃক বিষয়ের কথা উত্থাপন করিলে লর্ড করণওয়ালিস রাজাকে বিলাতের ডিরেক্টর সভার নিকট আবেদন করিবার উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন তিনি তাঁহাকে সমুচিত সাহায্য করিবেন। কিন্তু এই কার্য্যে বহু অর্থ-ব্যয়ের সম্ভাবনা বুঝিয়া তিনি অর্থসঞ্চয় জন্য আপনার খরচ কমাইয়া দিলেন কিন্তু তাঁহাতেও কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া আপনার এক বিশ্বস্ত আত্মীয়ের হাতে জমিদারী কার্য্যের ভার দিয়া আপনি কাশী বাস করিলেন। এখানে থাকিয়া তিনি সাধু সন্ন্যাসীগণের সাহায্যে তান্ত্রিকমতে যোগাভ্যাস আরম্ভ করিলেন, উপযুক্ত গুরু পাইয়া অল্প দিনেই যোগশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভে সমর্থ হইলেন। শুধু ইহাই নহে ভুকৈলাসের রাজা গোকুলচন্দ্র ঘোষালের ভ্রাতুষ্পুত্র জয়নারায়ণ ঘোষাল এই সময়ে কাশীবাস করিতেছিলেন তিনি সংস্কৃত কাশীখণ্ডের বঙ্গানুবাদ করিবার জন্য মনস্থ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার কাব্য-রচনার শক্তিসামর্থ্য না থাকায় তিনি রাজা নৃসিংহ দেবের সাহায্য গ্রহণ করিলেন—দুই রাজায় মিলিয়া পবিত্র কাশীধামে কাশীখণ্ডের বঙ্গানুবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার পরিচয় এইরূপ—

মনে করি কাশীখণ্ড ভাষা করি লিখি।
ইহার সহায় হয় কাহারে না দেখি॥

মিত্র শত চৌদ্দশকে পৌষমাস যবে।
আমার মানস মত যোগ হইল তবে॥
শূদ্রমণি কুলে জন্ম পাটুলি নিবাসী।
শ্রীযুত নৃসিংহ দেব রায়াগত কাশী॥
তাঁর সহ জগন্নাথ মুখুয্যা আইলা।
প্রথম ফাল্গুনে গ্রন্থ আরম্ভ করিলা॥

*　　　*　　　*

তাহার করেন রায় তর্জ্জমা খসড়া।
মুখুর্য্যা করেন সদা কবিতা পাতড়া॥
রায় পুনর্ব্বার সেই পাতড়া লইয়া।
লিখেন পুস্তকে তাহা সমস্ত শুধিয়া॥

এই সময় নৃসিংহ দেবের কর্ম্মচারী তাঁহাকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে বিলাত্ত আপীদের টাকা মজুত হইয়াছে কিন্তু তখন নৃসিংহদেবের মন ধর্ম্ম কর্ম্মানুষ্ঠানে এতই অনুরক্ত হইয়াছিল যে তিনি পার্থিব বিষয় বৈভবের দিকে ফিরিয়াও চাহিলেন না, বাঁশবেড়িয়ায় এক দেবী মন্দির প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করিয়া সেখান হইতে মন্দির প্রস্তুতের জন্য প্রস্তরাদি উপকরণ খরিদ করিয়া—লইয়া আসিবার জন্য কর্ম্মচারীকে টাকা পাঠাইতে লিখিলেন, টাকা পৌছিলে তিনি সমস্ত জিনিষপত্র ক্রয় করিয়া মন্দির গঠনের উপযুক্ত স্থপতি কয়েকজনকে সঙ্গে দিয়া নৌকাযোগে বাঁশবেড়িয়ায় পাঠাইয়া দিলেন, পশ্চাৎ আপনি স্বদেশযাত্রা করিলেন। যে রকমে মন্দিরটী প্রস্তুত করিতে

হইবে তাহার যুক্তি তিনি আপনি আঁটিলেন। এই দেহরূপ মন্দিরে যেমন ঈড়া পিঙ্গলা সুষুম্না বজ্রাক্ষ ও চিত্রিনী নামে পাঁচটী নাড়ী আছে, মন্দিরটীতে সেইরূপ ধাঁছে, মন্দিরটীতে সিড়ি থাকিবে, মন্দির মধ্যে কুণ্ডলিনী শক্তিরূপে দেবী হংসেশ্বরী বিরাজ করিবেন। খৃঃ ১৭৯৯ অব্দে ডিসেম্বর মাসে রাজা বাহাদুর আট বৎসরের পর বাঁশবেড়িয়ায় ফিরিলেন, এবং বাড়ী পৌছিয়াই হংসেশ্বরীর মন্দিরের ভিত্তি পত্তন করিলেন। মন্দিরের দ্বিতীয় তলা গাঁথা হইলে খৃঃ ১৮০২ অব্দে রাজা নৃসিংহ দেব ভৌতিক দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গবাসী হইলেন। তাঁহার দুই পত্নীর মধ্যে জ্যেষ্ঠা অনুমৃতা হইলেন, এবং কনিষ্ঠা রাণী শঙ্করী স্বামীর অভিপ্রেত কার্য্য সকল সম্পন্ন করিবার জন্য জীবিত রহিলেন। রাজা নৃসিংহ দেব প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার সদ্‌গুণ রাশি তাঁহাকে চির-স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। তান্ত্রিক শাক্তধর্ম্মের তিনি একজন সিদ্ধ সাধক ছিলেন, বিদ্যাবুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তিতে তৎসময়ে তাঁহার সমতুল্য কেহই ছিল না। মৃত্যুকালে তিনি আপন পতিব্রতা পত্নী রাণী শঙ্করীর উপর বিষয়কার্য্য নির্ব্বাহের সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া যান। রাণীও বিশ্বস্ততার সহিত পতির অনুষ্ঠিত যাবতীয় কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া পতিপ্রাণতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। খৃঃ ১৮১৪ অব্দে হংসেশ্বরীর মন্দির নির্ম্মাণ শেষ হয়। ইহাতে প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। ইহার প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ভারতের নানাস্থানের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও অধ্যাপকগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাহাদিগকে প্রচুর অর্থ দেওয়া হইয়াছিল। এই মন্দিরের দ্বার-দেশের উপর এই শ্লোকটী খোদিত আছে—

শাকাব্দে রস বহ্নি মৈত্রগণিতে শ্রীমন্দিরং মন্দিরং
মোক্ষদ্বার চতুর্দ্দশেশ্বর সমং হংসেশ্বরী রাজিতং
ভূপালেন নৃসিংহদেব কৃতিনারব্ধং তদাজ্ঞানুগা
তৎপত্নী গুরুপাদপদ্মনিরতা শ্রীশঙ্করী নির্ম্মমে॥

শকাব্দা ১৭৩৬।

এই মন্দির দেখিতে অতি সুন্দর ও সুবৃহৎ—ইহার কারুকার্য্য বিশেষ প্রশংসার যোগ্য—প্রতিযোগিতা করিতে বঙ্গদেশে এরূপ দেবমণ্ডপ আর দ্বিতীয় নাই এমন কি উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরের মন্দিরও ইহার নিকট হারি মানে।

রাণী শঙ্করী চরিত্রবলে অসাধারণ বলশালিনী ছিলেন, তিনি স্বয়ং রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন কাহার মুখাপেক্ষিণী ছিলেন না, নাটোরের রাণী ভবানী এবং মহারাষ্ট্র মহিলা অহল্যা বাই অপেক্ষা কোন অংশে তিনি হীন ছিলেন না—প্রকৃতিপুঞ্জের কল্যাণসাধনে রাণী সর্ব্বদাই যত্নবতী ছিলেন তাহারা তাঁহাকে রাণীমা সম্বোধনে যেন চরিতার্থ হইত। রাণী শঙ্করীর দৃষ্টান্ত এদেশে বিরল।

তাঁহার একমাত্র পুত্র রাজা কৈলাসদেব কিছু অমিতব্যয়ী ছিলেন বলিয়া মাতা পুত্রে প্রায় কলহ হইত। সেই বিবাদসূত্রে রাজা কৈলাসদেব পৈতৃক সম্পত্তির অধিকার প্রাপ্তির জন্য আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছিলেন, মোকদ্দমায় বহু অর্থ ক্ষয় হইল, তত্ত্বাবধানাভাবে খাজনা আদায় হইল না—গবর্ণমেণ্টের খাজনা যথা সময়ে না দেওয়ায় রাজষ্টেট বাকীদার হইল, বিষয়-

হইল। রাণী হংসেশ্বরীর সেবার জন্য ২৪ পরগণার এলাকায় ১৫ খানি এবং হুগলীর অন্তর্গত কুলিহাণ্ডা এই ৬ খানি মহল পাইয়া তদ্দ্বারা দেবসেবা চালাইতে লাগিলেন। সাত বৎসরের গতে এই আপোষে নিষ্পত্তির পরই খৃঃ ১৮৩৮ অব্দে রাজা কৈলাস-দেব অল্প বয়সেই পরলোক প্রাপ্ত হয়েন। রাণী শঙ্করী পুত্রশোকে যারপর নাই কাতর হইলেন, এই দুর্ঘটনার পর রাণীমাতা কিয়দ্দিন বিষয়কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে পারিলেন না। শোকের সন্তর্পণ সময়ে—কিয়দ্দিন গত হইলে—তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া পূর্ব্ব-বৎ কাজকর্ম্ম দেখিতে লাগিলেন। রাজা কৈলাসদেবের একমাত্র পুত্র রাজা দেবেন্দ্রদেব এবং তিন কন্যা, তাঁহাদের মধ্যে করুণাময়ীর সহিত পাইকপাড়া রাজবংশের সুপ্রসিদ্ধ লালা বাবুর পুত্র শ্রীনারায়ণ বাবুর (রাজাবাবু নামে প্রসিদ্ধ) বিবাহ হয়। পিতৃ-বিয়োগকালে দেবেন্দ্র দেব বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েন নাই। তিনি পঠদ্দশায় মাতৃভাষা ব্যতীত সংস্কৃত, পারসী এবং ইংরাজী ভাষায় বিলক্ষণ বুৎপত্তি লাভ করিয়া তদানীন্তর সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। সেকালের ইংরাজীতে সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষাই চুড়ান্ত ছিল। কৃতবিদ্য রাজা দেবেন্দ্র দেব হুগলীর ইংরাজ কর্ম্ম-চারিগণের সহিত সৌহৃদ্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহারা অবসর কালে তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া আমোদ আহ্লাদ করিতেন। তৎকালে হুগলীর ম্যাজিষ্ট্রেট হালিডে সাহেব পরে সার ফ্রেডরিক হালিডে নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া লেঃ গবর্ণরের পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই বাঁশবেড়িয়ার রাজ-বাটীতে গিয়া রাজা দেবেন্দ্র দেবের সহিত আমোদ-প্রমোদে আপ্যায়িত হইতেন।

সেকালে হুগলী কালেজের ছাত্রগণের পারিতোষিক বিতরণ-সভায় স্বয়ং গবর্ণর জেনেরল উপস্থিত থাকিয়া পারিতোষিক বিতরণ করিতেন। লর্ড ডালহৌসির আমলে রাজা দেবেন্দ্রদেব উক্ত সভায় হুগলী জেলার জমিদারগণের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। রাজা দেবেন্দ্রদেব যেমন সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন, তেমনি তাহাতে তাঁহার যথেষ্ট পারদর্শিতাও ছিল। তিনি অতি অল্প বয়সেই খৃঃ ১৮৫২ অব্দের এপ্রিল মাসে এই কর্ম্মভূমির কর্ম্ম শেষ করিয়া পরলোক বাস করেন। দারুণ দুর্ব্বিষহ পৌত্রশোক সহ্য করিতে না পারিয়া মহামহিমান্বিতা পুণ্যবতী রাণী ছয়মাস পরেই অক্টোবর মাসে শ্রীশ্রী৺ শ্যামাপূজার পূর্ব্ব রাত্রিতে ৮০ বৎসর বয়সে পৌত্রের অনুসরণ করেন। তিনি আড়ম্বরশূন্যা ছিলেন, যৎসামান্য অশনবসনেই পরিতৃপ্তি বোধ করিতেন। তাঁহার প্রকৃতিপুঞ্জ তাঁহাকে ভক্তিভাবে যেমন রাণীমাতা বলিয়া সম্বোধন করিতেন, গবর্ণমেণ্টও তাঁহার প্রতি তেমনি প্রসন্ন ছিলেন, কলিকাতা মিউনিসিপালিটীও কালীঘাটের যে গলিতে রাণী শঙ্করীর একটী বাড়ী আছে, তাঁহার নামানুসারে সেই গলির নাম করণ করিয়া তাঁহাকে চিরস্মরণীয়া করিয়াছেন। রাণী আপনার তুলা পুরুষদানে লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করিয়াও মিতব্যয়িতাগুণে আপনার দেবোত্তর সম্পত্তির অনেক বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। মৃত্যু-কালে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি শ্রীশ্রী৺হংসেশ্বরী দেবীর সেবায় অর্পণ করিয়া প্রপৌত্র রাজা পূর্ণেন্দুদেব ও তাঁহার দুই ভ্রাতাকে পুরুষানু-ক্রমে সেবাইত নিযুক্ত করিয়া গিয়াছেন। তৎকালে অপ্রাপ্ত-বয়স্কতা প্রযুক্ত তাঁহাদের জননী রাণী কাশীশ্বরী অছি নিযুক্ত হইয়া আপনার আত্মীয় পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ এবং

ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের যুক্তি পরামর্শক্রমে বিষয়কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে থাকেন। তাঁহাদের অকাল মৃত্যুতে পাইকপাড়া রাজষ্টেট কোর্ট অফ ওয়ার্ডের পরিচালনাধীন হইলে রাণী কাশীশ্বরীকে তাঁহার নাবালক পুত্রগণের সম্পত্তি রক্ষার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

রাণী শঙ্করীর পরলোকপ্রাপ্তিকালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ প্রপৌত্র রাজা পূর্ণেন্দুদেবের বয়স নয় বৎসর মাত্র। পাইকপাড়া রাজ-বংশের কুটুম্বগণ তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। হুগলী কলেজে অধ্যয়ন করিয়া রাজা পূর্ণেন্দু দেব ইংরাজী সংস্কৃত পারস্য ও আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন, তিনি বড়ই ধর্ম্ম ভীরু ছিলেন। প্রতিজ্ঞাপালনে তাঁহার ন্যায় ব্যক্তি অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়, নাবালক অবস্থায় পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপ চন্দ্র সিংহের কর্ত্তৃত্বাধীন থাকিবার কালে তিনি কোন সৎকার্য্যের জন্য হাজার টাকা দান অঙ্গীকার করেন, এই কথা রাজা প্রতাপসিংহের কর্ণগোচর হইলে তিনি পূর্ণেন্দুদেবকে বলেন—"এতাধিক টাকা দিবার অঙ্গীকার করা ভাল হয় নাই, তবে তুমি বালক এই বলিয়া, না দিতেও পার" পূর্ণেন্দুদেব বলিলেন—"দাদা মহাশয় আপনি যদি এই টাকা না দেন তাহা হইলে আমাকে উপার্জ্জন করিয়া দিতে হইবে। যে কোন উপায়ে হউক আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা চাই। আপনি কি আমাকে কুলকজ্জল করিতে চাহেন?" রাজা প্রতাপচন্দ্র বালকের মতিগতি বুঝিয়া আহ্লাদের সহিত তাঁহাকে কোলে লইয়া বলিলেন—"তুমি যে পবিত্র ও মহোচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ এরূপ বলা সর্ব্বাংশে তাহার উপযুক্ত।" এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ সহস্র মুদ্রা তাঁহার হাতে দিলেন।

সাধারণ হিতকর কার্য্যে রাজা পূর্ণেন্দু দেব অগ্রগণ্য ছিলেন, ব্যক্তিগত দানেও তাঁহার বিলক্ষণ প্রসিদ্ধি ছিল। তিনি তাঁহার প্রপিতামহী পুণ্যবতী রাণী শঙ্করীর ন্যায় মিতব্যয়ী এবং দানশীল ছিলেন। বাঁশবেড়িয়া ও তন্নিকটবর্ত্তী অনাথ ও অনাশ্রয়গণের মধ্যে এমন কেহ ছিল না যে সে রাজা পূর্ণেন্দুর মুক্তহস্ততায় অনমুগৃহীত ছিল। সচ্চরিত্র ও সদ্বংশজ ব্যক্তির অন্নকষ্টের কথা জানিতে পারিলে তিনি গোপনে অর্থসাহায্য দ্বারা তাঁহার দুঃখ দূর করিতেন—পরোপকারেই যে অর্থের সদ্ব্যবহার তাঁহা তিনি জানিতেন ও বুঝিতেন, এবং তদনুসারে কাজও করিতেন। পরদুঃখ দূরীকরণার্থ রাজা বিলাস বাসনা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এরূপ পরোপকারপরায়ণ ব্যক্তি কয়জন দেখা যায়। একমাত্র তাঁহারই যত্নে ত্রিশবিঘা রেলওয়ে ষ্টেসন প্রতিষ্ঠিত হইয়া বাঁশবেড়িয়াবাসীর পথকষ্ট দূর করিয়াছে। হুগলী রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে গঙ্গার ঘাট পর্য্যন্ত ককরেল রোড নামে যে সুপ্রশস্ত রাজপথ দৃষ্ট হয়, রাজা পূর্ণেন্দু তাহার জন্য সমস্ত জমি দান করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। এই রাস্তাটীকে এবং ত্রিবেণী হইতে কেওটা পর্য্যন্ত রাস্তাটী পাকা করিতে যে অর্থব্যয় হইয়াছিল তাহাও তিনি দান করিয়াছিলেন। রাজা বিদ্যাদানেও মুক্তহস্ত ছিলেন, বাঁশবেড়িয়ায় ডাক্তার ডফের একটী মিশনারী স্কুল ছিল, তাহা বন্ধ হইলে রাজা পূর্ণেন্দুদেব নিজ ব্যয়ে বাঁশবেড়িয়ায় খৃঃ ১৮৮০ অব্দের ১৪ই জানুয়ারী একটী উচ্চশ্রেণী ইংরাজী স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেন। ম্যালেরিয়া-জ্বরে ছাত্রসংখ্যা কমিয়া যাওয়া প্রযুক্ত কিছুদিনের জন্য তাহা বন্ধ থাকিলেও খ্রীঃ ১৮৮৯ অব্দে স্কুলটী পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়া অদ্যাপি তাঁহার উপযুক্ত পুত্রগণের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। সংস্কৃত-শিক্ষার উন্নতিকল্পেও তিনি অযত্নবান ছিলেন

না। টোলের পণ্ডিতেরা তাঁহার নিকট বৃত্তি পাইয়া নিরুদ্বেগে অধ্যাপনা করিতেন। "কাল্যর্চ্চনা বিধি" নামে কালীপূজা পদ্ধতির একখানি পুস্তক তাঁহারই ব্যয়ে মুদ্রিত হইয়াছিল। নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যার উৎসাহবর্দ্ধনার্থ তিনি গুরুমহাশয় ও ছাত্রগণকে বিলক্ষণ পুরস্কার দিতেন, প্রাইমারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণকে কয়েকবার তিনি পদক পুরস্কার দিয়াছিলেন। গরিব-দুঃখীর চিকিৎসা জন্য রাজা পূর্ণেন্দু বাঁশবেড়িয়ায় একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন। কাহার পীড়ার কথা শুনিলে তিনি তাহার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া পথ্যোষধের সুব্যবস্থা করিতেন, আপনার চিকিৎসালয়ের চিকিৎসক দ্বারা রোগোপশম অসাধ্য মনে হইলে, তিনি নিজ ব্যয়ে স্থানীয় সিবিল সার্জ্জন বা তদনুযায়ী চিকিৎসক আনাইয়া চিকিৎসা করাইতেন,. তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত সদাব্রতের জন্য প্রভূত অর্থব্যয় করিতেন। দুর্ভিক্ষের সময় তিনি স্বয়ং অন্নসত্র খুলিয়া অনেক নিরন্ন ব্যক্তিকে অন্নদান করিয়াছিলেন এবং জেলার অন্যত্র অন্নকষ্ট নিবারণের জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটের হস্তে প্রচুর অর্থ দিয়াছিলেন, এদেশের লোকে যে তাঁহাকে গরিব-দুঃখীর মা বাপ বলিত তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। রাজা বিলক্ষণ সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর খুব ভাল না থাকিলেও সেতার ও এসরাজে বেশ হাত ছিল। তিনি আপনার জমিদারী কার্য্য-নির্ব্বাহেই কাল কাটাইতেন না, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের হুগলী শাখার এবং হুগলী ডিঃ এসোসিয়েয়েশনের প্রেসিডেণ্ট, অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট, বাঁশবেড়িয়া মিউনিসিপালিটীর কমিশনরের কাজ করিতেন। জেলার ইংরাজ কর্ম্মচারীরা তাঁহাকে যথেষ্ট আদর-যত্ন করিতেন ও ভালবাসিতেন, দেশের কাজে তাঁহারা রাজার পরামর্শ

গ্রহণ না করিয়া তাহাতে অগ্রসর হইতেন না। কোন নুতন আইন প্রচলিত করিবার সময় কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা তাহার পাণ্ডুলিপি পাঠাইয়া দিলে তিনি নির্ভীকচিত্তে আপনার স্বাধীন মত জ্ঞাপন করিতেন।

একদা বঙ্গের লেঃ গবর্ণর হুগলী সহরে উপস্থিত হইলে দেশীয় জমিদারগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। নিমন্ত্রণের ভার ছিল কালিপদ মুখোপাধ্যায় নামক জনৈক ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর—রাজার সহিত কালিবাবুর সদ্ভাব ছিল না বলিয়া রাজা নিমন্ত্রণে বাদ পড়িয়াছিলেন, কিন্তু মানীর মান ভগবান্ রক্ষা করেন, ছোটলাট আসিয়া অগ্রেই বাঁশবেড়িয়ার রাজার অনুসন্ধান করিলেন, তাঁহাকে অনুপস্থিত দেখিয়া ছোটলাট মাজিষ্ট্রটকে তাঁহার অনুপস্থির কারণ জানিবার উপলক্ষে বলেন—হুগলীর জমিদারগণের মধ্যে অগ্রে তাঁহার স্থান—অতএব তাঁহাকেই তিনি অগ্রে দেখিতে চাহেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেব তীব্র দৃষ্টিতে কালীবাবুর দিকে চাহিবামাত্র কালীবাবু ভয়ে জড়সড় হইলেন বটে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ একখানি দ্রুতগামী গাড়ীতে উঠিয়া বাঁশবেড়িয়া রাজবাটী যাত্রা করিলেন, এবং ক্রটী স্বীকার করিয়া বিনয় বচনে রাজাকে সন্তুষ্ট করিয়া সভাস্থলে উপস্থিত করিলেন। লাট সাহেব সর্ব্বাগ্রে তাঁহার সহিত সাক্ষাতে পরমাহ্লাদিত হইলেন। রাজা পূর্ণেন্দুদেব সর্ব্বগুণান্বিত পুরুষ ছিলেন, অস্ত্র চালনাতেও তাঁহার বিলক্ষণ দক্ষতা ছিল। তিনি চোর ডাকাতের ভয় রাখিতেন না, রাত্রিকালে রাজবাটীর ও তাঁহার শয়ন-গৃহের দ্বার খুলিয়া নির্ভাবনায় নিদ্রা যাইতেন। রাজা অতিশয় মাতৃভক্ত ছিলেন

ব্যয়ে সম্পাদন করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে দশ হাজার টাকা দান করা হইয়াছিল, হাজার হাজার দীন-দুঃখী পেট পুরিয়া খাইতে এবং এক একখানি করিয়া বস্ত্র পরিতে পাইয়াছিল। বড়ই পরিতাপের বিষয় তাহার পর বৎসর খৃঃ ১৮৯৬ অব্দের ২৫শে জুলাই সর্ব্বজনপ্রিয় রাজা পূর্ণেন্দুদেব এই কর্ম্মভূমি হইতে লোকান্তরে গমন করেন। তাঁহার চারি পুত্র—জ্যেষ্ঠ শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রদেব রায় মহাশয়, দ্বিতীয় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রদেব রায় মহাশয়, তৃতীয় শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয় এবং কনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রদেব রায় মহাশয়। বংশপ্রথানুসারে জ্যেষ্ঠ শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রদেব রায় মহাশয় "রাজা মহাশয়" উপাধি ভূষিত অন্যান্য সকলে "কুমার"।

বাঁশবেড়িয়া রাজবংশ শাক্ত-ধর্ম্মাবলম্বী—মহাশক্তি তাঁহাদের একমাত্র উপাস্যনীয়া। জগদম্বা তাঁহাদের কল্যাণ বিধান করিবেন। বাঁশবেড়িয়ার যে অবস্থায় ৭০০ বর্গ মাইল অধিকার বিস্তার ছিল সে অবস্থা আজি নাই, ভাগ্যদেবী কখন কাহার প্রতি, কি সূত্রে শুভদৃষ্টি করেন বলা যায় না, তাই তাঁহার চঞ্চলা বলিয়া একটা কলঙ্ক আছে। দক্ষিণ রাঢ়-ভূমিতে অনেক ধনবান থাকিলেও বাঁশবেড়িয়ার বংশমর্যাদা অদ্যাপি অটুট। বাঁশবেড়িয়ায় অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি ছিলেন—তারকনাথ তত্ত্বরত্ন, অঘোরনাথ তত্ত্বনিধি, শ্যামাচরণ তর্করত্ন, শ্রীধর কথক, ব্রাহ্মণ-সমাজের আচার্য্য নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি।

বায়ড়া।—হুগলী আরামবাগ সদর ষ্টেশনের দুই মাইল পূর্ব্বদিকে অহল্যা বাইয়ের রাস্তার উপর এই গ্রাম অবস্থিত। আইন আকবরীতে উল্লেখ না থাকিলেও বায়ড়া কিছুদিনের জন্য

যে একটী পরগণা বলিয়া পরিগণিত ছিল তাহা প্রাচীন দলিলাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ ইহা ডিহি বায়ড়া নামে খ্যাত।

বায়ড়ার রণজিৎ রায়ের নাম আজিও অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। তিনি জাতিতে সৎগোপ ছিলেন এবং এ দেশের যাবতীয় স্বজাতীয় কুটুম্বগণকে আপন বাটীতে নিমন্ত্রিত করিয়া আনিয়া, কয়েকদিন ধরিয়া পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইয়া প্রত্যেককে এক এক ছড়া সুবর্ণময় হার উপঢৌকন দিয়াছিলেন এজন্য জাতীয়গণের মধ্যে তাঁহার প্রতিহার উপাধি লাভ হয়। তিনি আপন বাসবাটীর চতুর্দ্দিকে গড়খাত করাইয়া তাহাকে অন্যের দুরাক্রম্য করিয়াছিলেন। গড়ের মধ্যে অনেক দেবদেবী প্রতিষ্ঠা, ব্রাহ্মণ সজ্জনে ভূমিদান, বড় বড় জলাশয় খনন দ্বারা তিনি আপনাকে চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বৃদ্ধ প্রপিতামহ নরেন্দ্রনারায়ণ বুন্দেলখণ্ড হইতে এদেশে আসিয়া উপনিবিষ্ট হয়েন এবং নিজ ভুজবলে তৎকালিক চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী অনেক রাজার উপর প্রাধান্য বিস্তার দ্বারা আপনি একটী রাজ্যস্থাপন করেন— তাহার নাম "বায়ড়া"। রাজা নরেন্দ্রনারায়ণের পুত্র রাজা জয়, তাঁহার পুত্র রাজা বিজয়, তাঁহার পুত্র রাজা সংগ্রাম রায়, তাঁহার পুত্র রাজা রণজিৎ রায়। তিনি একজন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। নিকটবর্ত্তী বিক্রমপুর গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ দেবী শ্রীশ্রী৺বিশালাক্ষী তাঁহার এক কন্যার বেশে বাড়ীতে অবস্থিতি করিতেন। † ডিহি

* বঙ্গে বৈশ্য নির্ণয় পুস্তক দ্রষ্টব্য।

† Vide Crawford's History of Hugli.

বায়ড়া গ্রামের দক্ষিণাংশে রণজিতের খনিত এক প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা আছে, শুনা যায় উহার পরিমাণ প্রায় ১৬৫ বিঘা। এক বৎসর বারুণী ত্রয়োদশীতে রাজার ছদ্মবেশধারিণী কন্যা দেবী মহামায়া বিষয় কার্য্যে ব্যাপৃত পিতার নিকট আসিয়া বারম্বার—"বাবা আমি যাই, বাবা আমি যাই, বলিয়া বিরক্ত করায় রণজিৎ বলিলেন—"যাও"। তাহার কিয়ৎকাল পরেই একজন শাঁখারী আসিয়া একজোড়া শাঁখার মূল্য চাহিল, রণজিৎ তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন—

"কে শাঁখা পরিল ?"

শাঁখারী। আপনার কন্যা।

রাজা অন্তঃপুরে জিজ্ঞাসিয়া জানিলেন—তাঁহার কোন কন্যাই শাঁখা পরেন নাই। ইহাতে তিনি রাগত হইয়া শাঁখারীকে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন।

শাঁখারী বলিল—"আমি মিথ্যাকথা বলি নাই দিঘীর ঘাটে বসিয়া তিনি শাঁখা পরিলেন, আমি শাঁখার দাম চাহিলে তিনি বলিলেন—"আমি রাজা রণজিতের কন্যা ঘরের কোলঙ্গীতে সোণার কৌটা মধ্যে টাকা আছে তাঁহার নিকট চাহিলেই পাইবে।" রণজিৎ অনুসন্ধানে সোণার কৌটা এবং তাহার মধ্যে চারিটী সুবর্ণ মুদ্রাও পাইলেন। অন্তঃপুরাঙ্গনাগণের মধ্যে কেহই সেই কৌটার কথা জানিতেন না। রণজিৎ আশ্চর্য্য ও স্তম্ভিত হইয়া কিয়ৎক্ষণ পরে বাহিরে আসিয়া শাঁখারীকে বলিলেন—"কে শাঁখা পরিল আমাকে না দেখাইতে পারিলে টাকা পাইবে না।" এই কথা শুনিয়া শাঁখারী কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাকে দিঘীর ঘাটে লইয়া গেল এবং কাতরকণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল—"কে মা তুমি শাঁখা পরিয়াছ দেখা দিয়া রাজাকে বল।"

শাঁখারীর কাতরোক্তিতে মহামায়া জগদম্বা দীঘির মধ্যস্থলে শাঁখা-পরা হাত দুইটী তুলিয়া দেখাইলেন।

রাজা তখন জানিলেন জগদম্বা তাঁহার কোন এক কন্যার রূপ ধরিয়া তাঁহার ঘরে অবস্থিতি করিতেছিলেন, বিষয় কার্য্যে ব্যাপৃতি-কালে তিনিই বারম্বার "যাই যাই" বলিয়া বিদায় লইয়াছিলেন। দেবীর হস্ত দুইটী দেখিতে পাইলেন কেবলমাত্র রাজা আর শাঁখারী—দেখিবামাত্র প্রেমাশ্রুপূর্ণ নয়নে রাজা মূর্চ্ছিত হইলেন। পার্শ্বচরেরা তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিলে দৈববাণী হইল—"আজিকার পুণ্যাহ তিথিতে এই দীঘিতে গঙ্গার আবির্ভাব হইবে, যে কেহ ইহাতে স্নান করিবে সে গঙ্গা স্নানের ফল লাভ করিবে।" এজন্য বারুণী তিথিতে রণজিৎ রায়ের বায়ড়ার দীঘিতে বহুদূর হইতে লোকে স্নান করিতে আইসে, মেলা বসে, বহু জন সমাগম হয়, অনেক টাকার জিনিস পত্র বিকায়, পৌষ মাসের মকর সংক্রান্তিতেও বহুলোক দীঘিতে স্নান করে। রাজা রণজিৎ ধন্য, তাহা অপেক্ষাও ধন্য সেই শাঁখারী। যাঁহার পাদপদ্ম হরিহর-বিরিঞ্চিবাঞ্ছিত, শাঁখারী তাঁহার শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করিতে পাইয়াছিল। রাজা রণজিৎ এক রাত্রিতে স্বপ্ন দেখেন কণ্ঠছিন্ন খেজুর গাছগুলি যেন তাঁহার নিকট কাঁদিতেছে, রণজিৎ প্রাতে উঠিয়াই হুকুম দেন, তাঁহার রাজ্য মধ্যে কেহ খেজুর গাছের কণ্ঠচ্ছেদ করিয়া রস বাহির করিতে না পারে। তদবধি আজ পর্য্যন্ত বায়ড়া পরগণায় কেহ খেজুর গাছের গলা চাঁচিতে পারে না।

প্রবাদ এইরূপ যে, যখন রণজিৎ পূর্ব্বোক্ত দীর্ঘিকা প্রতিষ্ঠার কালে তাহাতে একখানি বাহাদুরী মাইজ যূপকাষ্ঠরূপে প্রোথিত করিবার জন্য কয়েকটী হস্তী নিযুক্ত করিয়া তাহা বৈভাঁড়ারে

বসাইতে পারিতেছিলেন না এমন সময় খানাকুল কৃষ্ণনগরের শ্রীপাদ অভিরাম স্বামী সাঙ্গোপাঙ্গ সহ হরিনাম প্রচারের জন্য দীঘির ধার দিয়া যাইতেছিলেন, রণজিৎকে জাটকাঠ স্থাপনে অসমর্থ দেখিয়া তিনি বাম হস্তে সেই কাষ্ঠ ধরিয়া ভাঁড়ারে বসাইয়াদিবামাত্র রণজিৎ তাঁহার পৃষ্ঠে করস্পর্শ করিয়া ধন্যবাদ দিলে, স্বামীজি কোপদৃষ্টিতে রণজিতের মুখের দিকে তাকাইয়া তাঁহাকে অভিশপ্ত করিতে উদ্যত হইয়া বুঝিলেন রণজিৎ দেবীর কৃপাপাত্র। অগত্যা অভিশপ্ত না করিয়া এইমাত্র বলিলেন— "যাও, বড় বাঁচিয়া গেলে, কি বলিব তুমি দেবীর বরপুত্র তিনি তোমাকে রক্ষা করিতেছেন।"

এই বলিয়া অভিরাম স্বামী চলিয়া গেলেন। ইহাতে বুঝা যায় যে, রণজিৎ অভিরাম স্বামীর সমসাময়িক। তাহা যে নিতান্ত অসম্ভব নহে খানাকুল কৃষ্ণনগর প্রবন্ধে দেখাইব।

রণজিতের পুত্রের নাম রাজা অচ্যুতানন্দ, পৌত্রের নাম রাজা হরিশ্চন্দ্র। রণজিতের বংশধরগণ এখনও ডিহি বায়ড়ার গড়ে অবস্থিতি করিতেছেন। বর্ত্তমান বংশধর শ্রীমান ত্রিপুরা চরণ রায় এম, এ, বি, এল, এক্ষণে হাওড়ায় ওকালতী করিতেছেন, তাঁহার পিতা ৺রামতারক রায় মহাশয় যখন মায়াপুর উচ্চ ইংরাজী স্কুলের শিক্ষকতা করেন তখন এই পুস্তকলেখক তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিতেন, কি অমায়িক লোক, রামতারক বাবু সুন্দর পুরুষ ছিলেন, তাঁহার মধুর মূর্ত্তি এখনও লেখকের মানস-ক্ষেত্রে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। তিনি সেকেলে এণ্ট্রেন্স পাশ করিয়া কিছুদিন কলিকাতা মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন করিয়া-ছিলেন, শবব্যবচ্ছেদাদি সহ্য না হওয়া প্রযুক্ত কলেজ পরি-

ত্যাগ করিয়া মায়াপুর স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন, তাহার পর আঁকড়ি শ্রীরামপুর, সন্তোষপুর প্রভৃতি মধ্য ইংরাজী স্কুলে হেডমাষ্টারী করিয়া জাহানাবাদ স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষকতা করেন। ইহাতেই তাঁহার আয়ুষ্কাল পূর্ণ হয়।

রণজিৎ রায়ের বংশধরগণ মাধবপুর, দিগড়া ও সালালপুরে অবস্থিতি করিতেছেন। রণজিতের যে শাখা দিগড়ায় বাস করিয়াছেন তাহাতে পরশুরাম, তৎপুত্র শ্যামাচরণ, তৎপুত্র দুর্গাচরণ, তৎপুত্র রামলোচন, তৎপুত্র রামতারক * তাঁহার তিন পুত্র, জ্যেষ্ঠ ৺মতিলাল + মধ্যম রসিকলালকনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় সাহেব এম, এ, কটক কলেজের বিজ্ঞানাধ্যাপক।

দেশের অবস্থা খৃঃ ১২০৩ অব্দে বিক্তিয়ার খিলিজী নবদ্বীপের রাজ-সিংহাসন অধিকার করিলেও রাঢ়দেশের সর্ব্বত্র মুসলমান রাজত্ব বদ্ধমূল হয় নাই—সপ্তগ্রাম পাণ্ডুয়া ভূরিশ্রেষ্ঠ (ভূরসুট) চেতুয়া বরদা বালীগড় চন্দ্রকোণা মঙ্গলকোট বিষ্ণুপুর প্রভৃতির রাজাগণ সর্ব্বতোভাবে মুসলমানের বশ্যতা স্বীকার করেন নাই, গৌড়ের নবাব প্রবল হইলে তাঁহাকে কখন কখন রাজকর-স্বরূপ কিছু কিছু দিতেন। একশত চল্লিশ বৎসর কাল এইরূপে দিল্লীশ্বরের অধীনতায় পাঠান শাসনকর্ত্তৃগণ খৃং ১৩৪৩ অব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ শাসন করিয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। তাহার পর খৃঃ ১৫৭৬ অব্দ পর্য্যন্ত ২৩৩ বৎসর কাল স্বাধীন পাঠান-রাজগণের অধীন থাকিয়া বঙ্গদেশ

* ইনি সবজজ ছিলেন।

+ ইতি গ্রন্থকারের বন্ধু, মুন্সেফ আদালতের সেরেস্তাদার ছিলেন। তাঁহার পুত্র শ্রীমান আশুতোষ বি, এল, উপাধি পাইয়া আরামবাগে ওকালতী করিতেছেন।

উক্ত খৃষ্টাব্দে, প্রবল প্রতাপান্বিত মোগল-সম্রাট আকবর সাহের করতলগত হয়। সর্ব্বরকমে পাঠানেরা ৩৭৬ বৎসর এদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ইহাদের শাসনকালে বঙ্গীয় প্রজার সুখস্বচ্ছন্দতা ছিল, দ্রব্যাদির সুলভতা প্রযুক্ত কাহার অন্নবস্ত্রের অভাব হয় নাই, কৃষকেরা নিয়মিত রূপে রাজকর দিত।

বক্তিয়ার বঙ্গরাজ্য অধিকার করিয়া আপনার উপযুক্ত অংশ রাখিয়া সজাতীয়গণকে তাহা ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন, সেই সকল পাঠান বাঙ্গালার নবাবকে নিয়মিত রূপে রাজকর আদায় দিয়া আপনারাই রাজ্য শাসন করিত—তাহাতে হিন্দুরাই সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন, রাজকার্য্য বলিতে যাহা কিছু সমস্তই হিন্দু জমিদারদের হাতেই ছিল সুতরাং পাঠান রাজত্বে হিন্দু প্রজার সুখ বই দুঃখ ছিল না।

যদিও সুবিখ্যাত বাবর ১৫২৬ খৃষ্টাব্দের দিল্লী অধিকার করেন কিন্তু বিহার সাসেরামের সের-সা তাঁহার পুত্র হুমায়ুনকে দিল্লীর সিংহাসনচ্যুত করিয়া খৃঃ ১৫৩৯ অব্দে ভারতে অল্প দিনের জন্য পাঠান পতাকা উড়াইয়াছিলেন।

সের সাহা কেবলমাত্র পাঁচ বৎসর সাম্রাজ্য ভোগ করিলেও রাজস্ব সংগ্রহ এবং শাসনকার্য্য সম্বন্ধে অনেক সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাঁহার দ্বারা বঙ্গরাজ্য অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত হয় এবং এক একভাগে এক একজন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হয়েন। তিনি কাজি কাজিলেৎ নামক একজন বিশ্বস্ত ধর্ম্মভীরু ব্যক্তিকে তাহাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার জন্য এদেশে রাখিয়া দিল্লী যাত্রা করেন।

সেরসাহের পূর্ব্বে আর কোন নবাব বঙ্গরাজ্য নানাভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায় নাই। কেবল গিয়াসুদ্দীন তোগলক

যে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন তাহা ইতোপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। অতএব বেশ বুঝা যাইতেছে যে আইন আকবরীর লিখিত সরকার আকবর সাহের দ্বারা বিভক্ত ও সরকার নামে অভিহিত হইয়াছিল। প্রত্যেক সরকারে এক এক জন শাসনকর্ত্তা দ্বারা রাজস্বসংগ্রহ ও শাসনকার্য্য নির্ব্বাহিত হইত। সের সাহা কৃষকগণের নিকট উৎপন্ন ফসলের এক চতুর্থাংশ রাজকর স্বরূপ গ্রহণ করিতেন। খৃঃ, ১৫৪০ অব্দে তিনি লোকান্তর গমন করেন। এই অল্প সময় মধ্যে তিনি অনেকগুলি হিতকর অনুষ্ঠান করিতে পারিয়াছিলেন, বেশী দিন বাঁচিলে আরও তদ্রূপ অনেক কাজ করিয়া যাইতে পারিতেন। পূর্ব্ব দিকে বঙ্গের তদানীন্তন রাজধানী সুবর্ণ গ্রাম হইতে পশ্চিমে সিন্ধুনদের তীর পর্য্যন্ত হাজার ক্রোশব্যাপী রথ্যানির্ম্মাণ, সৌরকরতাপিত পথিকগণের জুড়াইবার জন্য রাস্তার উভয় পার্শ্বে বৃক্ষশ্রেণী রোপণ, এক এক ক্রোশ অন্তর এক একটী কূপখনন, প্রত্যেক আড্ডায় এক একটী পান্থনিবাস সংস্থাপন ও তাহাতে হিন্দু মুসলমানাদি সকল জাতীয় পথিকের সরকারী ব্যয়ে খাদ্যের ব্যবস্থা দ্বারা এদেশের যথেষ্ট উপকারসাধন হইয়াছিল। পান্থাবাসের নিকটেই মসজিদ সংস্থাপিত করিয়া তাহাতে নিয়মিত সময়ে কোরাণপাঠ জন্য মৌলবী নিয়োগ করা হইয়াছিল। তাঁহাদের সরকারী ব্যয়ে সংসার নির্ব্বাহ করিবার উপায় অবধারণ দ্বারা

---

* After this Shere proceeded to Gowr. and subdivided the kingdom of Bengal into several provinces, to each of which he nominated a District-Governor—Stewart's History of Bengal page 152.

তিনি সাধারণের প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। সেম সাহেব অধিকারকালে দস্যুতস্করের ভয় ছিল না।

রাঢ়দেশে পর্ত্তুগিজগণের বাণিজ্যব্যপদেশে আগমন ও অবস্থিতি এখানকার এক প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনা। ঠিক কোন্ সময়ে যে তাহারা রাঢ়ের অন্তর্গত সপ্তগ্রাম বা হুগলীতে কুঠি স্থাপন করে তাহা ষ্টুয়ার্ট ও মার্শমনাদি পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ নিশ্চয় করিতে না পারিয়া লিখিয়াছেন* — The best account of the origin of Hoogly which I have seen, may be found in the Appendix to the Descriptive calatlogue of Tipoo Sultan's Library No 37 but a that account does not define the period at which it was founded. †

টিপু স্বলতানের লাইব্রেরির পুস্তক তালিকার ৩৭ সংখ্যায় হুগলীর উৎপত্তি বিবরণ লিখিত থাকিলেও উহাতে সময় নির্দ্দিষ্ট নাই।

প্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক হাণ্টার বলেন — সাজাহানা নামক পারস্য-গ্রন্থে লিখিত আছে, যখন হুগলী হিন্দুরাজার শাসনাধীন ছিল তখন একদল বণিক এখানে বাণিজ্য ব্যবসায় করিবার জন্য তাঁহার নিকট ঘরবাড়ী নির্ম্মাণের জমি ও অনুমতি পাইয়াছিল।

While Bengal was Governed by its own princes a member of merchants resorted to Hugli and

---

* At what period the Portuguese first settled at Hooghly, it is not easy to fix—Marsh man's History af Bengal page 30.

† Stewart's History of Bengal, Bangabasi Edition page 274

obtained a piece of ground and permission to build houses in order to carry on commerce to advantage.

এই বণিক সম্প্রদায় যে পর্ত্তুগিজ তাহা সিদ্ধান্ত করিবার দুই একটী অনুকূল প্রমাণও পাওয়া যায়। সের সাহার সেনাপতি গৌড় আক্রমণ করিলে গৌড়ের নবাব মামুদ সা হুমায়ুনের সাহায্য-প্রার্থী হইয়া বারংবার তাঁহাকে লিখিয়া পাঠান, হুমায়ুন তৎকালে দিল্লীরাজ্য লইয়াই বিব্রত ব্যতিব্যস্ত, মামুদের প্রার্থিত বিষয়ে মনোযোগ করিবার সুযোগ পাইলেন না, অগত্যা মামুদ সা পর্ত্তুগিজদিগের গোয়া নগরস্থ গবর্ণর নানোদ কুনাকে সাহায্য চাহিলে, তিনি ভি, পি, ডি, সাম্প্রেয় নামক সেনাপতির অধীনে নয়খানি রণতরী পাঠাইয়া দেন. ইহা ১৫৩৭।৮ অব্দের কথা। এতদুপলক্ষে ফেরিয়া ডি সৌজার ইতিহাসে লিখিত আছে যে, খৃঃ ১৫১৭ অব্দে পর্ত্তুগিজপোত গঙ্গা নদীতে প্রথম প্রবেশ করিয়াছিল। *

This was the first introductiou of the Portuguese into Bengal ; although some of their ships entered

* It is reasonsble t: suppose that V. P De Samprayo, the comander of the nine vesse's which entered the Ganges in 1537—38 did not neglect so favourable an opportunity of establishing a Settlement in Bengal an object for which the Portuguese had been long ambitions during the time tha Shere Shah was engaged in the contest with the Emperor Humayon.—Stewart's History a Bengal, of page 274.

Ganges as early as A. D. 1517. কিন্তু ইতিহাস অন্বেষণে দেখিতে পাওয়া যায় না যে, কি উপলক্ষে পর্ত্তুগিজ জাহাজ ১৫১৭ অব্দে গঙ্গা নদীতে প্রবেশ করিয়াছিল। তবে দেখা যায় যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের কাল খৃঃ ১৫১০ অব্দ। ইহার কিছুদিন পরেই তাঁহার পরমভক্ত রঘুনাথ দাস ঠাকুরের পিতা গোবর্দ্ধন সপ্তগ্রামের রাজস্বসংগ্রাহক বা মজুমদার ছিলেন। হাণ্টার সাহেব সাজাহানা নামক পারস্যগ্রন্থে যে হিন্দু রাজার নিকট হইতে হুগলীতে একদল বণিকের বাণিজ্য ব্যবসায়ের জন্য ভূমি এবং কুঠি নির্ম্মাণের অনুমতি পাইয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে নিশ্চয় করা যায় যে গোবর্দ্ধন মজুমদারের সময়েই ইহা ঘটিয়াছিল। তদ্ব্যতীত এ সময়ে আর কোন হিন্দুরাজা হুগলীতে রাজত্ব করিতেন না। এই দুইবারে যে পর্ত্তুগিজেরা এদেশে বাণিজ্য কুঠি সংস্থানের সুযোগ ত্যাগ করিয়াছিলেন ইহা কোন মতেই মনে করা যায় না। ফলতঃ পর্ত্তুগিজেরা যে সময়েই রাঢ়দেশে বাণিজ্য কুঠি সংস্থাপিত করিয়া থাকুক, সে সময়ে বাঙ্গালার নবাব এখানে শাসনশৃঙ্খলা সংস্থাপিত করিতে পারেন নাই, বিদেশীয় বণিকগণের নিকট বাণিজ্য শুল্ক আদায়ের আবশ্যকতা পর্য্যন্ত অনুভূত হয় নাই। হইলে পর্ত্তুগিজদের সহিত তাহার একটা বন্দোবস্ত হইত এবং সেই বন্দোবস্ত সম্বন্ধীয় সংবাদ মুসলমান ঐতিহাসিকগণ সংগ্রহ করিবার সুযোগ পাইতেন। পক্ষান্তরে ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ বলিতেছেন পর্ত্তুগিজেরা নবাবকে রাজস্ব দিত না।

পর্ত্তুগিজগণের হুগলীতে কুঠি সংস্থাপনের ন্যায় আর একটী ঘটনা রাঢ়ের ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ—উহা কালাপাহাড়ের উপদ্রব।

কালাপাহাড় জাতিতে ব্রাহ্মণ—গৌড়ের কোন মুসলমান রাজকন্যা তাহার প্রণয়াসক্ত হওয়ায় সেই ব্রাহ্মণ মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণে তাহার পাণিগ্রহণ করে। মুসলমান হইয়া কালাপাহাড় ভয়ানক হিন্দু দ্বেষী এবং হিন্দুর নির্য্যাতক হইয়া উঠে, যেখানে হিন্দু দেব দেবী দেখিত যে কোন উপায়ে হউক তাহা চূর্ণ করিয়া ফেলিত। ব্রাহ্মণ সন্তান মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণে যে পৈতৃক ধর্ম্মের এতাদৃশ বিরোধী হইয়াছিল তাহার কারণ এই বলিয়া মনে হয় যে হিন্দুসন্তান মুসলমানীর প্রণয়াসক্তি প্রযুক্ত, স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য হিন্দু দেবদেবীর শরণাপন্ন হইয়া থাকিবে, তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া যখন মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণে বাধ্য হইতে হইল তখন হিন্দু দেবদেবীগণের প্রতি জাতক্রোধ হইয়া তাহাদের বিলোপসাধনে বদ্ধপরিকর হইয়াছিল। কালাপাহাড় গৌড়ের নবাব সোলেমানের সেনাপতি ছিল। বহুসংখ্যক সেনা ও সেনাপতি লইয়া এই হিন্দুদ্রোহী ব্রাহ্মণ উড়িষ্যার জগন্নাথ দেবের মন্দির আক্রমণ করিলে পাণ্ডারা মন্দির পরিত্যাগ পূর্ব্বক জগন্নাথ দেবকে লইয়া পলায়ন করেন এবং চিল্কা হ্রদের তীরে বিগ্রহটীকে মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত করিয়া রাখেন। কালাপাহাড় তাহার বিলোপ সাধন জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়া অনেক অনুসন্ধানের পর বিগ্রহকে মৃত্তিকা হইতে বাহির করিয়া হস্তী পৃষ্ঠে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত আনিয়াছিল এবং তথায় অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া তাহাতে জগন্নাথমূর্ত্তি নিক্ষেপ করিলে তাহা অর্দ্ধ দগ্ধ হইয়া যায় এমন সময়, জগন্নাথের কোন পরম ভক্ত প্রচ্ছন্ন ভাবে তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন, তিনি অগ্নি হইতে তুলিয়া তাহা গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করেন, পরে সেই ভাসমান মূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া

মুসলমানের দৃষ্টির অতীত পথে পৌছিলে জল হইতে দগ্ধাবশিষ্ট মূর্ত্তি তুলিয়া তন্মধ্য হইতে বিষ্ণুপঞ্জর বাহির করিয়া তদ্দ্বারা বিগ্রহ মূর্ত্তির পুনর্গঠন করেন। কালাপাহাড় উড়িষ্যা হইতে প্রত্যাগমনকালে পুরী ও অন্যান্য তীর্থক্ষেত্রে যে সকল দেব দেবীর মূর্ত্তি ছিল সমস্তই চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া চলিয়া যায়। ইহাতেই উড়িষ্যায় বহু কালের হিন্দু রাজত্ব বিলোপ প্রাপ্ত হয়। ইহা উড়িষ্যাবাসীদের মতে খৃঃ ১৫৫৮ খৃঃ অঃ এবং ইংরাজদের মতে তাহার দশবৎসর পরে সংঘটিত হয়। কালাপাহাড়ের দেবনিগ্রহ সম্বন্ধে হিন্দুগণের মধ্যে এরূপ প্রবাদ যে তাহার রণবাদ্যের শব্দে হিন্দু দেবদেবীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পৃথক হইয়া পড়িত। *

ভাষা ও সাহিত্য—হিন্দুরাজত্বে সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চাই বেশী ছিল রাজকার্য্যে সংস্কৃত দলিল দস্তাবেজ লেখাপড়া হইত। কেবল কথাবার্ত্তায় গ্রাম্য ভাষার ব্যবহার ছিল। সেই গ্রাম্য ভাষাই এখনকার বর্ত্তমান বঙ্গভাষায় দাঁড়াইয়াছে। হিন্দুরাজত্বের একখানি মাত্র গ্রন্থ রামাই পণ্ডিতের ধর্ম্মমঙ্গল। সম্ভবতঃ উহা খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। তৎসম্বন্ধে "রাঢ়ে ধর্ম্ম পূজা" প্রবন্ধে বিস্তারিতরূপে আলোচিত হইবে।

পাঠান রাজত্বে নবদ্বীপের স্মার্ত্ত শিরোমণি রঘুনন্দন সপ্তবিংশতি তত্ত্ব স্মৃতিসংকলন দ্বারা মিতাক্ষরার প্রভাব হ্রাস, এবং দায়ভাগের প্রসার প্রতিপত্তির বৃদ্ধি করেন। সেই অবধি রঘুনন্দনের মতেই

---

* The following miraculous powers are attributed to Callapahar. As far as the beat of his drum could be heard the ears and feet of the idols fell off.—Narrative of the Government of Bengal by Francis Gladwin page 83.

বঙ্গদেশে দায়ভাগ, উত্তরাধিকার নির্দ্ধারণ এবং দৈবকার্য্যাদি নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। তাহার কিয়দ্দিন পরে খানাকুল কৃষ্ণনগরের ঠাকুর নারায়ণ বন্দোপাধ্যায় রঘুনন্দনের অনেক মত খণ্ডন করিয়া নিজ মত সংস্থাপিত করেন। তাঁহার সঙ্কলিত স্মৃতির নাম স্মৃতিসর্ব্বস্ব। কৃষ্ণনগর অঞ্চলে তাঁহার মতই প্রচলিত তদনুসারে যাবতীয় দৈবকার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। এসিয়াটিক সোসাইটীতে ঐ গ্রন্থ সংগৃহীত আছে। কিন্তু এপর্য্যন্ত মুদ্রিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।

নবদ্বীপের রঘুনাথ শিরোমণির তার্কিকতায় সমস্ত ভারত স্তম্ভিত হইয়াছিল, তাঁহারই দ্বারা ন্যায়শাস্ত্রে নবদ্বীপের প্রাধান্য সংস্থাপিত হয়। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস গোবিন্দ দাসাদি বৈষ্ণব কবির মধুর কাব্যে বঙ্গীয় পাঠক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভের অধিকারী হয়েন। পাঠান রাজত্বেই বাঙ্গালা সাহিত্যের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্ফূর্ত্তি ও সৌষ্ঠবশালী হইতে আরম্ভ করে, এই সময় হইতেই বাঙ্গালা যে একটা পৃথক ভাষা বলিয়া পরিগণিত সে পক্ষে কাহার সন্দেহ নাই। দুর্লভ মল্লিকের গোবিন্দ চন্দ্রের গীত, ময়নামতীর গান, খেলারামের ধর্ম্মমঙ্গল কৃত্তিবাসের রামায়ণ এই সময়েই রচিত হইয়াছিল। রাঢ় দেশে না হইলেও পূর্ব্ববঙ্গে দুইখানি মহাভারতও এই সময়ে রচিত হইয়াছিল। জ্যোতিষ তন্ত্রাদি কয়েক খানি জ্যোতিগ্রন্থও এই সময়ে সংস্কৃত ভাষায় রচিত

হয়। বঙ্গবাসী এখন হইতেই মাতৃভাষার সৌষ্ঠবসাধনে যত্নবান হইতে আরম্ভ করেন। পূর্ব্বে সংস্কৃত ভাষাতেই উচ্চশিক্ষা প্রদত্ত হইত বলিয়া তৎকালিক বাঙ্গালা কাব্যে সংস্কৃত শব্দ বেশী ব্যবহৃত হইত। কিন্তু রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ, মাণিক চন্দ্রের গীতে সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার বাহুল্য দৃষ্টি গোচর হয় না। ডাক ও খনার বচনাদিও পাঠান রাজত্বে রচিত বলিয়া অনুমান করিবার আপত্তি দেখা যায় না।

মোগল রাজত্বে রাঢ়।

দীল্লির মোগলসম্রাট আকবর সাহ খৃঃ ১৫৫৬ অব্দে পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন কিন্তু নাবালক অবস্থায় তাঁহার কয়েক বৎসর কাটিয়া যায় বলিয়া স্বয়ং কিছু করিতে পারেন নাই। তৎকালে বঙ্গদেশের পাঠান শাসনকর্ত্তা যে সোলেমান কেরাণী একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তিনি আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিয়া দীল্লিতে মহামূল্য উপঢৌকন পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র দাউদ খাঁ পৈতৃক সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দেখিলেন—ধনাগার প্রচুর ধনরত্নে পরিপূর্ণ. ৪০ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য, ১ লক্ষ ৪০ হাজার পদাতিক, ২০ হাজার কামান, ৩ হাজার ৬ শত হস্তী এবং সহস্র সহস্র রণতরী তাঁহার অধীন। এই অতুল ঐশ্বর্য্যের উষ্ণতায় তাঁহার মনকে গরম করিয়া তুলিল, দীল্লির সম্রাটের অধীনতা স্বীকার অনাবশ্যক বোধে তিনি গাজিপুরের অদূরবর্ত্তী গঙ্গার দক্ষিণে মোগল রাজ্যের জমানিয়া নামক স্থান আক্রমণ করিলেন। (খাঁজমান নামে মোগল সেনাপতি ইহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।) এই সংবাদ দীল্লিশ্বর আকবরের কর্ণ গোচর হইলে তিনি মোনেম খাঁকে এই বিদ্রোহ দমনের আজ্ঞা করিলেন। মোনেম খাঁ যুদ্ধ যাত্রা করিয়া পাটনার নিকট দাউদের সেনাপতি লোদি খাঁর সম্মুখীন হইলেন, যুদ্ধে লোদির পরাভব ঘটিলে উভয়

পক্ষে সন্ধি সংস্থাপিত হইল বটে, কিন্তু দাউদ গোপনে আপন সেনাপতির ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া তাহার প্রাণ সংহার করিলেন। এদিকে আকবর সাহাও সন্ধির সর্ত্তে মোনেম খাঁর প্রতি সন্তুষ্ট না হইয়া রাজা তোড়রমলকে সেনাপতিত্ব দিয়া পাটনায় পাঠাইয়া দিলেন। মোনেম খাঁ বেগতিক দেখিয়া ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে পাটনা অবরোধ করিলেন। দাউদকে কয়েক মাস অবরোধে অবস্থিত করিতে হইল। ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে সৈন্য সামন্ত লইয়া সম্রাট স্বয়ং পঞ্চ পাহাড়ীতে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন যে শত্রুরা হাজিপুর হইতে খাদ্য সামগ্রী পাইতেছে, তিনি কালবিলম্ব না করিয়া তথায় ৩ হাজার সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন, কিন্তু হাজিপুরের শাসনকর্ত্তা ফতে খাঁ বিপুল বলবিক্রমের সহিত নগর রক্ষা করিতেছিলেন, সম্রাট দূরবীক্ষণ দ্বারা তাহা দৃষ্টিগোচর করিবা মাত্র বড় বড় তিন খানা নৌকা পূর্ণ সৈন্য সাহ খাঁ আলমকে পাঠাইয়া দিলেন —খাঁ আলম শত্রুসৈন্যের পরাভব ও সেনাপতিগণের বধ সাধন করিয়া নৌকা যোগে তাহাদের মস্তক সম্রাটের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। সম্রাট সেই নৌকা দাউদের নিকট পাঠাইয়া বলিয়া দিলেন—বশ্যতা স্বীকার না করিলে অচির কাল মধ্যে তাহারও এই দুর্দ্দশা ঘটিবে। দাউদ এই সকল ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া ভয়ে পাটনা ছাড়িয়া বঙ্গদেশে পলাইয়া আসিলেন। পটনা দুর্গে দাউদের ২০ হাজার সৈন্য ছিল, প্রভুর পলায়নে তাহারা ছত্র-ভঙ্গ হইয়া, যে যেখানে পাইল প্রস্থান করিয়া আত্মরক্ষা করিল। পাটনার ৫০ মাইল দূরবর্ত্তী দরিয়ারপুর পর্য্যন্ত মোগল সৈন্য তাহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইল। সম্রাট তথায় কিছুদিন অবস্থিতির

পর মোনেম খাঁকে বঙ্গ ও বিহারের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া রাজা তোড়রমলকে ১০ হাজার সৈন্য সমভিব্যাহারে পাঠান দিগকে বাঙ্গালা হইতে দূরীভূত করিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। দাউদ পলাইয়া তোণ্ডায় আশ্রয় লইলেন, কিন্তু মোগল সৈন্যের আগমনবার্ত্তা শ্রবণে আপনার সঞ্চিত সম্পত্তি লইয়া উড়িষ্যায় পলায়ন করিলেন। মোনেম খাঁ অবাধে বঙ্গদেশ অধিকার করিলেন এবং দাউদের অনুসরণ জন্য রাজা তোড়রমলকে পাঠাইয়া দিলেন। রাজা মান্দারণে * উপস্থিত হইয়া শুনিলেন যে দাউদ রায়েনকেশরী † নামক স্থানে যুদ্ধার্থ সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন। এই সংবাদ পাইয়া তিনি আর বেশীদূর অগ্রসর না হইয়া মুনেম খাঁকে সেই সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন, নবাব তাঁহার সাহায্যার্থ মহম্মদ কুলি খাঁকে মান্দারণে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা উভয়ে চেতুয়া ‡ নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন যে ধারপুর নামক স্থানে সৈন্য সমাবেশ করিয়া দাউদ মোগলসৈন্যের সম্মুখীন হইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। এই সময়ে দাউদের পিতৃব্যপুত্র জুনেদ রায়নকেশরীতে সসৈন্যে অবস্থিত করিতেছিলেন। জুনেদ আফগানদিগের প্রসিদ্ধ রণবীর। তিনি দাউদের সহিত মিলিত হইবার চেষ্টা করিতেছিলেন এমন সময় রাজা তোড়রমল অন্যান্য ওমরাওগণের সহিত যুক্তি করিয়া তাহাকে

---

* হুগলী জেলার আরামবাগ হইতে ৭ ক্রোশ পশ্চিমে।

† রিনকেশরী নয়—দিনকেশরীও নয় আইন আকবরীতে রায়েন বলিয়া লিখিত আছে।

‡ চেতুয়া মেদনীপুর জেলার ঘাটালের সন্নিকট।

আক্রমণ করিবার জন্য আবুল কাশিম এবং নাজির বাহাদুরকে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু তাহারা পরাভূত হইলে রাজা স্বয়ং জুনেদকে আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইয়া শুনিলেন জুনেদ অরণ্য মধ্যে আশ্রয় লইয়াছেন। অগত্যা রাজা মেদিনীপুরে ফিরিয়া আসিলেন। এখানে মহম্মদ কুলি খাঁ প্রাণত্যাগ করেন। ইহাতে মোগল বাহিনী লইয়া রাজা তোড়রমল গড় মান্দারণে প্রত্যাগত হইলেন। এখানে আসিয়া আমীরগণের সহিত মতভেদ হওয়ায় সেনাপতি কিয়া খাঁ বনে জঙ্গলে প্রস্থান করিলেন এবং রাজা তোড়রমল বর্দ্ধমানে ফিরিয়া আসিলেন। নবাব কুলি খাঁর মৃত্যুসংবাদ পাইয়া মহম্মদ খাঁকে বর্দ্ধমানে পাঠাইয়া দেন, মুনেম খাঁ আসিয়া পৌছিলে রাজা কিয়া খাঁকে সান্ত্বনা দিয়া ফিরাইয়া আনিলেন এবং সকলে মিলিয়া মেদিনীপুর এবং তথা হইতে বাকৃতোড়ে অগ্রসর হইয়া শুনিলেন দাউদ কটক দুর্গে অবস্থিতি করিতেছেন। এই সময়ে রাজা সংবাদ পাইলেন যে নবাব স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করিয়াছেন অতএব অগ্রসর না হইয়া তথায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

এদিকে নবাব মুনেমখাঁ, খাঁ আলম প্রভৃতি মোগল সেনাপতিগণের সহিত যুদ্ধযাত্রা করিয়া রাজা তোড়রমলের সহিত মিলিত হইলেন।

১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে মোগল পাঠানে তুমুল সংগ্রাম বাদিল। আফগানদিগের সৈন্যবল নিতান্ত অল্প নহে হস্তীও অনেক ছিল। হস্তী গুলি যে কেবল ভার বহন করিত তাহা নহে,— হস্তীকে রণকৌশল শিক্ষা দেওয়া হইত—সেনাপতিগণ সেই সকল শিক্ষিত হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন

হস্তীরা মাহুতের হস্তপদাদির টিপ্‌নিতে উঠিত, বসিত, ছুটিয়া পলাইত, সুযোগ পাইলে শুণ্ড দ্বারা শত্রুকে আক্রমণ করিত, তাহাকে পদতলে নিক্ষিপ্ত করিয়া মারিয়া ফেলিত। এইরূপ দুই শত শিক্ষিত হস্তী পাঠানপক্ষে যুদ্ধক্ষেত্রে দণ্ডায়মান। বিপুল আয়োজন, তুমুল সংগ্রাম।

মুনেম খাঁ কতকগুলি আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করিয়া মনে করিয়াছিলেন সেই সকল আশুপ্রাণনাশী কামানের গোলার সম্মুখে হস্তী দাঁড়াইতে পারিবে না কতক্ষণ যুদ্ধ করিবে, কিন্তু তাঁহার সে আশা ফলবতী হইল না। মোগলদিগের আগ্নেয়াস্ত্রের অগ্ন্যুদ্গীরণে পাঠানদিগের হস্তীগুলি চঞ্চল হইয়া উঠিলেও শেষ রক্ষা হইল না। দাউদের প্রধান সেনাপতি গুজর খাঁ বিপুল বিক্রমে শত্রুসৈন্য আক্রমণ করিলেন, তাহাতে মোগল সৈন্যাধ্যক্ষ খাঁ আলম বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক ধরাশায়ী হইলেন, মোগলসৈন্য বিব্রত হইয়া উঠিল। গুজর খাঁ অগ্রবর্ত্তী হইয়া মুনেম খাঁকে এরূপ আঘাত করিলেন যে মুনেম খাঁর হস্ত হইতে তরবারী স্খলিত হইয়া পড়িল। মুনেম্ গুজর খাঁকে কশাঘাতে ব্যতিব্যস্ত করিলেন। এই সময় মুনেম খাঁর অশ্ব ভয় পাইয়া পলাইয়া গেল, আফগানেরা অনেকদূর পর্য্যন্ত তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিল, কিয়াখাঁ আফগানদিগকে আক্রমণ করিয়া অস্থির করিয়া তুলিলেন। ইতিমধ্যে মুনেম খাঁ আপনার অশ্বকে সামলাইয়া সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিলেন। মোগলসৈন্যের অবিরাম শরবর্ষণে আফগানগণের হস্তী ও সৈন্য সকল বড়ই চঞ্চল হইল।

রাজা তোড়রমল ও লস্করখাঁ খাঁ আলিমের মৃত্যু ও মুনেম খাঁর আঘাত প্রাপ্তিতে মোগলসৈন্য ছত্রভঙ্গ হইল। তাহা দেখিয়া তোড়র-

মল্লই তাহাদিগকে উৎসাহবাক্যে বলিয়াছিলেন—"খাঁ অলেথ মারা-গিয়াছেন তাহাতে ক্ষতি কি—খানখানান পলাইয়াছেন তাহাতেই বা ভয় কি ? সাম্রাজ্য আমাদের।" ইহা বলিয়াই তিনি ক্ষান্ত হয়েন নাই, প্রভূতপরাক্রমে আফগান সৈন্য আক্রমণ করেন, তাহাতে আফগানগণ ঝটিকামুখে ধূলির ন্যায় কে কোথায় পলাইল, যাহারা পলাইতে পারিল না, তাহারা প্রাণ হারাইল। এই যুদ্ধে মোগলেরাই জয়ী হইলেন। দাউদ পলাইয়া কটকদুর্গে আশ্রয় লইলেন, ইহাই তাঁহার রাজ্যের শেষ সীমা।

রাজা তোড়রমলও অন্যান্য আমিরদিগকে দাউদের অনুসরণে পাঠাইলেন মুনেম খাঁ নিহতসেনাগণের শবসৎকার জন্য তিন চারি দিন তথায় অবস্থিতি করিলেন। রাজা তোড়রমল ভদ্রকের নিকট উপস্থিত হইয়া কটকদুর্গস্থ দাউদের সৈন্য সংগ্রহবার্ত্তা ও যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইবার কথা শুনিতে পাইলেন, অতএব বিলম্ব না করিয়া তিনি মুনেম খাঁর নিকট এই সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন। খানখানান মুনেম খাঁ তাহা প্রাপ্ত হইয়া সৈন্য সমভিব্যাহারে মহানদীতীরে উপস্থিত হইয়া শিবির সংস্থাপিত করিলেন।

দাউদ পুনঃ পুনঃ আপনার পরাভবের কথা স্মরণ করিয়া, বিশেষতঃ গুজর খাঁর মৃত্যুতে অত্যন্ত উৎকলিকাকুল হইয়া-ছিলেন তাহার উপর শত্রুর পুনরাক্রমণের আয়োজন দেখিয়া আপনাকে বড় বিপন্ন জ্ঞান করিলেন। অনেক ভাবনাবিস্তার পর তাঁহাকে সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইতে হইল। মোগল শিবিরে পাঠান দূত উপস্থিত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিয়া বলিল—' মুসলমান দ্বারা মুসলমানের প্রাণহানি সাজে না, গৌড়াধিপ বিস্তৃত বঙ্গরাজ্যের কিঞ্চিন্মাত্র আপন জীবিকার জন্য পাইলেই সন্তুষ্ট হইবেন আর

কখন বিদ্রোহাচরণ করিবেন না।" মুনেম খাঁ আমিরগণের সহিত পরামর্শ করিয়া সন্ধির প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন, এবং দাউদকে স্বয়ং উপস্থিত হইবার কথা বলিয়া পাঠাইলেন। এই প্রস্তাবে রাজা তোড়রমল বই সকলেই সম্মত হইয়াছিলেন। রাজপুত তোড়রমল দাউদকে বেশ চিনিতেন।

পরদিন মোগলশিবিরে দরবারের অনুষ্ঠান হইল। সাজসজ্জা যেমন হইবার হইল, কিছুরই ক্রটী রহিল না। সেনাপতি ও রাজকর্ম্মচারীগণ যথাযোগ্য স্থানে উপবিষ্ট হইলেন, সৈন্যগণ সুসজ্জিত হইয়া শ্রেণীবদ্ধরূপে দণ্ডায়মান হইল। দাউদ আপনার সেনাপতি ও সৈন্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া উপস্থিত হইলে মুনেম খাঁ অর্দ্ধপথ অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। উভয়ে সাক্ষাৎমাত্র দাউদ আপনার কটিদেশ হইতে তরবারি খানি খুলিয়া এই বলিয়া মুনেম খাঁকে অর্পণ করিলেন যে—"যখন আপনার ন্যায় ব্যক্তি আহতহইয়াছেন, তখন আমি যুদ্ধশ্রমে কাতর—আর না।" মুনেম তরবারি গ্রহণ করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী অনুচরকে দিলেন এবং দাউদকে দরবারে লইয়া গিয়া আপনার পাশে বসাইলেন। দরবারের কাজ আরম্ভ হইল। মিষ্টান্ন পান আতর ইত্যাদি দেওয়া হইল। দাউদ শপথ গ্রহণপূর্ব্বক বলিলেন "সম্রাট আমার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিলে আমি যাবজ্জীবন তাঁহার অতিবড়বিশ্বস্ত প্রজার ন্যায় থাকিব এবং কখন কোনপ্রকারে তাঁহার শত্রুকে সাহায্য বা সাহায্যের সহায়তা করিব না।"

এই প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিত ও স্বাক্ষরিত হইলে মুনেম খাঁ একখানি রত্নখচিত তরবারি দাউদকে উপহার দিয়া বলিলেন—"আপনি যখন প্রতাপান্বিত ভারত-সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিলেন তখন

আমি তাঁহার হইয়া এই তরবারি উপঢৌকন দিয়া ইচ্ছা করি—"আপনি তাঁহারই কাজে, তাঁহারই রাজ্যরক্ষার্থ ইহা ব্যবহার করিবেন, এবং সেই গৌরবরক্ষার্থ আমি সম্রাটের নামে আপনাকে উড়িষ্যা প্রদেশ বিনাকরে অর্পণ করিতেছি—অতঃপর আপনি বিশ্বস্তভাবে সম্রাটের অনুগত থাকিবেন।"

অতঃপর দরবার ভঙ্গ হইল, ইহার পর মুনেম খাঁ আপনার রাজধানী তোণ্ডা যাত্রা করিলেন, এবং সেখানে গিয়া দেখিলেন তাঁহার অনুপস্থিতিকালে ঘোড়াঘাটার আফগানেরা গৌড় অধিকার করিয়া বসিয়াছে। কিন্তু নবাবের আগমনবার্ত্তা অবগত হইয়া তাহারা গৌড় ছাড়িয়া পলায়ন করিল। যে সময়ে মুনেম খাঁ বাঙ্গালার সুবেদার নিযুক্ত হইয়াছিলেন সে সময়ে বাঙ্গালা দেশের রাজধানী ছিল তোণ্ডায়। দায়ুদের পিতা সোলেমানই তথায় রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন, কিন্তু তৎপুত্র মুনেম খাঁ গৌড়ের শোভা-সমৃদ্ধি দেখিয়া উহাকেই রাজধানীর উপযুক্ত বোধে তথায় রাজধানী পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। এই সময় বিষম বর্ষা উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু সুবেদারের আজ্ঞা প্রতিপালিত হইবার বিলম্ব হইল না, আমির ওমরাহেরা সকলেই তোণ্ডা হইতে গৌড়ে আসিলেন। ক্রমে বর্ষার জলে মাটী ভিজিয়া অস্বাস্থ্যকর বাষ্প নির্গত করিতে লাগিল, তাহাতে অধিবাসীগণের পীড়া জন্মিতে আরম্ভ করিল, মৃত্যুসংখ্যাও দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইয়া মহামারীকে আনিল, প্রতিদিন শত শত, সহস্র সহস্র লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল। প্রথমতঃ কয়েকদিন শবের সৎকার হইয়াছিল, ক্রমে তাহাও হইয়া উঠিল না, গঙ্গায় ভাসিতে ভাসিতে জলে পচিতে লাগিল। দুর্গন্ধে মহামারী আরও

বাড়ীতে থাকিল, কত লোক যে মরিল তাহার সংখ্যা হইল না, অনেক আমির ওমরাহও প্রাণ হারাইলেন, সঙ্গে সঙ্গে সুবেদারও গতাসু হইলেন। ইহা ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দের ঘটনা! গৌড়ের মহামারীর ন্যায় মহামারী এদেশে আর কখন হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না, ইহা-তেই গৌড় জনশূন্য অরণ্যে পরিণত ও শ্বাপদ সঙ্কুল হইয়া গিয়াছিল।

সুবেদারের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া দাউদ খাঁ আবার বঙ্গাধিকারের জন্য প্রস্তুত হইলেন, সন্ধির কথা ভুলিয়া তিনি মোগলদিগের উচ্ছেদ সাধনে, বঙ্গদেশকে আফগানগণের অধীন করিবার জন্য যুদ্ধসজ্জা আরম্ভ করিয়া দিলেন। মুনেম খাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে মোগলেরা সাহাম খাঁ নামক একজন আমিরকে বাঙ্গালার গদিতে বসাইয়া-ছিলেন, কিন্তু তিনি সর্ব্বতোভাবে অপটু, পলাইয়া হাজিপুরে আশ্রয় লইলেন, এদিকে মুনেম খাঁর মৃত্যুসংবাদ আকবরসাহের কর্ণগোচর হওয়ায় তিনি পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা হোসেন কুলি খাঁকে খাঁজেহান উপাধি দিয়া বাঙ্গালার সুবেদার নিযুক্ত করিয়া যথা সত্বর বঙ্গদেশে উপস্থিত হইবার আজ্ঞা দিলেন। কিন্তু তাঁহার সৈন্যগণকে লইয়া আসিতে বিলম্ব হইল, এদিকে দাউদ বঙ্গদেশ অধিকার করিয়া বসিলেন। সম্রাট হোসেনকুলিখাঁকে বিলম্ব করিতে দিলেন না। কিন্তু দাউদ বাঙ্গালা অধিকার করিলে পাঠানেরা দলে দলে আসিয়া তাঁহার আনুগত্য করিতে লাগিল, দাউদ ৫০ হাজার অশ্বারোহী সেনার অধিপতি হইয়া বসিলেন।

খাঁজেহান প্রথমে বঙ্গের প্রবেশদ্বার তেলিগুড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানকার দুর্গে প্রায় তিন হাজার সৈন্য অবস্থিতি করিতেছিল, তাহারা মোগলসৈন্যের গতিরোধ করিলে উভয়পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। সেই যুদ্ধে প্রায়

অর্দ্ধেক পাঠান প্রাণ হারাইল, তেলিগুড়ি মোগলদিগের অধিকৃত হইল। খাঁ জেহান সেখান হইতে তোণ্ডায় উপস্থিত হইয়া শুনিলেন দাউদ পলাইয়া আগমহলে শিবির সংস্থাপিত করিয়াছেন। (পরে মানসিংহের আমলে ইহা রাজমহল নামে খ্যাত হয়।) এই স্থানের একদিকে প্রবলতরঙ্গা গঙ্গা অপর দিকে অত্যুচ্চ ভূধরমালা তাহাকে দুর্ভেদ্য করিয়া রাখিয়াছে। দাউদ আপন শিবিরের চতুর্দ্দিকে পরিখা দ্বারা তাহাকে আরও দুরাক্রম্য ও সুরক্ষিত করিলেন।

খাঁজেহান আগমহল আক্রমণ করিলে উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম—দীর্ঘকালের যুদ্ধে খাঁজা আবদুল্লা নামে মোগল সেনাপতি প্রাণ হারাইলেন, সম্রাট এই সংবাদ অবগত হইয়া পাটনার শাসনকর্ত্তা মজঃফর খাঁকে খাঁজেহানের সাহায্যার্থে উপস্থিত হইবার আজ্ঞা দিলেন। মজঃফর খাঁ পাঁচ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া আগমহল পৌঁছিলেন এবং বিপুলবিক্রমে উভয়ে আফগানগণকে আক্রমণ করিলেন, আগরা হইতে জলপথে এক দল গোলন্দাজ সৈন্য আসিয়া তাহাদের সঙ্গে জুটিল। পাঠানেরা বল বিক্রমের প্রভূত পরিচয় দিলেও তাহাদিগকে পরাভূত হইতে হইল—কারণ দাউদের ভ্রাতা জুনেদ খাঁ প্রবল পরাক্রম প্রদর্শন করিয়া ধরাশায়ী হইলেন, দাউদের বিশ্বস্ত সেনাপতি কতলু খাঁ মোগলদিগের নিকট কয়েকটী পরগণা প্রাপ্তির লোভে আপনার সৈন্য লইয়া সরিয়া পড়িলেন। দাউদের অশ্বের পদ কর্দ্দমে প্রোথিত হওয়ায় তিনি মোগল সেনাপতি হোসেন বেগ দ্বারা বন্দী হইয়া খাঁজেহানের নিকট নীত হইলেন। শৃঙ্খলাবদ্ধ দাউদ ক্ষোভে লজ্জায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া জল ভিক্ষা করিলে মোগলনায়ক

খাঁজেহান আপন পানপাত্র হইতে তাঁহাকে জল দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি মুসলমান হইয়া শপথ গ্রহণে যে সন্ধি করিয়াছিলেন, তাহা ভঙ্গ করিলেন কেন ?"

দাউদ উত্তর করিলেন—"সে সন্ধি মুনেম খাঁর সহিত ব্যক্তিগত ভাবেই হইয়াছিল।"

দাউদ অতি সুপুরুষ ছিলেন, খাঁজেহান তাঁহার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া প্রাণনাশে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, এবং এ সংসারে দীর্ঘজীবী হইবার কাহার না সাধ হয়, দাউদেরও প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ছিল। কিন্তু আমিরগণ কিছুতেই সম্মত হইলেন না, দাউদের প্রাণরক্ষা করিলে তাঁহাকে সম্রাটের বিরাগভাজন হইতে হইবে। অতএব কোন মতেই তাহা কর্ত্তব্য নহে। খাঁজেহান দাউদের বিশ্বাসঘাতকতা স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিলেন। জল্লাদের দুই অস্ত্রাঘাতেও দাউদের মুণ্ড দেহচ্যুত হইল না, তৃতীয় বারে তাহা ভূতলে লুণ্ঠিত হইল। সেই ছিন্নমুণ্ড সৈয়দ আবদুল্লা খাঁর হেপাজতে সম্রাটের নিকট প্রেরিত হইল। কারণ তাহা দেখিবার জন্য আকবরের অত্যন্ত আগ্রহ জন্মিয়াছিল।

দাউদ যে একজন সুপ্রসিদ্ধ পাঠান বীর সে পক্ষে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আপনার জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য তিনি যাহা করিয়াছিলেন, অন্য কোন পাঠান বীরকে তদ্রূপ করিতে দেখা যায় না। কিন্তু দাউদ বিশ্বাসহন্তা—সম্রাট তাঁহার পিতৃবন্ধু, তাঁহার অনুগত আশ্রিত থাকিলে এদশা ঘটিত না, যে ঐশ্বর্য্যস্বত্বে তাঁহার পিতা আকবরের অধীনতা স্বীকারে কুণ্ঠিত হয়েন নাই, সেই পিতৃবন্ধুর বৈরতাচরণে তাঁহার এই শোচনীয় পরিণাম উপস্থিত হইল। দাউদকে দিয়াই বঙ্গে পাঠানরাজত্বের ভিত্তি শিথিল

হইল। দাউদ্ই বঙ্গের শেষ পাঠানরাজ, তাঁহার পরে আর কোন পাঠান বঙ্গের সিংহাসনে স্থান পান নাই। পাঠান বংশ ২৩৬ বৎসর প্রায় অবিচ্ছেদে বঙ্গদেশে আধিপত্য করিল।

ফলে দাউদের নিধনেই যে পাঠানেরা নিরুপদ্রব ছিল এমন কথা বলিতে পারা যায় না। খাঁজেহান আগমহলের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া সপ্তগ্রামের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। দাউদের পরিজনগণ তৎকালে তথায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহাদের সুরক্ষার জন্য দাউদের অনুগত জমশেদ ও মিট্টু নামক দুইজন সেনাপতি সসৈন্যে তথায় অবস্থিতি করিতেছিলেন তাঁহারা খাঁজেহানের গতিরোধ করিলেন, কিন্তু সফলকাম হইতে পারিলেন না—মোগলসেনার দ্বারা বন্যার মুখে তৃণগুচ্ছের ন্যায় ভাসিতে লাগিলেন। দাউদের জননী দাঁতে কুটা করিয়া খাঁজেহানের অনুগ্রহ ভিক্ষা করিলেন। খাঁজেহান তাঁহাদের উপর অত্যাচার না করিয়া ছাড়িয়া দিলেন।

বখতিয়ার খিলিজীর সময় হইতে বঙ্গের পাঠান নরপতিগণ আপনাদের জন্য কয়েকটী সরকার বা পরগণা রাখিয়া অবশিষ্ট রাজ্য অধীন আমিরগণকে বণ্টন করিয়া দিতেন। তাঁহারা আপনাপন সৈন্য পোষণ করিতেন, তাহাদের অধিকাংশই আপনাদের আত্মীয়স্বজন বই অপর কেহ নহে। তাহারা আপনারা সেই সকল জমি আবাদ করিত না কিন্তু এক একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূখণ্ডের মালিক হইয়া হিন্দু প্রজার সহিত জমি বিলিবন্দোবস্ত করিত। তাহারাই জমির চাষ করিত, শাসনব্যবস্থা মালিকেরাই করিতেন, যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত বা অন্য কোন কারণে নবাবের প্রয়োজন হইলে তাঁহাদিগকে প্রায়ই স্থানান্তরে থাকিতে হইত সুতরাং এই সকল

ক্ষুদ্র সম্পত্তির রীতিমত পরিচালনা হইত না। ফলে প্রজারা অনেকটা নিরুদ্রবে আপনাদের জমির চাষ করিয়া সুখস্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে পারিত। কৃষিকার্য্যেরও বিলক্ষণ উন্নতি ছিল।

উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণের অবস্থা ভাল ছিল না, কিন্তু পাঠান সর্দ্দারগণ সর্ব্বদা রাজকার্য্যের জন্য বিদেশবাস প্রযুক্ত আপনাদের জমি জায়গা ধনবান্ হিন্দুদিগকে ইজারা বিলি করিতেন। তাঁহারা আপনারা সেই সকল ভূসম্পত্তির খাজনা আদায় করিতেন, প্রজাগণের সুখদুঃখের জন্য যখন যাহা করিবার করিতেন। পথঘাট শিল্প বাণিজ্যাদি সমস্তই দেখাশুনা করিতেন।

পাঠান রাজাদিগের শক্তিসামর্থ্য ও রাজকার্য্য পরিচালনার উপর তাঁহাদের কর্তৃত্ব রক্ষা পাইত। তাঁহারা স্বেচ্ছাচারী রাজার ন্যায় কাল কাটাইতেন, আবার কখন কখন তাঁহাদের শাসনশক্তি সঙ্কুচিত হইয়া আপন রাজধানীর মধ্যে নিবদ্ধ থাকিত। সামান্য ভৃত্যের দ্বারা অপমানিত, এমন কি নিহত হইতেও শুনা গিয়াছে।

খাঁজেহান যুদ্ধের অবসানে পাঠানশিবির লুণ্ঠন করিয়া বহুমূল্য ধনরত্ন প্রভৃত সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং অনেক হস্তীও তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল। যে সকল পাঠান পলাইয়া বিহারের পার্ব্বত্যপ্রদেশ আশ্রয় করিয়াছিল, তাহাদিগকে দূরীভূত করিয়া রোটাসদুর্গ অধিকারের জন্য তিনি মজঃফর খাঁকে পাঠাইয়া দিলেন। ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে তাহা মোগলদিগের অধিকৃত হইল। এই বৎসরেই তোণ্ডার নিকটবর্ত্তী স্থানে খাঁজেহানের পরলোক প্রাপ্তি ঘটে। মোগলাধিকৃত রাজ্যের সুবন্দোবস্ত করা তাঁহার অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠিল না।

খাঁজেহানের মৃত্যুসংবাদ সম্রাটের কর্ণগোচর হইলে তিনি বড়ই সন্তপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার ভ্রাতা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনকে খেলাত ও সান্ত্বনাসূচক পত্র দিয়া তাঁহাদের শোকাপনোদনের ব্যবস্থা করিলেন এবং তাঁহার স্থানে একজন বলবিক্রমশালী সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করা উচিত বিবেচনায় রোটাস বিজয়ী মজঃফর খাঁকে বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার সুবেদার নিযুক্ত করিয়া রায় পাত্রদাসকে এবং মীর আদমকে রাজস্ব সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, রিজবী খাঁকে বেতনবণ্টক এবং আবুলফতে খাঁকে প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত করিলেন। অচিরকাল মধ্যে এই বন্দোবস্তের সুফল ফলিয়াছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী শাসনকর্ত্তা যুদ্ধের ব্যয় সংকুলান ব্যপদেশে সম্রাটের নিকট কিছুই পাঠাইতে পারেন নাই। প্রথম বৎসরেই মজঃফর খাঁ নগদ পাঁচ লক্ষ টাকা, বহুসংখ্যক হস্তী এবং বহুমূল্য উপঢৌকন পাঠাইয়া দিলেন। যৎকালে মুনেম খাঁ বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তৃত্ব লাভ করেন তৎকালে তিনি মুজনান খাঁ নামক জনৈক আমিরকে ঘোড়াঘাট জায়গীর অধিকারের জন্য পাঠাইয়াদেন। মুজনান ঘোড়াঘাটের জায়গীর অধিকার করিয়া আপনার অধীন আমির-গণের মধ্যে তাহা ভাগ করিয়া দেন। মোগল আমিরগণ তাহাতে বেশ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। খাঁজেহানও পাঠানদিগকে বঙ্গদেশ হইতে দূরীকরণার্থ সেই সকল জায়গীরের স্বত্বাধিকারে হস্তক্ষেপ করেন নাই, কিন্তু যখন সম্রাট আকবরসাহ সৈনিকপুরুষদের বেতনের বন্দোবস্ত করিয়া ঐ সকল জায়গীরভোগী আমিরগণকে তাঁহাদের অধীন সৈন্যগণের বেতনের হিসাব চাহিয়া পাঠাইলেন, ও বাকী রাজস্ব সরকারী তহবিলে জমা দিবার এবং যাহাতে তাঁহারা আপনাপন জায়গীর মধ্যে দীর্ঘকাল অবস্থিতি না করিয়া

মধ্যে মধ্যে স্থানান্তরিত হইবেন এই আজ্ঞা প্রচার করিলেন, তখন তাঁহারা যারপর নাই অসন্তুষ্ট হইয়া সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। সর্ব্বপ্রথম এই আজ্ঞা জলেশ্বরের জায়গীরদার খালাদী খাঁ এবং ঘোড়াঘাটের জায়গীরদার বাবা খাঁর উপর প্রদত্ত হইলে তাঁহারা তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া, কাহার কোন কথা না শুনিয়া, গৌড় অধিকার করিলেন এবং আপনাদের অধীন জায়গীরদারগণকে বলিয়া দিলেন— পথেঘাটে যেখানে যখন সরকারী রাজস্ব রাজধানীতে যাইতে দেখিবেন তখনই তাহা লুণ্ঠন করিয়া লইবেন। সম্রাট এই সংবাদ পাইবামাত্র পাছে মোগল জায়গীরদারগণের মধ্যে এরূপ বিদ্রোহাচরণ সংক্রামক হয় তজ্জন্য তিনি বঙ্গের শাসনকর্ত্তাকে তাঁহার অসাবধানতর জন্য তিরস্কার করিয়া পাঠাইলেন এবং বিদ্রোহীগণ শান্ত হইলে সম্রাটের ক্ষমা লাভ করিবে ইহাও বলিয়া দিলেন। নবাব ইহাতে বড়ই দুঃখিত হইলেন এবং বিদ্রোহী আমিরগণকে সম্রাটের আজ্ঞা অবগত করিলেন। তদুত্তরে বিদ্রোহীগণ বলিয়া পাঠাইলেন রাজস্ব সচিব-পাত্র দাস এবং খালসা বিভাগের বেতনবণ্টক রিজ্‌বি খাঁ আপনারা আসিয়া সম্রাটের আজ্ঞা ঘোষণা করেন। কিন্তু তাঁহারা দুইজনে নদী পার হইবামাত্র ধৃত ও বন্দী হইলেন এবং বিদ্রোহীগণ আপনাদের দাবি আরও বলবৎ করিয়া লইল।

বিহারেও এইরূপ রাজস্বসচিব ও বেতনবণ্টক নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও পূর্ব্বোক্তপ্রকারে সম্রাটের আজ্ঞা পরিচালনায় প্রবৃত্ত হইয়া সৈনিকপুরুষগণের বিরাগভাজন হইলেন। মসুম কাবুলী নামে একজন আমীরের অধীনে বিহারের সেনাগণ অস্ত্রধারণ করিয়া সেখানকার রাজস্বসচিবকে বিনষ্ট করিল, বেতনবণ্টক

আমির পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করিলেন। বিহারের বিদ্রোহীগণ তেলি-গুড়ির পথ পরিষ্কার করিয়া বঙ্গের বিদ্রোহীগণের সহিত মিলিত হইল। এই সম্মিলিত বিদ্রোহীগণ তোণ্ডা আক্রমণ করিল, কিন্তু সেখানকার দুর্গ শত্রুর আক্রমণ রক্ষার উপযুক্ত ছিল না, বিদ্রোহীরা দিনে দিনে আপনাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে লাগিল। মজঃফর খাঁ তাহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলেও নিহত হইলেন, বিদ্রোহীরা তাঁহার ধনসম্পত্তি সমস্ত লুণ্ঠন করিল। রাজকয়েদীগণের মধ্যে সৈফউদ্দিন হোসেন নামক একজন আমিরকে দেখিতে পাইয়া বিদ্রোহীরা তাঁহাকে একজন প্রধান পুরুষ বলিয়া মানিয়া লইল এবং তাঁহার বন্দিত্ব মোচন করিল। সৈফউদ্দিনকে সম্রাট বঙ্গদেশে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন।

এই অভাবনীয় অদ্ভুত ঘটনায় বাঙ্গালা ও বিহার আকবরের হস্তস্খলিত হইয়া গেল। এখন ৩০ হাজার মোগলসেনা তাঁহার শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। ইহা ১৫৮০ খৃষ্টাব্দের ঘটনা।

রাজা তোড়রমল—এই দুর্ঘটনার কথা আগ্রায় সম্রাটসমীপে পৌঁছিলে তিনি সজাতীয়ের উপর আর বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিয়া হিন্দুরাজ তোড়রমলকে বঙ্গদেশে পাঠাইয়া হুকুমনামা দিলেন যে পথিমধ্যে নবাব সুবেদার জমিদার জায়গীরদার প্রভৃতি সকলেই বিদ্রোহদমনের জন্য তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইয়া কাজ করেন। তোড়রমল জৌনপুরে উপস্থিত হইলে সেখানকার শাসনকর্ত্তা মহম্মদ মুসুম ফারজন্দী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তিন হাজার সৈন্য সহ আপনি তাঁহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন।

রাজা তোড়রমল অবাধে মুঙ্গেরে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন যে ৩০ হাজার বিদ্রোহী ৩৮ মাইল দূরবর্ত্তী ভাগলপুরে তাঁহাদের সহিত

যুদ্ধার্থ অপেক্ষা করিতেছে। যাহা হউক তিনি মুঙ্গেরদুর্গ অধিকার করিয়া সেখান হইতে পর্ব্বতশ্রেণী পর্য্যন্ত সেনানিবাস প্রশস্ত করিতে লোক লাগাইলেন। রাজা আপনার আশ্রয়কে সুদৃঢ় করিয়া তথায় কয়েক মাস অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে উভয় পক্ষে ছোটখাট যুদ্ধও চলিতে লাগিল, দুইজন মোগল আমির তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া বিদ্রোহীদের সহিত মিলিত হইলেন। রাজা তোডরমল হিন্দুরাজাদিগকে হস্তগত করিয়া শত্রুসৈন্যের রসদ বন্ধ করিয়া দিলেন। জঠরজ্বালার তুল্য যন্ত্রণা আর নাই—যাহার জন্য জননী পুত্রের মুখ চাহেন না, পত্নী পতির আনুগত্য ত্যাগ করে, পতি পত্নীকে পথে ফেলিয়া পলায়, বঙ্গের দুর্ভিক্ষে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। শত্রুভাবাপন্ন মোগলসৈন্যগণের খাদ্যাভাব উপস্থিত এবং সর্দ্দার খাঁর মৃত্যু ঘটনায় তাহারা অবসন্ন হইয়া পড়িল।

মাসুমখাঁ কাবুলী বিহার যাত্রা করিলেন, এবং জেবাবর্দ্দি তোণ্ডার নিকটবর্ত্তী খুরাসপুরে ফিরিয়া আসিলেন, আর আরব বাহাদুর অন্য পথ দিয়া গিয়া অকস্মাৎ পাটনা আক্রমণ করিলেন—পাটনায় বেশী সৈন্য ছিল না, রাজা তোডরমল এই সংবাদ পাইয়া পাটনায় সৈন্য পাঠাইলেন, এবং আপনি বিহার যাত্রা করিলেন, পথিমধ্যে রাত্রিকালে শত্রুগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া তিনি এরূপ কৌশলে আপনার সৈন্য পরিচালনা করিলেন যে বিপক্ষেরা পলাইবার পথ পাইল না, অনেকে প্রাণ হারাইল। বিহারের কোন দুর্গই আফগানদের পক্ষে নিরাপদ বোধ না হওয়ায় তাহারা বঙ্গদেশে প্রস্থান করিল। রাজা তোডরমলের বুদ্ধি ও যুদ্ধকৌশলে বিহার সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিল। ১৫৮০ খৃষ্টাব্দের বর্ষাকালে রাজা আপনার

সৈন্যগণকে হাজিপুরের নিকট স্থাপিত করিয়া সম্রাটকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে—উজির সা মনসুরাদি আমিরগণের যুদ্ধযাত্রায় যে ব্যয় হইয়াছিল তাহার ও বাকী টাকা মিটাইয়া দিবার কথা বলিয়া বড়ই অন্যায় কাজ করিয়াছেন, এই অরাজনৈতিকের ন্যায় কাজে সৈন্যগণ সকলেই বিগড়াইয়া ছিল—তাহাতে রাজকীয় স্বার্থের বিলক্ষণ অপচয় ঘটিয়াছে। তিনি এ কথাও লিখিয়াছিলেন যে মসুম ফারনজুদ্দিকে রাজভক্তিহীন সন্দেহে সসৈন্যে জৌনপুরে ফিরিয়া আসিবার আজ্ঞা দেওয়াও ভাল হয় নাই।

সম্রাট রাজা তোডরমলের এই পত্রের যৌক্তিকতায়, এরূপ বিচলিত হইয়াছিলেন যে অবিলম্বেই উজিরকে পদচ্যুত করিতে হইল। এই স্বজাতীয় বিদ্রোহে আকবরের সিংহাসন এতই বিচলিত হইয়াছিল যে তাঁহাকে প্রত্যেক বিদ্রোহী আমিরের বাড়ী বাড়ী গিয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিতে হইয়াছিল। আজিম খাঁ মৃজা নামক একজন সম্ভ্রান্ত আমিরকে পাঁচ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়কতা দিয়া তাঁহাকে বিহারের শাসনকর্ত্তা হইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করা হইল। সেরিফ খাঁ নামক আর একজন আমিরকে খেলাত দিয়া দরবারে আসিয়া পূর্ব্ববৎ সুযুক্তি সুপরামর্শ দিবার কথা বলা হইল, মসুম ফারনজুদ্দীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তাঁহাকে অযোধ্যার নবাবী দেওয়া হইল, তোডরমলের অধীন সেনাপতি তাবসুম খাঁকে জৌনপুরের শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠান হইল। কিন্তু ফারনজুদ্দী অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়াই শত্রুপক্ষে মিশিয়া গেল। রাজা তোডরমল আপনার অধীন সেনাপতি সাহাবাজ খাঁকে অযোধ্যায় পাঠাইয়া দিলেন। সাহাবাজ খাঁ মসুম ফারনজুদ্দীকে পরাস্ত করিয়া তাহার স্ত্রীপুত্র পরিজন ও ধনসম্পত্তি কাড়িয়া লইলেন।

অযোধ্যা শান্তিময় হইল। আজিম খাঁ বিহারে আসিয়া বল অপেক্ষা আপোষ নিষ্পত্তির উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া তিনি খৃঃ ১৫৮২ অব্দে সম্রাটের নিকট আগ্রায় উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বরাজ্যের বিশৃঙ্খল অবস্থার বিষয় তাঁহার সুগোচর করিল। সম্রাট বিশেষ মনোযোগের সহিত বঙ্গদেশ সুশাসনে রাখিবার জন্য চিন্তা করিতে গিয়া বিভক্তরাজশক্তির অপকারিতা উপলব্ধি করিলেন, এবং মোগল আমিরেরা হিন্দু সুবেদারের অধীনতায় সন্তুষ্ট থাকিবে না বুঝিয়া তোডরমলকে রাজস্ব সচিব করিয়া আপনার নিকটে রাখিলেন এবং আজিম খাঁকে খাঁ আজিম উপাধি দিয়া বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠাইলেন।

খাঁ আজিম—খাঁ আজিম বঙ্গরাজ্যের শাসনকর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়া কলেকৌশলে বিদ্রোহী মোগল সেনাপতিগণকে শান্ত করিলেন, তাঁহারা সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণে নিরস্ত হইলেন। ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে তিনি বঙ্গদেশে আপনার ক্ষমতা সুপ্রতিষ্টিত করিলেন, বঙ্গদেশ শান্তিময় হইল। কিন্তু মোগল সেনাপতিগণের বিদ্রোহকালে উড়িষ্যার পাঠানেরা আপনাদের শক্তি সঞ্চয় করিতেছিল। সম্রাটের গৃহবিচ্ছেদের সুযোগে তাহারা আপনাদের স্বাধীনতা রত্নের পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় ছিল। এই সময়ে পাঠানেরা কতলু খাঁর অধীনে সর্ব্বতোভাবে স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া মেদিনীপুর, বিষ্ণুপুর, জাহানাবাদ প্রভৃতি অধিকার করিয়া দামোদর নদের পশ্চিমদিকবর্ত্তী সমস্ত দেশে আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিল, দামোদর তাহাদের রাজ্যের পূর্ব্ব সীমা হইল।

খাঁ আজিম খৃঃ ১৫৮৩ অব্দে এই দুর্দ্ধর্ষ আফগানগণের দৌরাত্ম্য দূরীকরণে মনোনিবেশ করিলেন। এই সময়ে আকবরের রাজস্ব

সচিব রাজা তোডরমল বঙ্গদেশের যাবতীয় খালসা ও জায়গীর জমির রাজস্বের হিসাব প্রস্তুত করেন, তাহা অদ্যাপি "ওয়াশিল তুমার জমা" নামে প্রসিদ্ধ, মোগলরাজত্বে ইহাই সর্ব্বপ্রথম রাজস্বের বন্দোবস্ত, এতদ্দ্বারা বঙ্গদেশের বার্ষিক রাজস্ব এক কোটী সাত লক্ষ টাকা নির্দ্দিষ্ট হয়।

কতলু খাঁর বিদ্রোহবার্ত্তা অবগত হইয়া বাঙ্গালার নবাব বর্দ্ধমানের শাসনকর্ত্তা ফরিদ উদ্দিন বোখারীকে তাঁহার বিরুদ্ধে পাঠাইয়া দিলেন। ইনিই সম্রাট জাহাঙ্গীরের চরিতাখ্যায়ক। ফরিদ তিন শত অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া বর্দ্ধমান হইতে যাত্রা করিলে কৈয়ড়ের * দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী কোন গ্রামসমীপে উভয় পক্ষে সাক্ষাৎ হইল। কতুব খাঁ ফরিদের সম্মানার্থ এক ভোজের অনুষ্ঠান করিলেন। ফরিদ নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলে কতলু খাঁ আপনার সেনাপতি বাহাদুর খাঁকে তাঁহার সহিত পরিচিত করিয়া দিলে ফরিদ আপনাকে মহম্মদের বংশধর এবং সম্ভ্রান্ত সৈয়দবংশসম্ভূত বলিয়া তাঁহাকে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন না করায় বাহাদুর খাঁ ক্রুদ্ধ হইয়া আপনার অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য উঠিয়া যাইলে, ফরিদ তাহা জানিতে পারিয়া অসুস্থতার ভাণ করিয়া আপন শিবিরে চলিয়া আসিলেন। কতলু খাঁ সম্ভবতঃ তাহা টের পান নাই। যাহাই হউক বাহাদুর খাঁ অবিলম্বে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার কতকগুলি অনুচরকে মারিয়া ফেলিলেন। এই সংবাদে মোগল সেনাপতি ক্রুদ্ধ হইয়া বর্দ্ধমান

* ষ্টয়াট সাহেব এই স্থানকে "খোবম" বলিয়াছেন বস্তুগত্যা বর্দ্ধমানের দক্ষিণে ঐ নামের কোন গ্রাম অদ্যাপি নাই। কৈয়ড়ের অনতিদূরে এক প্রকাণ্ড পতিত ডাঙ্গার উপর প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ বলিয়া অনুমান হয়।

হইতে যাত্রা করিয়া কতলু খাঁকে তাড়াইয়া দিলেন—তিনি পলাইয়া বনে জঙ্গলে আশ্রয় লইলেন।

খাঁ আজিমের সহিত যে সকল সৈন্য ও সেনাপতি এদেশে আসিয়াছিলেন তাঁহারা উড়িষ্যাধিকারে যাইতে অস্বীকার করায় খাঁ আজিম খৃঃ ১৫৮৪ অব্দে বঙ্গদেশের শাসনভার ত্যাগ করিয়া আগ্রা যাত্রা করিলেন।

সাহাবাজ খাঁ।—ইনি রাজা তোডরমলের রাজত্বকালে ঘোড়াঘাটার জায়গীরদারগণের প্রতিকূলে যাত্রা করিয়া তাঁহাদের জায়গীর সকলে উদ্ধারসাধনে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া সম্রাট তাঁহাকে এদেশের শাসন কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত করেন। কিন্তু বঙ্গদেশে আসিয়া ঘোড়াঘাটার জায়গীরদারগণের পুনরায় বিদ্রোহাচরণ প্রত্যক্ষ করিয়া বড়ই ক্ষুণ্ণ ও আপনাকে বিপন্ন বোধ করিলেন। জায়গীর পুনরুদ্ধারে নিরাশ হইয়া তিনি তাহাদিগকে আর কোন কথা বলিলেন না, নিরাপত্তিতে তাহাদিগকে জায়গীর ভোগ করিতে দিলেন, এবং কতলু খাঁর সহিত এই সর্ত্তে সন্ধি করিলেন যে তাহারা উড়িষ্যা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকে, বঙ্গদেশে আসিয়া পূর্ব্ববৎ অত্যাচার উপদ্রব না করে। কিন্তু সম্রাট এই সন্ধিতে সম্মতি দিলেন না, নবাব প্রভূত অর্থ লাভ করিয়া এই অপমানজনক কাজ করিয়াছেন বলিয়া সন্দেহ করিলেন, এবং উজির খাঁকে বঙ্গদেশের শাসনভার দিয়া, তাঁহাকে আগ্রা যাইবার আদেশ পাঠাইলেন, সাহাবাজ আগ্রা পৌছিয়া তিন বৎসর বন্দিত্বে রহিলেন।

উজির খাঁ।—ইনি বঙ্গদেশের নবাবী লইয়া বেশী দিন ভোগ করিতে পারেন নাই, এখানে আসিয়া তাঁহাকে পূরা একটী বৎসরও নবাবী করিতে হয় নাই, বর্ষকাল মধ্যেই পরকালবাস আশ্রয়

করিতে হইয়াছিল। তোণ্ডা নগরেই এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল, এই অল্প সময় মধ্যে তিনি কিছুই করিয়া যাইতে পারেন নাই।

রাজা মানসিংহ—উজির খাঁর মৃত্যু সংবাদ পাইয়া সম্রাট আম্বরের অধিপতি মানসিংহকে বঙ্গের শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠাইলেন। ইনি সম্রাটপুত্র সেলিমের (জাহাঙ্গীরের) শ্যালক। রাজা তৎকালে পেশোয়ারে আফগানবিদ্রোহ দমনে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহার বিলম্বসম্ভাবনায় সৈয়দ খাঁ কিয়দ্দিন তাঁহার স্থলে কাজ করিয়াছিলেন।

খৃঃ ১৫৮৯ অব্দে মানসিংহ পাটনায় আসিয়া উপস্থিত হইয়া হাজিপুরের জমিদার পূরণ মলের অবাধ্যতা নিবারণের জন্য প্রস্তুত হইলে পূরণ মল ভীত হইয়া অনেক টাকা ও হস্তহস্তী উপঢৌকন দিয়া তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করিলেন, পূরণ মল মার্জ্জনা লাভ করিয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিলেন। মানসিংহ সমস্ত টাকাকড়ি হাতীঘোড়া যাহা পাইলেন সমস্তই সম্রাটের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

এই ঘটনাকে সুমঙ্গলের লক্ষণ মনে করিয়া সম্রাট তাঁহাকে সম্মানের পরিচ্ছদ এবং সন্তোষজ্ঞাপক পত্র পাঠাইয়া দিলেন।

ঘোড়াঘাটার কয়েকজন মোগলসেনাপতির লুণ্ঠনাভিলাষে যশোহর অঞ্চলে হস্ত প্রসারিত করিবার সংবাদ পাইয়া রাজা তাঁহার পুত্র জগৎসিংহকে তথায় পাঠাইয়া দিলেন। বিদ্রোহী মোগলেরা ভয়ে পলাইয়া বনেজঙ্গলে লুকায়িত হইল। কুমার জগৎসিংহ তাহাদের শস্ত্রাগার ও আটত্রিশটী হস্তী লুণ্ঠন করিয়া হাতী গুলি সম্রাটের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। বঙ্গদেশের জলবায়ু রাজাকে সহ্য না হওয়ায় তিনি সৈয়দ খাঁকে আপনার নায়েবরূপে তোণ্ডায় রাখিয়া আপনি বিহারে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে তিনি রোটাশ দুর্গের জীর্ণসংস্কার করিয়া তাহার পুরোভাগে যে একটী বৃহৎ তোরণ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ অদ্যাপি দৃষ্টিগোচর হয়। আপনার সাময়িক বাসের জন্য একটী সুন্দর সৌধনির্ম্মাণ, পুরাতন জলাশয় গুলির পঙ্কোদ্ধার এবং রমণীয় উদ্যান প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। খৃঃ ১৫৯০ অব্দে তিনি উড়িষ্যার পাঠানগণের হস্ত হইতে তদ্দেশের উদ্ধারসাধন জন্য যুদ্ধ যাত্রার সঙ্কল্প করেন, এবং বিলম্ব না করিয়া ভাগলপুরে আসিয়া বহুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া সৈয়দ খাঁকে কাটোয়ার পথ দিয়া বর্দ্ধমানে তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য লিখিয়া পাঠাইলেন। আপনি বর্দ্ধমানে পৌছিয়া সৈয়দ খাঁর এক পত্র পাইলেন তাহাতে লিখিত ছিল—সম্মুখে বর্ষা আসিতেছে, এসময়ে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আফগানদিগের প্রতিকূলে উড়িষ্যাযাত্রা বড়ই কষ্টসাধ্য হইবে, অতএব বর্দ্ধমানে বর্ষা কাটাইলে তিনি তাঁহার সহিত মিলিত হইতে পারিবেন। এই সংবাদ পাইয়া রাজা বড়ই নিরুৎসাহ হইলেন কিন্তু উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি সৈন্যগণের বর্ষা কাটাইবার জন্য দারকেশ্বর নদীর তীরবর্ত্তী জাহানাবাদ (আধুনিক আরামবাগ) নামক স্থানে শিবির নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিলেন। মোগলসৈন্য আসিয়া জাহানাবাদে অবস্থিতি করিল। পাঠান সেনাপতি কতলু খাঁ সংবাদ পাইয়া জাহানাবাদের পঞ্চাশ মাইল দূরবর্ত্তী ধারপুর নামক স্থানে আপনার এক দল সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা সেখানে আসিয়া চতুর্দ্দিকবর্ত্তী জনস্থান সমূহ লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিয়াছে শুনিয়া রাজা মানসিংহ কুমার জগৎসিংহকে জাহানাবাদে পাঠাইয়া দিলেন। তিনি আসিয়া বিদ্রোহীগণকে বহুদূরে তাড়াইয়া দিলেন।

পাঠানেরা সন্ধির কথা তুলিয়া কতলু খাঁর নিকট হইতে সৈন্য পাইবার আশায় অপেক্ষা করিতে লাগিল। রাজকুমার প্রতারিত হইলেন। সন্ধির কথা সব মিথ্যা। যেদিন তাহারা আপনাদের দলপুষ্টি করিতে পারিল সেই দিন রাত্রিকালে অকস্মাৎ মোগল শিবির আক্রমণ করিয়া জগৎসিংহকে বন্দী এবং বহুসংখ্যক সৈন্যের প্রাণ নষ্ট করিল। যাহারা বাঁচিল তাহারা প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল। পাঠানেরা জয়োল্লাসে প্রমত্ত হইয়া উঠিল। রাজা মান-সিংহ এই মানহানিকর ব্যাপারে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার দুঃখের সীমা রহিল না, কারণ শত্রুরা তাঁহার পুত্রকে বন্দী করিয়া বিষ্ণুপুরে লইয়া গিয়াছিল। দুই তিন দিন পরে গুজব উঠিল সেখানে তাঁহাকে তাহারা মারিয়া ফেলিয়াছে।

রাজার সৌভাগ্যক্রমে কতলু খাঁ পীড়িত ছিলেন, এই সময়ে দেহত্যাগ করিলেন। তাঁহার পুত্রদের মধ্যে কেহই সাবালক ছিল না বলিয়া আফগান সর্দ্দারেরা জগৎসিংহকে ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার দ্বারা সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইল। ইহাই জগৎসিংহের বিষ্ণুপুর হইতে জাহানাবাদযাত্রা—ইহা হইতেই "দুর্গেশনন্দিনীর সূচনা"।

এখনও বর্ষাকাল শেষ হয় নাই—এসময় রাঢ়দেশের পথঘাট সর্ব্বত্র সুগম নহে, জলকাদায় পরিপূর্ণ। আকাশ দিবারাত্র মেঘাচ্ছন্ন, অবিরল ধারায় বারিবর্ষণ হইতে থাকে, কৃষকেরা মাঠে ধান্যরোপণে ব্যস্ত, এক স্থান হইতে অন্যস্থানে যাওয়াআসা মহা কষ্টকর। অতি কষ্টে কতলু খাঁর মন্ত্রী খোজা ইশা আপনার প্রভু পুত্রগণকে সঙ্গে হইয়া সন্ধির প্রার্থনায় জাহানাবাদের দারকেশ্বর তীরবর্ত্তী মোগলশিবিরে উপস্থিত হইয়া দেড়শত হস্তী এবং বহু

মূল্য রত্নাদি উপঢৌকন দিলেন। জাহানাবাদের ফৌজদারী কাছারীর উত্তরে এখনও সেই শিবিরের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। তদনন্তর এই সকল সর্ত্তে সন্ধিপত্র লিখিত হইল যে—আফগানেরা উড়িষ্যার অধিকার পাইলে, সম্রাটের নামে মুদ্রা অঙ্কিত করিবে। সরকারী সমস্ত হুকুমনামায় সম্রাটের নাম থাকিবে এবং জগন্নাথের মন্দির এবং তৎপ্রদেশ মোগলদিগকে ছাড়িয়া দিবে। কতলু খাঁর পুত্রগণকে সাদর সম্বর্দ্ধনা করিয়া রাজা তাঁহাদিগকে সম্মানের পোষাক পরিচ্ছদ পরাইয়া উড়িষ্যায় পাঠাইয়া দিলেন।

এই সন্ধির সংবাদে সম্রাট যদিও সন্তোষলাভ করিতে পারেন নাই, কিন্তু রাজার সম্মানরক্ষার্থ সন্ধিপত্র নামঞ্জুর করেন নাই। এই সন্ধি দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। দুই বৎসর পরে ইশা খাঁর মৃত্যু হইলে দুর্দ্ধর্ষ পাঠান সন্ধির সর্ত্ত নষ্ট করিয়া জগন্নাথের মন্দির আক্রমণ করিল। ধার্ম্মিক রাজা ইহাকে দেবমন্দিরের অপবিত্রতা মনে করিয়া যারপর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া পাঠানগণের উচ্ছেদসাধন জন্য সম্রাটের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন।

আকবরের অনুমতি পাইয়া রাজা মানসিংহ ঝাড়খণ্ডের পার্ব্বত্য পথে বিহারের সৈন্যগণকে মেদিনীপুরে পাঠাইলেন। এবং আপনি জলপথে গঙ্গা নদী দিয়া যাত্রা করিয়া তোগুায় সৈয়দ খাঁকে তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য অনুমতি পত্র পাঠাইয়া দিলেন। মোগলদিগের যুদ্ধের এইরূপ উদ্যোগ অনুষ্ঠান দেখিয়া পাঠানেরা সুবর্ণরেখা নদীর তীরে শিবির সংস্থাপনে তথায় শত্রুর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। মোগলসৈন্য সুবর্ণরেখার অপর পারে শিবির সংস্থাপিত করিলে কয়েকদিন কয়েকটী খণ্ডযুদ্ধ মাত্র হইল। উদ্ধত আফগান জাতি তদবস্থায় বেশী দিন অপেক্ষা

করিতে না পারিয়া নদী পার হইল এবং প্রবল পরাক্রমে শত্রুসৈন্য আক্রমণ করিল। মোগলেরা নদীতীরে কতকগুলি কামান শ্রেণীবদ্ধরূপে সাজাইয়া ধীরভাবে অপেক্ষা করিতে লাগিল। মোগলের আগ্নেয়াস্ত্রের নিক্ষিপ্ত গোলায় পাঠানের হাতী গুলি চঞ্চল হইয়া উঠিল। পাঠানেরা প্রাণের আশা না রাখিয়া মোগল সৈন্যের উপর পড়িল, সমস্ত দিন তুমুল যুদ্ধ চলিতে লাগিল। অবশেষে পাঠানেরা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। রাজা সসৈন্যে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া জলেশ্বর অধিকার করিলেন। সৈয়দ খাঁ রণশ্রমে কাতর এবং রাজার জয়লাভে ঈর্ষান্বিত হইয়া তাঁহার বিনানুমতিতে তোণ্ডায় চলিয়া আসিলেন। রাজা পলায়িত পাঠান সৈন্যের পশ্চাদ্ধাবিত হইতে ক্ষান্ত হইলেন না। অবশেষে পাঠানেরা কটকের সুদৃঢ় দুর্গে আশ্রয় লইল। তৎকালে উহা কটকের জমিদার রামচাঁদের * অধিকারে ছিল। তিনি ইহার নাম রাখিয়াছিলেন শ্রীনগর। রাজা মানসিংহ আপন সৈন্যের দ্বারা সেই দুর্গ পরিবেষ্টিত করিয়া আপনি জগন্নাথদর্শনে যাত্রা করিলেন। এই তীর্থভূমিতে গিয়াও তিনি নিরুপদ্রব হইতে পারেন না, জমিদার রামচাঁদ ও আফগানেরা সেখানেও তাঁহাকে উত্যক্ত করিতে ছাড়িলেন না। কটকে ফিরিয়া আসিয়া তিনি দেখিলেন দুর্গাক্রমণে অধীন সেনাপতিগণ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই অতএব শত্রুপক্ষের সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। এই সর্ত্তে সন্ধি হইল যে

* ইহাকে খানাকুল কৃষ্ণনগরের সর্ব্বাধিকারীবংশের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবার বলবৎ কারণ আছে। সর্ব্বাধিকারী মহাশয়দিগের বংশ পরিচয়ে অবগত হওয়া যায়, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা জমিদারী সূত্রে কটকে বাস করিতেন।

আফগানেরা তাহাদের যাবতীয় রণহস্তী সম্রাটকে দিয়া শান্ত ও বিশ্বস্তভাবে তাঁহার অধীন থাকিবে। জমিদার নিয়মিতরূপে সম্রাটকে রাজস্ব পাঠাইবেন। আফগানসেনাপতিগণ তৎপরিবর্ত্তে খলিফাবাদ পরগণায় আপনাদের জায়গীর ভোগ করিতে থাকিবে। জমিদার রামচাঁদ কটক ও তদন্তর্ব্বর্ত্তী প্রদেশ পাইবেন। এতদ্দ্বারা উড়িষ্যা পুনরায় মোগলসাম্রাজ্যভুক্ত হইল। রাজা মানসিংহও বিলক্ষণ রাজসম্মান লাভ করিলেন, এবং বিহারে প্রত্যাগমন করিয়া আফগানদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত ১২০টী হস্তী সম্রাটকে পাঠাইয়া দিলেন। অতঃপর তিনি বাঙ্গালা ও বিহারের আধিপত্য লাভ করিয়া আগমহলে রাজধানী স্থাপন করিলেন। এই সময় হইতে উহা রাজমহল নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। মানসিংহের রাজত্বকালে রাজমহলের শোভাসমৃদ্ধি যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইয়াছিল মুসলমানেরা সম্রাটের নামানুসারে ইহাকে আকবর নগর বলিতেন।

রাজা মানসিংহ বিহার প্রত্যাগমনসময়ে আপনার পুত্র জগৎসিংহকে বহুসংখ্যক সৈন্য দিয়া উড়িষ্যায় রাখিয়া আসিয়াছিলেন। রাজা রামচাঁদ নিয়মিতরূপে রাজস্বদানে পরাঙ্মুখ হওয়ায় মোগল সৈন্য তাঁহার অধিকারে প্রবেশ করিয়া জোড়ুই, সুভল, খড়েগড় এবং অন্যান্য অনেকগুলি স্থান অধিকার করিল। ইতিমধ্যে আফগানেরা পূর্ব্বের সন্ধি অনুসারে যে জায়গীর পাইয়াছিল তাহার স্বত্বভোগেও বিলক্ষণ বাধা জন্মিল, অগত্যা রণরঙ্গী পাঠান বিদ্রোহ উপস্থিত করিল। আবার মোগল পাঠানে যুদ্ধ। বিদ্রোহী আফগান সৈন্য রাঢ়দেশে প্রবিষ্ট হইয়া অত্যাচার আরম্ভ করিল; শেষে রাজবন্দর সপ্তগ্রাম লুণ্ঠন করিল। ইহা ১৫৯২।৯৩ অব্দের ঘটনা।

এই সমগ্র ঘটনায় রাজা মানসিংহ স্থির হইতে পারিলেন না। তাঁহাকে রণক্ষেত্রে আবার অবতীর্ণ হইতে হইল। তিনি বুঝিলেন যে আফগানদিগকে বিদ্রোহী হইবার সুযোগ দেওয়া অতি অবিবেচনার কাজ হইয়াছে, অতএব তাহাদিগকে স্ব স্ব জায়গীর ফেরত দিলেন। তাঁহারা আপনাপন জায়গীরে চলিয়া গেল। কটকের জমিদার ক্ষমা প্রার্থনা করায় তিনিও তাহাতে বঞ্চিত হইলেন না। পুনরায় উড়িষ্যা শান্তিসুখ লাভ করিল। কয়েক বৎসর ধরিয়া মোগলপাঠানের উপদ্রবে তাহারা সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিল। সুবিস্তীর্ণ রাঢ়দেশই এই বিষম বিদ্রোহের বিহারক্ষেত্র। উত্তরে রাজমহলের পর্ব্বতশ্রেণী পূর্ব্বদিকে গঙ্গা, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে ঝাড়খণ্ডের অরণ্যানি এই বিস্তৃত ভূখণ্ড মধ্যে কাহার কিছু ছিল না। লুণ্ঠক আফগান, রক্ষক মোগল। মোগল পাঠানে সন্ধি হইল, দেশ জুড়াইল। খৃঃ ১৫৯৩।৯৪ অব্দে সম্রাটের পৌত্র খসরু নামে মাত্র উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন, রাজা মানসিংহ তাঁহার হইয়া সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। পাঁচ হাজার সৈন্য পালন এবং কুমারের খরচপত্র যাহা কিছু হইত উড়িষ্যার তহবিল হইতেই তাহা দেওয়া হইত।

সৈয়দ খাঁ বিহারের সেনাপতিত্ব পাইয়া বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিলেন। এই বৎসর রাজা মানসিংহ সম্রাটের সহিত সাক্ষাতে সম্মানসূচক খেলাতের বোঝা লইয়া প্রত্যাগমন করিলেন। খৃঃ ১৫৯৮।৯ অব্দে সম্রাট দাক্ষিণাত্যবিজয়ে কৃতসঙ্কল্প হইয়া বঙ্গদেশের শাসনভার তাঁহার নায়েবের হস্তে দিয়া সসৈন্যে মানসিংহকে তাঁহার সহিত দাক্ষিণাত্যে মিলিত হইবার জন্য লিখিয়া পাঠাইলেন। মানসিংহ দাক্ষিণাত্যে গমন করিলেন—কতলু খাঁর পুত্র

ওসমান খাঁর অধিনায়কত্বে উড়িষ্যার পাঠানেরা পুনর্ব্বার বাঙ্গালা আক্রমণ করিল। বাঙ্গালা ও বিহারের নায়েব শাসনকর্ত্তা মোহন সিংহ ও প্রতাপ সিংহ তাহাদের বিরুদ্ধে যাত্রা করিয়া মেন্দরেক নামক স্থানসন্নিধানে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল, তাহাতে মোগলসেনার সম্পূর্ণ পরাজয় হইল। আবার আফগানেরা বঙ্গদেশের অধিকাংশ আপনাদের হস্তগত করিয়া লইল। সম্রাট এই সংবাদ পাইয়া মানসিংহকে অবিলম্বে বাঙ্গালাদেশে যাইবার অনুমতি দিলেন। তৎকালে রাজা আজমীরে অবস্থিতি করিতেছিলেন।

খৃঃ ১৫৯৯।১৬৩০ অব্দে তিনি যথাসাধ্য সৈন্যসংগ্রহ করিয়া রোটাসে উপস্থিত হইলেন এবং, কয়েকদিন তথায় অবস্থিতি করিয়া আপনার সৈন্যসংখ্যার পুষ্টিসাধন দ্বারা যুদ্ধযাত্রা করিলেন, সেরপুরআতেয়া নামক স্থানে আফগানেরা তাঁহার গতিরোধ জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। উভয়পক্ষে সংগ্রাম উপস্থিত হইল। আফগানেরা গজযুদ্ধে আপনাদিগকে সমধিক দক্ষ মনে করিত, এবারেও তাহারা সৈন্যশ্রেণীর পুরোভাগে আপনাদের হস্তীগুলিকে স্থাপিত করিয়া দাঁড়াইল; কিন্তু মোগলদিগের গতিরোধে সমর্থ না হইয়া পলায়ন করিল। মোগলেরা বহুদূর তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া বিজয়নিশানা উড়াইল।

এই যুদ্ধে এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছিল—তাহাতে রাজা বড়ই আহ্লাদিত হইলেন। পূর্ব্ববারে যখন মোগলসৈন্য পরাভূত হইয়াছিল তখন রাজকীয় সেনার বেতনবণ্টক মীর আবদুল রেজাক শত্রুহস্তে বন্দী হইয়াছিলেন, কিন্তু পাছে তিনি পলাইয়া যান এই ভয়ে পাঠানেরা তাঁহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া এক হস্তীপৃষ্ঠে স্থাপিত করিয়া তাঁহার পার্শ্বে একজন বিকটাকার পাঠানকে রক্ষী

রাখিয়াছিল যদি শত্রুপক্ষ জয়লাভ করে তবে সে তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ মারিয়া ফেলিবে। এই অবস্থায় আবদুল রেজাকের আত্মীয় স্বজনেরা উৎকণ্ঠিত মনে সতৃষ্ণনয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়াছিল, সেইস্থানে মোগলপক্ষের বন্দুকের গুলিতে সেই আফগান নিহত হইলেন। মোগলসৈন্য ক্ষিপ্রহস্তে তাঁহার উদ্ধারসাধন করিল। সঙ্গে সঙ্গে রাজা মানসিংহ আসিয়া উপস্থিত হইলে আফগানগণের আশাভরসা সমস্তই নষ্ট হইল তাহারা যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া উড়িষ্যায় ফিরিয়া গেল, এবং আপনাদের হৃতাধিপত্য পুনঃপ্রাপ্তির জন্য দৈবের উপর নির্ভর করিয়া রহিল।

এই যুদ্ধে জয়ী হইয়া রাজা মানসিংহ সম্রাটের সহিত সাক্ষাতে প্রভূত সম্মানের সহিত সাতহাজার অশ্বারোহী সৈন্যের আধিপত্য লাভ করিলেন। এরূপ সম্মান পূর্ব্বে আর কখন কেহ লাভ করে নাই। খৃঃ ১৬০৪ অব্দ পর্য্যন্ত রাজা মানসিংহ সুবিবেচনার সহিত বঙ্গদেশের শাসনকার্য্য সম্পন্ন করিয়া প্রকৃতিপুঞ্জের সুখসচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল শাসন-কার্য্যে নিবিষ্ট থাকিয়া বার্দ্ধক্যে অবসরসুখভোগ জন্য বঙ্গদেশের শাসন কর্তৃত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক সম্রাটের অনুমতি লইয়া তিনি আগ্রা যাত্রা করিলেন এবং দরবারে উপস্থিত হইয়া সম্রাটকে নয়শত হস্তী এবং বঙ্গদেশের কৃষিশিল্প জাত বহুসংখ্যক উপঢৌকন দিলেন।

আবুলমজিদ আসফ খাঁ মানসিংহের স্থলে বঙ্গদেশের শাসন-কর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন। ইহার অল্পদিন পরেই সম্রাট আকবর সাহের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল। উজির খাঁ।—আজিমের উপর সমস্ত

রাজকার্য্যনির্ব্বাহের ভার পড়িল। যদিও পিতাপুত্রে মধ্যে মধ্যে মনোমালিন্য জন্মিত, তথাপি সম্রাটের একমাত্র পুত্র সেলিমই তাঁহার উত্তরাধিকারী কিন্তু সেলিমের পুত্র খসরু উজির খাঁ আজিমের জামাতা এবং রাজা মানসিংহের ভাগিনেয়। তাঁহারা উভয়েই খসরুর পক্ষাবলম্বনে তাঁহাকে সিংহাসনে সংস্থাপিত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন, অধিকাংশ আমিরও তাঁহাদের পোষকতা করিলেন, মৃত্যুর দুইদিন পূর্ব্বে সেলিম মুমূর্ষ পিতার শয্যার পাশে উপস্থিত হইয়া বৈবাহিক ও শ্যালকের ষড়যন্ত্রের বার্ত্তা তাঁহার সুগোচর করিলে ন্যায়নিষ্ঠ সম্রাট মানসিংহ ও খাঁ আজিম এবং অন্যান্য আমিরগণকে নিকটে ডাকিয়া যথোচিত তিরস্কার করিলেন এবং সর্ব্বসমক্ষে সেলিমকে ভারতের ভাবী সম্রাট ও তাঁহার একমাত্র উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণার আজ্ঞা দিলেন, সকলেই তাহা শিরোধার্য্য করিলেন, খৃঃ ১৬০৫ অব্দের　　　মাসের　　তারিখে সম্রাট আকবর সাহের মহামূল্য জীবনের অবসান হইলে তৎপুত্র সেলিম জাহাঙ্গীর নাম গ্রহণে পিতৃসিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া রাজা মানসিংহকে বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠাইলেন। আটমাস মাত্র বঙ্গদেশে আসিয়া মানসিংহ আপনার পিতৃভূমিতে ফিরিয়া আসিলেন, কুতুবউদ্দিন খাঁ বঙ্গদেশের শাসনভার পাইলেন।

আকবর সাহের রাজত্ব ভারতেতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ। এই সময়ে মোগল রাজত্ব শ্রীসৌভাগ্যের সমুন্নত চূড়ায় অবস্থিত হইয়াছিল। পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে আকবর সাহকেই "দি গ্রেট মোগল" বলা হইত। ইংরাজেরা তাঁহারই অধিকারকালে ভারতে বাণিজ্য বিস্তারের সূত্রপাত করেন। আকবর বড়ই ধার্ম্মিক ছিলেন,

তিনি লেখাপড়া না জানিলেও তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি ও বিবেচনাশক্তির তুলনা ছিল না, তিনি বাহুবলে ভারতে আপনার একাধিপত্য সংস্থাপিত করিয়া নানাশ্রেণীর লোকের সুখদুঃখের বিধানকর্ত্তা হইয়াছিলেন। তিনি হিন্দুদিগকে ভাল বাসিতেন, হিন্দুধর্ম্মে শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন, সকল ধর্ম্মের তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ছিলেন। খৃঃ ১৫৬৮ অব্দের ২০শে ডিসেম্বর তিনজন পর্ত্তুগিজ ও বিসপ রেডিক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আগ্রায় উপস্থিত হয়েন। তৎকালে তাঁহার মন্ত্রী আবুল ফাজেল নিকটে ছিলেন। তাঁহাদের সহিত সম্রাটের যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহাতে তাঁহার ধর্ম্মসম্বন্ধে উদারতা এবং রাজনৈতিকতার প্রভূত পরিচয় পাওয়া যায়। বিসপ সাহেবের অন্য উদ্দেশ্য থাকিলেও ধর্ম্মপ্রচারের উদ্দেশ্যই বলবৎ ছিল।

আক। ধর্ম্মপ্রচারার্থই কি আপনাদের আগমন?

রেডি। উহা প্রভুর আদেশ সত্য—কিন্তু এখনকার প্রধান উদ্দেশ্য বাণিজ্য।

আক। আপনার মুখে ভারতপথের আবিষ্কারকাহিনী শুনিয়া বুঝিয়াছি আপনারা সত্যসত্যই পরিশ্রমী ও সাহসী জাতি। দুঃসাধ্যসাধনই আপনাদের আনন্দ এবং অধ্যবসায়ই আপনাদের উন্নতির ভিত্তি।

রেডি। জাঁহাপনা—আপনি চিরদিনই নিরপেক্ষ।

আক। এখন বলুন—ভারত সম্বন্ধে আপনাদের কি ধারণা?

রেডি। ইউরোপে ভারতের অনন্ত ঐশ্বর্য্যের খ্যাতি প্রবাদবাক্যের ন্যায় পরিগণিত। বহুকাল হইতে ভারতের কৃষিশিল্পজাত দ্রব্য ইউরোপের বিস্ময় জন্মাইয়া আসিতেছে। গ্রীক ও

লাটিন সাহিত্যে ভারতসম্বন্ধে অতি আশ্চর্য্য বিবরণ পাঠ করা যায়। সেখানকার লোকের ধারণা ভারত স্বর্ণভূমি, এখানকার দীনদরিদ্রের ঘরেও মণিমুক্তার ছড়াছড়ি।

আক। সত্যসত্যই ভারতের বক্ষে কল্পবৃক্ষ আছে। জানি না আপনাদের পিপাসা কোথায় কিরূপে মিটিবে।

রেডি। আপনি বিজেতা।

আক। আমি বিজেতা হইলেও ভারত আমার জন্মভূমি। মুসলমান বিধর্ম্মী হইলেও বিদেশী নহে, তাহারা আপন জন্মভূমি লুণ্ঠন করিবে না। হিন্দুর সুখদুঃখের সহিত তাঁহাদের সুখদুঃখ একসূত্রে আবদ্ধ। হিন্দুস্থানের সুখদুঃখ মুসলমানেরও ভোগ্য।

রেডি। আপনি প্রকৃত রাজনীতিজ্ঞ কিন্তু আপনার আশঙ্কা অমূলক—আমরা বণিক মাত্র।

আক। দুর্ব্বল পথিকের ধনরত্ন যেমন তাহার মৃত্যুর কারণ হয়, ভারতের ভাগ্যেও বুঝি বা তাই ঘটে, জানিনা আমাদের এই রাজত্বের পরিণতি কোথায়? ভারতের রত্নাগারে জগতের লুব্ধ দৃষ্টি পড়িয়াছে।

আবুলফাজেল। উদয় অস্ত প্রকৃতির নিয়ম।

আকবর সাহের পূর্ব্বে তাঁহার পিতা-পিতামহ এবং পাঠানেরা প্রায় সার্দ্ধ দ্বিশতবৎসর ভারত ভূমিতে আধিপত্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকার কালের বিস্তৃত বিবরণ লিখিত থাকিলেও তাঁহার রাজত্বকালে রাজনিয়মের যেরূপ সুশৃঙ্খলা সংস্থাপিত হয় সেরূপ আর কাহার রাজত্বে ছিল বলিয়া তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। আকবরের রাজশাসনপ্রণালী তাঁহার মন্ত্রী আবুলফাজেল সুবিস্তৃতরূপে খৃঃ ১৫৯০ অব্দে যে গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন

তাহার নাম "আইন-ই-আকবরী" অদ্যাপি এই মহামূল্য গ্রন্থের বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ না থাকায় অমরা তাহার স্থূল স্থূল বিবরণ নিম্নে লিখিত করিতেছি। দশবৎসরের হিসাব অবলম্বনে তোডরমল যে রাজস্ব নির্দ্দিষ্ট করেন, তদনুসারে উৎপন্ন ফসলের চতুর্থাংশ ভূমির রাজস্ব নির্দ্দিষ্ট হয়। উর্ব্বরাশক্তির তারতম্যানুসারে চাসের জমি চারিশ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিল।

আকবর সাহের অধিকারকালে রাঢ়দেশের আকার-প্রকার কিরূপ ছিল তাহার আলোচনার প্রয়োজন। হিন্দুরাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে এই দেশের রাঢ় ও সূহ্ম নাম লুপ্ত হইয়াছে। বাং+আল শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে আ প্রত্যয় করিয়া বাঙ্গালা নামের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহাই আইন আকবরীর ব্যাখ্যা। বাং+আল অর্থে জল আটকাইবার আইল (অর্থাৎ নিম্নভূমিতে বর্ষার জল সঞ্চিত হইয়া তাহাকে ডুবাইয়া রাখিতে না পারে) তজ্জন্য দেশীয় রাজগণ বিশহাত লম্বা, এবং দশহাত প্রস্থ, এবং দশহাত উচ্চ আইল প্রস্তুত করাইয়া দিতেন। এই সুবা ২৪টী সরকারে ৭৮৭টী মাল বা পরগণায় বিভক্ত ছিল, রাজস্বে নির্দ্দিষ্ট ছিল সিকা ৫৯,৪৯, ৬১,৪৮২৸৴০২। এখানকার জমিদারদের অনেকেই কায়স্থ— তাঁহারা আপনাদের দেয় রাজস্বের অতিরিক্ত ২৩,৩৩০ অশ্বারোহী ৮০১১৫৮ পদাতিক, ১৭০টী হস্তী ৪২৬০টী কামান এবং ৪,৪০০ রণতরী রাখিতেন। দেশের প্রধান রাজশক্তির আপৎকালে তদ্দ্বারা সাহায্য করিতেন।

দেশবিভাগ।—এই সময়ে সরকার পরগণাদি বিভাগানুসারে প্রাচীন রাঢ়ভূমি সরকার সরিফবাদ সরকার সোলেমনাবাদ সরকার

মান্দারণ, সরকার সপ্তসংগ্রাম এবং সরকার জলেশ্বরে বিভক্ত হয়। শেষোক্ত দুইটী সরকারের অংশতঃ রাঢ়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী।

জলবায়ু—এখানকার জলবায়ু নাতিশীত নাতিউষ্ণ। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠমাস হইতে প্রায় ছয়মাস বর্ষা। এই সময় প্রায় সমস্ত নিম্নভূমি জলমগ্ন হয়। কখন কখন জলপ্লাবিতও হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত আইলগুলি দ্বারা অনেকস্থান রক্ষা পাইত? বর্ষা থামিলে জলবায়ু বিকৃত হইয়া জ্বরজালা উপস্থিত হইত কিন্তু আকবর সাহের সময় হইতে তাহার নিবৃত্তি হইয়া যায়।

নদনদী।—বঙ্গদেশে নদনদী অনেক—তন্মধ্যে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র খুব বড়। হিন্দুরা বলেন—গঙ্গার উৎপত্তি মহাদেবের জটায়। উত্তর দিকবর্ত্তী অচলমালা হইতে দিল্লী আগরা প্রয়াগ বিহার দেশদিয়া এইনদী প্রবাহিতা। সরকার বরবকাবাদের কাজিহাটা নামক নগরের নিকট ইহা পদ্মানামে খ্যাত। সেখান হইতে একটী শাখা পূর্ব্বাভিমুখে চট্টগ্রামের নিকট সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছে, আর প্রধান নদীটা দক্ষিণমুখে প্রবাহিত হইয়া ত্রিবেণীতে ত্রিধারারূপিণী। সেখান হইতে সহস্রমুখী হইয়া সাঁতগায়ের নীচে সমুদ্রে মিলিয়াছে। *

হিন্দুরা শতশত স্তোত্র দ্বারা গঙ্গার স্তব করিয়া থাকেন, এবং গঙ্গার জলকে অতি পবিত্র বোধ করেন। স্থানবিশেষে ইহার মাহাত্ম্যাধিক্যের কথাও শুনা যায়। দৈবকার্য্যের জন্য বহু-

* এই সময়ের লিখিত কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে ত্রিবেণীর দক্ষিণ নিমাই তীর্থের ঘাট ভিন্ন গঙ্গাতীরবর্ত্তী কলিকাতা পর্য্যন্ত অন্য কোন জনস্থানের উল্লেখ না থাকায় মনে হয় ধনপতি ও শ্রীমন্ত সদাগর সরস্বতী নদী দিয়াই সিংহল গিয়াছিলেন।

দূরবর্ত্তী স্থানের লোক গঙ্গাজল লইয়া গিয়া থাকে। কেবলমাত্র পবিত্রতার জন্য নহে—স্বাদুতা লঘুতা এবং স্বাস্থ্যকারিতার জন্য বহুকাল হইতে গঙ্গাজলের খ্যাতি আছে, অনেকদিন রাখিয়া দিলেও গঙ্গাজল পচে না, আমরা বলি অতি প্রাচীনকাল হইতে হিন্দুমুসলমান সকলেই গঙ্গাজলের পবিত্রতা ও স্বাস্থ্যকারিতা স্বীকার করিয়া আসিতেছে। অধুনা পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন গঙ্গাজলে বিসূচীকাদি রোগের জীবাণু স্থান পায়না।

উর্ব্বরতা।—বঙ্গদেশের সকল নদনদীর তীরে ধান, যব, কলাই প্রভৃতি নানা শস্য জন্মে। এখানকার মৃত্তিকা এত উর্ব্বরা যে একটী ধানে দুই তিন সের ধান্য উৎপন্ন হয়। কোন কোন জমিতে বৎসরে তিন চারিটা ফসল জন্মে।

বাসগৃহ।—বঙ্গদেশের বাসগৃহ প্রধানতঃ বাঁশ দ্বারা নির্ম্মিত হইয়া থাকে। এক একখানি ঘরে পাঁচ ছয় হাজার টাকা লাগে, স্থানবিশেসে বেশীরও প্রয়োজন হয়। এই সকল ঘর অতি মজবুত দীর্ঘকাল ব্যবহারেও নষ্ট হয় না। দেওয়াল বেড়ার, চাল খড়ের, গরিবেরা কুটীরবাসী।

যান বাহন।—পূর্ব্বে এ দেশের লোক নৌকাযোগে জলপথে একস্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিত। বিশেষতঃ বর্ষাকালে নৌকা বই অন্য যান ছিল না। দেশভ্রমণ যুদ্ধবিগ্রহ এবং পণ্যদ্রব্য-বহন জন্য দেশবাসীগণকে নানা রকমের নৌকা প্রস্তুত করিতে হইত। রণতরীগুলি এরূপভাবে প্রস্তুত যে তীরে লাগিলে অনায়াসে উচ্চস্থানে পৌছান যাইত। ইহা দ্বারা দুর্গাদির ন্যায় উচ্চস্থানে উঠিতে কষ্ট হইত না।

স্থলপথে বেড়াইবার জন্য সুখাসন নামক যান ছিল দেখিতে পান্কীর মত তাহাকে তঞ্জামও বলে। তাহারই বেশী ব্যবহার দেখা যাইত। কেহ কেহ হস্তী পৃষ্ঠেও যাতায়াত করিত। ঘোড়ার ব্যবহার ছিল না বলিলেই হয়।

উপরে যে ঘর বাড়ী ও যানাদির বিবরণ লিখিত হইয়াছে তাহা পূর্ব্ব-বঙ্গেরই ব্যবহার্য্য বলিয়া মনে হয়। রাঢ়দেশের ঘর বাড়ী মৃন্ময়—মাটীর দেওয়াল খড়ের চাল, কিন্তু এই চাল নির্ম্মাণে একমাত্র বাঁশই প্রধান উপকরণ। চালগুলিতে বাঁশের শলা বাখারী ও শণের দড়িই প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। নানাবর্ণে রঞ্জিত তেড়েল পাতায় অতি সূক্ষ্ম ও সুন্দর কারুকার্য্য দেখা যায়। তাহাতে নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি, হাতী ঘোড়ার ছবি, সৈন্যে সৈন্যে লড়াই এরূপ নানাবিধ চিত্র অঙ্কিত হয়, দেখিতে অতি সুন্দর, এরূপ বাড়ীতে বাস করা বিশেষ ধনবান ব্যক্তি না হইলে অন্যের সাধ্য নহে।

আইন-ই-আকবরীতে শণসূত্রের নির্ম্মিত অতি সুন্দর বিছানার কথা লিখিত আছে, তাহা দেখিতে অতি সুন্দর—রেশমের মত। এখন আর কই দেখিতে পাওয়া যায় না। তৎপরিবর্ত্তে মেদিনীপুরের সাবং থানায় অতি সুন্দর ও বহুমূল্য মতরঞ্জ মাদুর বড় সুখের শয্যা। বঙ্গদেশের লোক বড় লবণপ্রিয়, স্থানবিশেষে লবণ দুষ্প্রাপ্য।

এদেশে (রাঢ়ে) কাছাকাছি দুইটী বাণিজ্য বন্দর আছে—একটী সাত গাঁ অপরটী হুগলী, দুইটীই ইউরোপীয়গণের হস্তগত। সাতগাঁয়ের দাড়িম্ব সুপ্রসিদ্ধ। এখন এদেশের কেহ অসুস্থ

হইলে অতি আদরে এবং বহুমূল্যে ক্রয় করিয়া থায়, তাহা বিহারের পাটনা প্রভৃতি স্থান হইতে আমদানি।

জন্তু।—সরকার ফরিফাবাদে (বর্দ্ধমানে) প্রকাণ্ড, সাদা, গোরু পাওয়া যাইত। এক একটী এত বলবান ছিল যে হাঁটু পাতিয়া পনর মণ পর্য্যন্ত বোঝা লইত। এখানকার ছাগল ও লড়াইয়ে মোরগ খুব প্রসিদ্ধ। সপ্তগ্রামে অনেক হাতী বিকাইত। *

খনিজ।—সরকার মান্দারণের হানিয়া নামক স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হীরা পাওয়া যাইত। ৪০ দামে (ডামে) ১৲ টাকা।

মুদ্রা।—এখানকার চলিত তাম্র মুদ্রার নাম "দাম" বিহার অঞ্চলে এখনও ঐ নাম শুনা যায়। এক দাম এখনকার ৴৮ আট গণ্ডা দেড়—পয়সার কিছু বেশী।

আইন আকবরীর লিখিত দ্রব্যমূল্যের একটী তালিকা দেওয়া হইল,—

দ্রব্য	হার	মূল্য
গম	প্রতিমণ	।১৬
খুব সরেশ চাউল	"	২৸০
মাঝারি চাউল	"	২৲
নিরেশ চাউল	"	১৲
অতি নিকৃষ্ট	"	৶৮
ডাউল নানা রকম	"	।১৬ হইতে ।৶৪

* তখনকার জমিদারদের সকলকেই হাতী রাখিতে হইত। এখন তারকেশ্বর দুএকটী, মাখালপুরে একটী, আর বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের কতকগুলি হাতী আছে।

দ্রব্য	হার	মূল্য
যবের ছাতু	”	॥৮
কপি শাক	”	॥৪
ঘৃত	”	১॥৵
দুগ্ধ	”	॥৵
লবণ	”	।৵৮
বিশুদ্ধ চিনি	”	৵৮
পিয়াজ	”	॥৶
রসুন	”	।৪
ছাগমাংস	”	১।/১২
হরিদ্রা	প্রতি সের	৻১৬
লবঙ্গ	”	১॥
এলাইচ	”	১॥১৬
খেজুর	”	/১২
গোলমরিচ	”	।৵১৬
যমানি (যোয়ান)	”	৻১৬
দারুচিনি	”	।০
সুপারি	”	৶৪
লঙ্কা	”	৵৮
ধন্যা	”	/৮
মৌরী	”	৻৮
তেঁতুল	”	৻১৬
আম	শতকরা	॥৶

দ্রব্য.	হার	মূল্য
কমলা লেবু	"	⁄১২
লেবু	৪টা	⁄১২
কাঁঠাল	১টা	৻২
কলা	"	৻২
নারিকেল	"	⁄১২

পরিধেয় বস্ত্র নানা রকমের ছিল, মূল্য বড় বেশী—যে সকল কাপড়ের দর আইন-ই-আকবরীতে লিখিত আছে, তাহা গৃহস্থ লোকের ব্যবহার্য্য নহে, বড় বড় জমিদার আমির ওমরাহগণের অঙ্গেই শোভা পাইত এখন যেসকল কাপড়ের নাম পর্য্যন্ত শুনিতে পাওয়া যায় না, বাজারে দেখিতে পাওয়া দূরের কথা। কেবল পরিচিতগুলির বিষয়ই লিখিত হইল,—

সূতার মলমল	প্রতিথান	৪৲ হইতে ৫ মোহর
বনাত	ঐ	১৷৹ হইতে ৫ মোহর
সালু	ঐ	৩ হইতে ২ মোহর
ছিট	১ হাত	৻১৬ হইতে ৸৲
পশমী বনাত বিলাতী	ঐ	২৷৹ হইতে ৪ মোহর
লাহোরী বনাত	১ থান	২৲ হইতে ১ মোহর
শাল	ঐ	২৲ হইতে ৮ মোহর
শালের ফতুয়া	১টা	৷ হইতে ৩ মোহর
শালের টুকরা জামার জন্য	১টা	৷৹ হইতে ৪ মোহর
পট্টু	১ থান	১৲ হইতে ১০৲
লুই	ঐ	৷⁄১২ হইতে ৪৲

বিলাতী মখমল	১ হাত	১	হইতে ৪ মোহর
কাশ্মীর রেশমী ঐ	ঐ ১ থান	২	হইতে ৭ মোহর
কম্বল	১ থান	।০	হইতে ২৲
লাহোরী মখমল	১ থান	২	হইতে ৫ মোহর
হিরাটী ঐ	ঐ	ঐ ঐ	
বিলাতী ছালটী	হাত		৷৷০ হইতে ১৲
রেশমী তাফতা	ঐ		।০ হইতে ২৲
সাদা সাটিন	হাত		৷৷০ হইতে ১৲
বিলাতী ঐ	ঐ		১ হইতে ২ মোহর
হিরাটী ঐ	থান		২ ,, ৫ মোহর

আকবর সাহের পূর্ব্বে কেবল কাশ্মীরেই শাল প্রস্তুত হইত। তাঁহার উৎসাহ পাইয়া অমৃত সহরে লাহোরে হাজার হাজার শালের কারখানা খুলিয়াছিল। এই দুই স্থানে যে শাল প্রস্তুত হইত সমস্তই কাশ্মীরি শালের নকল। সেকালের লোক ময়লা ধরিবার ভয়ে শালকে চারি ভাঁজ করিয়া কাঁধে ফেলিত। তাহার পর কিছুদিন একফর্দ্দ ব্যবহৃত হইত। আকবর সাহ শালের জোড়ার ব্যবহার প্রচলিত করেন।

অন্যান্য দ্রব্যের মূল্য তালিকা—

বাঁশ		২০খানি	।৶ হইতে ৷৷৵০
পাল্কীর বাঁটের বাঁশ		১টা	১৲
মাদুর	চারিদিক	১ গজ	৶১২
ঘর ছাইবার উলু খড়		১০ সেরে তাড়া	৶৮
মুঞ্জদড়ি		মণ	৷৷০

শ্রমিকের মজুরি—

ইটকর ১ম শ্রেণী	রোজ	৵১৬
ঐ ২য়	”	৵৮
ঐ ৩য়	”	৵০
ঐ ৪র্থ	”	⁄১২
সূত্রধর (মিস্ত্রী) ১ম শ্রেণী	”	৵১৬
ঐ ২য়	”	৵৮
ঐ ৩য়	”	⁄১২
ঐ ৪র্থ	”	⁄৮
ঐ ৫ম	”	‹১৬

আকবর সাহের সময়ে নিম্নোক্ত কর্ম্মচারীগণ নিম্নোক্ত স্থানে অবস্থিতি করিয়া নিম্নোক্ত প্রকারে রাজকর আদায় এবং প্রজা-পালন করিতেন।

রাজ-প্রতিনিধি।—ইনি সৈন্যগণকে শাসনে রাখিতেন, ভগবানে ভক্তিশ্রদ্ধা পূর্ব্বক প্রাতর্মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে প্রতিদিন নিয়মিতরূপে নমাজ করিতেন, প্রকৃতিপুঞ্জের সুখস্বচ্ছন্দতার প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন, কোন রকমে কর্ত্তব্য কার্য্যের ক্রটী না করিয়া প্রজাপালনে অভিনিবিষ্ট থাকিতেন; কোন কাজ করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে বিচক্ষণ বুদ্ধিমান ব্যক্তির পরামর্শ লইতে হইত, তদ্রূপ ব্যক্তি না মিলিলে অনেকগুলি লোকের মধ্যে বাছা-বাছা লোক লইয়া তাঁহাদের অধিকাংশের মতানুসারে কাজ করিবার ব্যবস্থা ছিল।

উপদেশ—অবাধ্য ও অবশীভূত ব্যক্তিদিগকে সুযুক্তি সুপরামর্শ দ্বারা শুধরাইবার চেষ্টা করিবেন। তাহাতে না শুধরাইলে ভর্ৎসনা ও তাড়না করিবেন, অপরাধীকে কারাবদ্ধ করিবেন, বেত মারিবেন, অঙ্গচ্ছেদ করিবেন কিন্তু বিশেষ বিবেচনা না করিয়া কাহারও প্রাণ-

দণ্ড করিবেন না, কাহাকেও কুবাক্য বলিবেন না, শপথ গ্রহণে কোন কথা বলিবেন না, মামলা মোকর্দ্দমার বিচারকালে কেবলমাত্র সাক্ষ্য ও প্রতিজ্ঞা বাক্যের উপর নির্ভর না করিয়া নানাপ্রকারে পুনঃ পুনঃ সত্যপ্রকাশের জন্য বিশেষরূপ অনুসন্ধান করিবেন। অন্যের উপর ভার দিয়া আপনি দায়ে খালাস লইবেন না, বিচার কার্য্যে অকারণ বিলম্ব করিবেন না। পথিকদিগকে নিরাপদ করিবার জন্য পথে ঘাটে উপযুক্ত প্রহরী রাখিবেন এবং তাহারা কোথাকার লোক কি জন্য কোথায় যাইতেছে তাহার তথ্যানুসন্ধান করিবেন। জ্ঞানবান ও দূরদর্শী নির্লোভ ব্যক্তি দেখিয়া রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। আপনার আয়মত ব্যয় করিবেন—কোনমতে অমিতব্যয়ী হইবেন না, গরিবদুঃখীদিগকে কিছু কিছু দান করিবেন। তাঁহাকে অবশ্য সংযত হইতে হইবে, কৃষি ও প্রজাবৃদ্ধির চেষ্টা করিবেন, প্রজারঞ্জনে কোনমতে ক্রটি করিবেন না। পক্ষপাতশূন্য রাজস্বসংগ্রাহক নিযুক্ত করিয়া তাহাদের প্রতি সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিবেন। পুষ্করিণী কূপ ও খাল খনন, উদ্যান প্রস্তুত পান্থাবাস স্থাপনাদি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন। অতিথি ফকির ও দরবেশগণকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিবেন, কোনমতে প্রতিহিংসাপরায়ণ হইবেন না, সকলের প্রতি সদাচারশীল হইবেন। প্রাচীন ও বড় ঘরের ছেলেরা অবস্থাহীন হইলেও তাহাদিগকে তুচ্ছ জ্ঞান করিবেন না। দ্বাদশ মাস বয়স না হইলে কেহ যেন ছাগ মেষাদি পশুশাবককে হত্যা করিতে না পারে—আরও অনেক হিতকর উপদেশ আছে। এই সকল রাজনিয়ম যে দেশে যে রাজত্বে প্রচলিত ছিল সে দেশ সে রাজ্য অবশ্যই সুখের ছিল সন্দেহ নাই। আকবরের রাজত্বের পরেও বহুকাল এই সকল নিয়ম প্রচলিত

ছিল, তদনুসারে পূর্ব্বাপরকাজ হইলে মুসলমান রাজত্বের স্বেচ্ছা-চারিতার কলঙ্ক থাকিত না।

ফৌজদার।—আকবরের আমলে সুবেদারের অধীনে বড় বড় সরকারগুলিতে এক একজন ফৌজদার থাকিতেন। ফৌজ অর্থে সৈন্য, তাহা হইতেই ফৌজদার শব্দের উৎপত্তি। ফৌজদার এক একটী সরকারে অবস্থিতি করিয়া তথাকার শান্তি রক্ষা করি-তেন। তাঁহার অধীনে সৈন্য থাকিত—কোন জমিদার অবাধ্য হইলে বা রাজস্ব আদায় দিতে ক্রটী করিলে তাহার প্রতী-কার করিতেন। দেশের অবস্থা এবং নিম্নস্থ কর্ম্মচারিগণের চরিত্র সম্বন্ধীয় তথ্য সংগ্রহ জন্য "চার" রাখিতেন। বিদেশীয় পরিব্রাজক কোন স্থানে উপস্থিত হইলে সে ব্যক্তি কে, কোথা হইতে কিজন্য আসিয়াছে, কোথায় যাইবে তাহার তথ্য সংগ্রহ করিয়া তাহার গতি-বিধির উপর দৃষ্টি রাখিতেন।

কোতোয়াল।—ফৌজদারের অধীনে প্রধানতঃ শান্তি রক্ষার কাজ করিতেন। প্রত্যেক গৃহস্থের আয়ব্যয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন, পথ ঘাট পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবার এবং সাধারণের গতিবিধির পথ কেহ না বন্ধ করে, তাঁহাকে তজ্জন্য সর্ব্বদা তাহা দেখিতে শুনিতে হইত। কেহ বেশী রাত্রিতে নগর হইতে বাহিরে বা বাহির হইতে নগরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইতে না পারে তাহার জন্য তাঁহাকে চৌকি পাহারার ব্যবস্থা করিতে হইত। কাহার কোন জিনিষ চুরি যাইলে তাহা পুনরুদ্ধারের জন্য তাঁহাকে দায়ী থাকিতে হইত, না পারিলে তাহার ক্ষতিপূরণ করিতে হইত।

কোতোয়ালেরা বহুজনপূর্ণ সহর ও নগরে অবস্থিতি করিয়া উক্ত প্রকারে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। পল্লীগ্রামে জমিদার, থানা-

দার, ফাঁড়িদার ও চৌকিদারের সাহায্য শান্তিরক্ষার কাজ করিতেন।

আমিলগুজর—রাজস্ব সংগ্রহ করাই ইহার প্রধান কাজ, সে সম্বন্ধে উপদেশ অনেক, স্থূল স্থূল কয়েকটী মাত্র লিখিত হইল। তিনি প্রকাশ্য স্থানে বসিবেন, সেখানে সকলে যেন সহজে যাতায়াত করিতে পারে। পতিত জমির যাহাতে আবাদ হয় তাহার চেষ্টা করিবেন। অপরাধের জন্য তিনি জরিমানা লইয়া ক্ষান্ত হইবেন না। জমিতে প্রচুর ফসল জন্মিলে তিনি পুরস্কার পাইবেন। সকল জমির এবং প্রজার অবস্থা তাঁহাকে জানিতে হইবে। উর্ব্বরা ভূমি পড়িয়া থাকিতে না পায়। অভাব হইলে বৎসর বৎসর তিনি কৃষককে তাগাবি দিবেন। কৃষকেরা নির্দ্দিষ্ট সময়ে খাজনা আপনারাই আনিবে। তাহাদের নিকট হইতে কাহাকেও তাহা আদায় করিবার ভার দেওয়া হইবে না। যে বৎসর পূরা ফসল জন্মিবে সে বৎসর কাহারও খাজনা বাকী থাকিবে না। খেরাজী জমি কেহ আবাদ না করিয়া যদি গোচরের জন্য ফেলিয়া রাখে তাহা হইলে প্রত্যেক মহিষের জন্য বৎসর ৬ দাম ৵৮, প্রত্যেক গরুর জন্য পাঁচ পয়সা লওয়া হইবে; বাছুরের জন্য কিছুই লওয়া হইবে না। প্রত্যেক লাঙ্গলের জন্য চারিটা বলদ, দুটা গরু এবং একটা মহিষ মঞ্জুর করা যাইবে। সেই হিসাবে গোচরের জমা লওয়া হইবে, অর্থাৎ যে চাসীর একখান লাঙ্গলের চাস সে ঐ হিসাবে গোচরের খাজনা দিবে। ২০,৫০০ আড়াই হাজার টাকা খাজনা জমিলেই বিশ্বস্ত প্রহরী দ্বারা প্রধান খাজনাখানায় পাঠাইতে হইবে। যে প্রজা নিরুদ্দেশ হইবে বা মরিয়া যাইবে, তাঁহাকে তাহার ধন সম্পত্তি হেপাজতে লইয়া খাজনাখানায় পাঠাইতে হইবে। তিনি সেলামী বা অতিরিক্ত বাব কিছু গ্রহণ করিবেন না। প্রতি মাসে

তাঁহাকে নবাব সরকারে প্রজা এবংজায়গীরদারের শত্রু মিত্র সম্বন্ধে, সকল জিনিষের বাজার দর, ঘরভাড়ার, দোকান ঘরের খাজনা, সন্ন্যাসী ফকির প্রবঞ্চক, প্রতারকগণের গতিবিধির সংবাদ লিখিয়া পাঠাইতে হইবে।

কাজি—আজিকালি আমরা বিচারব্যভিচার উপলক্ষে "কাজির বিচার" বলিয়া বিদ্রূপ করিয়া থাকি; আকবর সাহের অধিকারকালে সেই কাজির দায়িত্ব কতটা ছিল তাহা একবার দেখা কর্ত্তব্য। রাজার পক্ষে স্বয়ং সকল কাজ করিয়া উঠা বড় কঠিন—কাজেই তাঁহার বিচারকার্য্যের ভার অন্যকে না দিলে চলিতে পারে না। যাহাকে রাজার প্রতিনিধিরূপে বিচারকাজ করিতে হইত, তাঁহার উপাধি ছিল কাজি, আর দণ্ডের ব্যবস্থা দিতেন যিনি তাঁহার উপাধি মাবুল। কাজিকে বাদীর এজেহার, হলফান সাক্ষীর জবানবন্দী লিখিয়া লইতে হইত। তাহার পরে তাঁহাকে অভিযোগের সত্যতা সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করিতে হইত। হলপ ও এজেহারের উপর কোনমতে নির্ভর করা হইত না। বিশেষ অনুসন্ধানে সত্যাবধারণ করিয়া তবে বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইত। প্রত্যেক বিষয়ে সাক্ষীদিগকে পৃথক্‌ভাবে পরীক্ষা করিয়া বিশেষ মনোযোগের সহিত দোষী নির্দ্দোষ স্থির করিতে হইত। দোষী সাব্যস্ত হইলে দণ্ড ব্যবস্থা করিতেন।

আকবর সাহের সময় হইতে ইউরোপীয় বণিক্ ও ভ্রমণকারীরা এদেশে আসিতে আরম্ভ করেন। তাঁহাদের অন্যতম রাওলফ ফিচ। তিনি খৃঃ ১৫৮৩ অব্দে লণ্ডন পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্যাবিলন প্রভৃতি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থানগুলি ভ্রমণ করিয়া ভারতে উপস্থিত হয়েন, পশ্চিম ভারতের নানা স্থান সন্দর্শন করিয়া আগ্রায়

উপস্থিত হয়েন, সেখান হইতে পাটনা পরিভ্রমণ করিয়া বঙ্গের প্রাচীন রাজধানী তোণ্ডা এবং সেখান হইতে কোচবিহার গমন করিয়া জলপথে নৌকাযোগে সপ্তগ্রামে আসিয়াছিলেন। সোজা পথে দস্যুতস্করাদির ভয় পরিহারার্থ যে পথে আসিয়াছিলেন তাহাতে বনভূমি বই জনস্থান প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল না, ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি শ্বাপদ এবং মহিষ হরিণাদি বনচর জন্তুগণই সেস্থানের অধিবাসী ছিল। ফিচ সপ্তগ্রামের তিন মাইল দূরে পর্ত্তুগিজদিগের হুগলী নগর দেখিয়াছিলেন। তাহারা ইহাকে পর্ত্তু পিকেনো বলিত। তখন এদেশে ধান্য, চিনি, ঘৃত পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যাইত। পশুলোমজ ও কার্পাসসূত্রনির্ম্মিত সুন্দর বস্ত্র এখান হইতে ভারতের নানা স্থানে এবং সুমাত্রা মলক্কশকাদি দ্বীপপুঞ্জে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হইত। ঘাস হইতে ঝেরুয়া নামে এক প্রকার বস্ত্র প্রস্তুত হইত তাহা দেখিতে অতি সুশ্রী এবং সুন্দর রেশমের ন্যায় মসৃণ ও চাকচিক্যবিশিষ্ট। সাত গাঁ অতি সুন্দর সহর—এখানে সকল জিনিষই প্রচুর ও সুলভ। প্রতি-দিনই কোথাও না কোথাও হাট বসিত। তাহাতে ধান, চাউল ও বিবিধ খাদ্যদ্রব্যের ক্রয়বিক্রয় হইত। ব্যবসায়ীগণ তাহা নৌকা করিয়া নানাস্থানে লইয়া যাইত। ঐ সকল নৌকা প্রকাণ্ড—এক একটায় ২৪।২৬টা দাঁড়। আপনাপন গ্রামে সুন্দর পানীয় জল স্বত্ত্বেও দূরবর্ত্তী স্থানের ভদ্র লোকেরা পবিত্র জ্ঞানে এখান হইতে গঙ্গা-জল লইয়া যায় এবং পানীয়রূপে তাহা নিত্য ব্যবহার করিতে না পারিলেও গায়ে ছিটাইয়া দিয়া আপনাদিগকে পবিত্র জ্ঞান করে ও ভক্তিভাবে গঙ্গাস্নান এবং ভূমিষ্ঠ হইয়া সূর্য্যপ্রণাম করে দেখিয়া ফিচ আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, সাতগাঁ হইতে

উড়িষ্যা ছয় দিনের পথ, ইহা একটী পৃথক্ রাজ্য। এখানকার রাজা বিদেশীয়দিগের বড় বন্ধু; সাধ্যানুসারে তাহাদিগকে সাহায্য করিয়া থাকেন, কিয়দ্দিন পূর্ব্বে পাঠানেরা উড়িষ্যা অধিকার করিয়াছে। আগ্রা হইতে আসিবার সময় ফিচ সাহেব ১৮০ খান নৌকায় লবণ, আফিম, হিঙ্গু, সীস, কার্পেটাদি নানা দ্রব্য আসিতে দেখিয়াছিলেন। অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতে কৃষিশিল্প ও বাণিজ্যের যে সমধিক উন্নতি ছিল তাহা বিদেশীয়দিগের ভ্রমণবৃত্তান্তে পড়িতে পাওয়া যায়।

সাতগাঁ হইতে ফিচ সাহেব ত্রিপুরা যাত্রা করেন। রাঢ়ের সহিত তাঁহার ত্রিপুরাভ্রমণ সম্বন্ধসংস্রবশূন্য সুতরাং আমাদের আর বেশী অগ্রসর হইবার প্রয়োজন নাই। তবে তিনি যে বাঙ্গালা হইতে শ্রীপুর Sirepore দিয়া গিয়াছিলেন তাহাকে কেহ কেহ শ্রীরামপুর মনে করেন, বস্তুগত্যা তাহা নহে। শ্রীপুর প্রাচীন সুবর্ণগ্রাম হইতে ১৮ মাইল দূরবর্ত্তী।

আকবর সাহের রাজত্বকালে ইংলণ্ডের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী রাণী এলিজেবেথের সনন্দ লইয়া খৃঃ ১৬০০ অব্দে এদেশে আসিয়া সুরাটে কুঠি স্থাপন করেন এবং দুই বৎসর পরে খৃঃ ১৬০৩ অব্দে অক্টোবর মাসের প্রথমে তাঁহারা দেশে ফিরিয়া যান। তাহার পর আবার আইসেন। এইরূপে আটবার যাওয়া আসা করিয়া এখানকার ব্যবসায়ে প্রতি টাকায় দুইশত টাকা লাভ করেন। ইহাতে আকবরের রাজত্ব শেষ এবং জাহাঙ্গীরের রাজত্ব আরম্ভ হয়।

এই সময়ে সিজর ফ্রেডরিক নামক জনৈক ভ্রমণকারী খৃঃ ১৫৬৩ অব্দে এদেশে আসিয়া যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"আমরা উড়িষ্যা হইতে বঙ্গদেশে যাত্রা করিলাম। উড়িষ্যা হইতে পর্ত্তুগিজদের পোর্ট পিকুইনো (সপ্তগ্রাম) ১৭০ মাইল। সমুদ্রের ধারে ধারে ৫৪ মাইল আসিয়া আমরা গঙ্গানদীর মোহানায় প্রবেশ করিলাম। সেখান হইতে সপ্তগ্রাম প্রায় ১০০ মাইল। জোয়ার পাইলে ১৮ ঘণ্টায় সপ্তগ্রামে পৌছিতে পারা যায়। প্রতি বৎসর এখানে ৩০।৩৫ খানি সামুদ্রিক বাণিজ্যপোত যাতায়াত করে। তদ্দ্বারা নানাদ্রব্য এখান হইতে স্থানান্তরে রপ্তানি হয়। এই বন্দরটী মোগলদিগের শাসনাধীন। পাটনার শাসনকর্ত্তা * এখানকার সর্ব্বময় কর্ত্তা।

ডি ব্যারোজ নামক একজন ইউরোপীয় ভ্রমণকারী বলেন— "সপ্তগ্রাম প্রকাণ্ড সমৃদ্ধিশালী নগর।"

আকবরের সময় হইতে মোগলরাজ্যের সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধির সঞ্চার। ভারতের অতি অল্প মাত্র স্থানে তাঁহার আধিপত্য বিস্তার হয় নাই। না হইলেও তাঁহাকে যে ভারতের একছত্রী রাজা বলা যায় সে পক্ষে সন্দেহ নাই। পাঠানেরা আপনাদের সম্পত্তির পুনরুদ্ধারের জন্য বরম্বার রাঢ়দেশে অত্যাচার উপদ্রব করিয়া সেখানকার অধিবাসিগণকে সর্ব্বস্বান্ত করিলেও তাঁহারই দ্বারা তাহাদের উচ্ছেদ সাধন হইয়াছিল। আকবর সাহের রাজত্ব ভারতবর্ষের ইতিহাসে যুগান্তর ঘটাইয়াছিল। মোগলরাজত্বের অভ্যুদয় তাঁহার অধিকারকাল হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার প্রপৌত্র আওরঙ্গজেবের সময় পর্য্যন্ত ছিল। আমরা পশ্চাৎ তাহার সবিস্তার আলোচনা করিব। আইন আকবরীর শাসনপ্রণালী অনুসারে মোগলরাজত্বের শেষ পর্য্যন্ত রাঢ়দেশের

* সপ্তগ্রাম কখন পাটনার শাসন কর্ত্তার অধীন ছিল বলিয়া মনে হয় না।

সর্ব্বত্র রাজকার্য্য নির্ব্বাহ হইত। সময়ে সময়ে ইহার কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিলেও আইন্ আকবরীর প্রাধান্য সর্ব্বোপরি পরিগণিত হইত।

হিন্দু সমাজ।—রাঢ়দেশে হিন্দু ভিন্ন অন্য জাতীয়ের বাস অতি বিরল। মুসলমান নবাগত, সেইমাত্র দুই একস্থলে উপনিবিষ্ট হইতেছিলেন। এ দেশের মুসলমানগণের অনেকেই হিন্দুর সন্তান সন্ততি। ক্রমশঃ তাঁহাদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটিয়া গিয়াছে। হিন্দু মাত্রেই স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠ ছিলেন। স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের মতে হিন্দুর দায়ভাগ ও দৈবকার্য্যের অনুষ্ঠান হইত। বিবাহ শ্রাদ্ধ অন্নপ্রাশনাদি সংস্কার, অশৌচপালন প্রভৃতি কার্য্যেও রঘুনন্দনের ব্যবস্থা প্রাধান্য লাভ করিত। গ্রাম্য দেব-দেবীর সংখ্যা এখনকার মতই ছিল। রঘুনন্দনের সময় হইতেই প্রতিমাপূজার আধিক্য দেখা যায়। তখন হিন্দুধর্ম্মের সজীবতা পূর্ণমাত্রায় রক্ষা পাইত।

হিন্দুর মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত ছিল না। বাগ্দী, হাড়ি প্রভৃতি নীচ জাতীয়ের মধ্যেই বিধবাবিবাহ চলিত। উচ্চ জাতীয়ের মধ্যে কৌলিন্যমর্য্যাদা পূর্ণমাত্রায় রক্ষা পাইত। কুলীন ব্রাহ্মণের বহুবিবাহ চলিত। আকবরের অধিকারকালে সতী-দাহ প্রায় উঠিয়া গিয়াছিল। তিনি ইহার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন।

খাদ্য।—হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ প্রাধান্য অটুট ছিল, ব্রাহ্মণের ব্যবস্থা ব্যতীত কোন দৈব কার্য্যের অনুষ্ঠান হইত না। পথে ঘাটে ব্রাহ্মণ দেখিলে সকলেই মাথা হেঁট করিত, ব্রাহ্মণের সহিত কাহারও একাসনে বসিবার অধিকার ছিল না। উচ্চবর্ণের বিধবাগণ ব্রহ্মচর্য্যায় কালাতিপাত করিতেন। অধিকাংশ লোকই সাত্ত্বিক আহারে অনুরক্ত ছিল। রাঢ়ীয়েরা দুবেলাই ভাত ডাউল তর-

কারীর মধ্যে কচু, কাঁচকলা, মোচা, থোড়, কুমড়া, ঝিঙ্গা, পটোল, উচ্ছে, বেগুন, খাম আলু, শ্বেত আলু (গোল আলু তখন এদেশে আসে নাই) শাকের মধ্যে পুতিকা, পালং, নটে, পুনকো, পলতা ইত্যাদি। ডাউলের মধ্যে কলাইয়ের ডাউলই ছোট বড় সকল গৃহস্থের নিত্য ভক্ষ্য ছিল। মৎস্য ও ঘৃত দুগ্ধ সকল গৃহস্থই খাইতে পাইত। জল খাবার ছিল গুড় আর মুড়ি। মোদকের দোকানে বাতাসা, নবাত, মুড়কি, পাটালি, মঠ সর্ব্বদা মিলিত—সন্দেশের মধ্যে রসকরা, মিঠাই, ছানার সন্দেশ সমারোহের কার্য্যে ব্যবহার হইত। লুচির ফলার ছিল না। চিঁড়া দইয়ের ফলারেই ব্রাহ্মণেরা পরিতৃপ্তি বোধ করিতেন। পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণভোজন না হইলে তাহা পণ্ড হইত। আজিও সে প্রথা লোপ পায় না।

রোগীর পথ্য ছিল খই বাতাসা সরু চাউল মুগের ডাউল। সাধ সাধার্থে কেহ কোন দিন মুগ মসুর অরহরাদির ডাউল খাইত। নিত্য খাদ্যের তালিকা মধ্যে লুচি রুটি স্থান পাইত না। রাত্রিকালে পর্য্যুষিত অন্নই প্রায় সকলের নিত্য ব্যবহার্য্য ছিল। রাঢ়বাসী অম্লরসে বড়ই আসক্ত, তদতিরিক্ত কটুতিক্ত ভোজনের অভ্যাসও বিরল নহে। আজিকালি আহারের পারিপাট্য যতটা, তখন ততটা ছিল না। মাংস ভোজনেব ইচ্ছা থাকিলেও ঘটিয়া উঠিত না, দেবীপূজার বলিদান এবং কুটুম্বসৎকারেই তাহা আবশ্যক হইত।

পোষাক পরিচ্ছদ।—পোষাক পরিচ্ছদেও বিশেষ আড়ম্বর ছিল না, সাধারণতঃ ধুতি উড়ানিরই চলন ছিল, কোট কামিজ ছিলই না—ছিল কেবল আংরাখা বা অঙ্গরক্ষা, তাহাও গৃহস্থলোকের অঙ্গে উঠিত না, পদস্থ অর্থবান্ ব্যক্তিরাই গায়ে

দিতেন। পাদুকা এখনকার মত অবশ্য ব্যবহার্য্য ছিল না, ছাতার ত কথাই নাই—স্থপারি পাতার না হয় তালপাতার ছাতাই শীত গ্রীষ্মে চালাঘরের চালের মত শিরোদেশে শোভা পাইত। রাজারাজড়ার মাথায় রেশমী কাপড়ের মুক্তার ঝালর দেওয়া ছাতার অনুরূপ কাল মোটা কাপড়ের ছাতা ছিল না। সাধারণে তাহা আবশ্যকও বোধ করিত না।

গৃহস্থগৃহিণীগণ চরকা ও আসনায় সূতা কাটিয়া তন্তুবায়কে বেতন দিয়া যে কাপড় বুনাইয়া দিতেন তাহা লজ্জা নিবারণেরই উপযুক্ত ছিল, সভ্যতা রক্ষায় সমর্থ হইত না—কারণ সে সকল কাপড় হাঁটুর নীচে নামিত না, আর পৃথক দড়ি দিয়া না আটকাইলে কটিদেশে থাকিত না, খুলিয়া পড়িত। বস্ত্র সূক্ষ্ম না হইলে বিনা আশ্রয়ে থাকিবে কেন। তদ্রূপ চাদরকে দোপাট করিয়া শীত নিবারণার্থ গায়ে দেওয়া হইত এবং দোহোর হামাম গেলাপ ইত্যাদি নানা নামে তাহার পরিচয় ছিল। উচ্চ মূল্যের শীত বস্ত্র ছিল স্থলতানী বনাত। ভট্টাচার্য্য পণ্ডিতগণের মহা আদরের পরিচ্ছদ। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সম্মান রক্ষারও প্রধান সম্বল। শাল জানিয়ারের ব্যবহার যেরূপে হইত আইন-ই-আকবরীতে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। গৃহস্থাঙ্গনাগণ সাধারণতঃ রৌপ্যালঙ্কারেই তৃপ্ত হইতেন।

ভাষা ও সাহিত্য।—কথোপকথনেই বাঙ্গালা ভাষার ব্যবহার ছিল, আদালতের ভাষা পারস্য, বিষয়কর্ম্মে তাহারই ব্যবহারবাহুল্য ছিল। দলিলদস্তাবেজ দেশীয় ভাষায় লিখিত পঠিত হইলেও তাহাতে পারস্য শব্দেরই ব্যবহার বেশী ছিল, এইরূপে আকবর সাহের সময় হইতেই বাঙ্গালা ভাষায় পারস্য শব্দের

রাঢ় দেশ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময় হইতে বহু বৈষ্ণব ভক্তের আবির্ভাবে পবিত্র [illegible]। অসংখ্য প্রেমিক বৈষ্ণব নানা প্রকারে তাঁহার লীলা বিষয়ক নানা গ্রন্থ রচনা দ্বারা বৈষ্ণব সাহিত্যের সৌন্দর্য্য সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত লোচন দাসের শ্রীচৈতন্য মঙ্গল, বৃন্দাবন দাসের শ্রীচৈতন্য ভাগবৎ প্রভৃতি শ্রীগ্রন্থ গুলিতে এবং অন্যান্য বৈষ্ণব কবির পদাবলীতে বাঙ্গালা ভাষা গৌরবান্বিত হইয়াছে। রাঢ়দেশের সকল গ্রামেই হরিনামের তরঙ্গ তুলিয়া বৈষ্ণবেরা ঘরে ঘরে পথে পথে নাচিয়া বেড়াইতেন। আকবরের রাজত্ব কালে রাঢ়ে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব একটী সুপ্রসিদ্ধ ঘটনা বলিতে হইবে। আকবরের রাজত্বে কেহ কোন ধর্ম্মের উপর অত্যাচার উপদ্রব করিতে পারিত না। অতএব ইহার রাজত্ব বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচার পক্ষে বিশেষ অনুকূল ছিল। প্রচারকে[illegible] [illegible]বাধে সর্ব্বত্র ধর্ম্ম প্রচারে পরিতৃপ্ত হইতে পারিতেন, আওরঙ্গজেবের রাজত্ব হইলে তাহা ঘটিতে পারিত না। সকলই ভগবানের ইচ্ছা।

প্রথমার্দ্ধ সমাপ্ত

প্রবেশ বাহুল্য ঘটিয়াছে। এ সময়ের সুপ্রসিদ্ধ কবি—বর্দ্ধমান দামুন্যা নিবাসী কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম ভট্টাচার্য্য, হুগলী পশ্চিমপাড়া নিবাসী রামদাস আদক, খেলারাম চক্রবর্ত্তী প্রমুখ কবিগণ প্রাদুর্ভূত হইয়া বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া গিয়াছেন।

স্বাস্থ্য। রাঢ়দেশের সর্ব্বত্র জলবায়ু স্বাস্থ্যকর ছিল, তবে আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে লোকের জ্বর জ্বালা হইত বটে; কিন্তু মাঘ ফাল্গুনে মলয়ানিলপ্রবাহে আর তাহা থাকিত না। আয়ুর্ব্বেদ মতেই রোগের চিকিৎসা হইত। স্থানে স্থানে সুচিকিৎসকের অভাব ছিল না। তাঁহাদের চিকিৎসাখ্যাতি ধন্বন্তরির ন্যায় হাতুড়ে গ্রামে গ্রামে ছিল। অকাল মৃত্যু প্রায় ছিল না। সকলেই সুখে স্বচ্ছন্দে সুস্থ দেহে কাল কাটাইত। কলিকাতা সহরবাসীরা বর্দ্ধমানে হাওয়া খাইতে যাইতেন। কৃষক রৌদ্র বৃষ্টি শিশিরে খাটিয়া কাতর হইত না। মৃত্তিকা শস্যশালিনী ছিল। পর্য্যাপ্ত ফসল জন্মিত—অনাবৃষ্টি অজন্মার কথা প্রায় শুনা যাইত না। রাঢ় স্বর্ণ ভূমি—লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। রাঢ়ের শস্য রাখিবার স্থান ছিল না।

সঙ্গীত। সঙ্গীতে বিষ্ণুপুর সুবিখ্যাত, সন্ধ্যার পর রাঢ়ের পাড়ায় পাড়ায়, বাড়ীতে বাড়ীতে গীতবাদ্যে সকলেই আমোদ আহ্লাদ করিত। দেশ যেন সুখের বিশ্রামভূমি। আজি সেই রাঢ়ের দিকে চাহিলে চক্ষে জল আসে।

ধর্ম্ম। আকবরের সিংহাসনরোহণের বাইশ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অপ্রকট হয়েন। আকবরের রাজ্যকালে ...ব গোস্বামী, গোপাল ভট্ট নরোত্তমদাস শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রমুখ

এ-যাবৎ সুহ্ম সম্বন্ধে পৌরাণিক প্রমাণ উদ্ধৃত করা গেল। অতঃপর কাব্য নাটকাদিতে রাঢ়ের কথা বলিতে হইবে। মহাকবি কালিদাস প্রণীত রঘুবংশে রঘুরাজার দিগ্বিজয় স্থলে সুহ্মদেশের নাম পাওয়া যায়।

স যযৌ প্রথমং প্রাচীং তুল্যঃ প্রাচীনবর্হিষা।
অহিতান্ অনিলোদ্ধূতৈঃ তর্জ্জয়ন্নিব কেতুভিঃ॥ ২৮
স সেনাং মহতীং কর্ষন্ পূর্ব্বসাগরগামিনীং।
বভৌ হরজটাভ্রষ্টাং গঙ্গামিব ভগীরথঃ॥ ৩২
পৌরস্ত্যানেবমাক্রমং স্তাং স্তাং জনপদাঞ্জয়ী।
প্রাপ তালীবনশ্যামং উপকণ্ঠং মহাদধেঃ॥ ৩৪
অনম্রাণাং সমুদ্ধর্ত্তুঃ তস্মাৎ সিন্ধুবরাদিব,
আত্মা সংরক্ষিতঃ সুহ্মৈর্বৃত্তিমাশ্রিত বৈতসীং॥ ৩৫
বঙ্গান্ উৎখায় তরসা নেতা নৌসধনান্বিতান্।
নিচখান জয়স্তম্ভান্ গঙ্গাস্রোতোহন্তরেষু চ॥ ৩৬
স তীর্ত্বা কপিশাং সৈন্যং রাজদ্বিরদসেতুভিঃ।
উৎকলাদর্শিতপন্থাঃ কলিঙ্গাভিমুখং যযৌ॥ ৩৮

৪র্থঃ সর্গঃ।

সেই রঘু পূর্ব্বদিক অবলম্বনে বহু দেশ জয় করিয়া মহা সাগরোপকণ্ঠস্থিত তালীবন শ্যামবর্ণ সমুদ্রকূলবর্ত্তী সুহ্মদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তদ্দেশবাসিগণ রঘুর আগমনে বৈতসীবৃত্তি অবলম্বনে কাঁপিতে কাঁপিতে রক্ষা পাইল। বঙ্গদেশের যে সকল রাজা নৌকারোহণে যুদ্ধার্থ উপস্থিত ছিলেন তিনি তাঁহাদিগকে পরাভূত করিয়া গঙ্গাস্রোতে জয়পতাক প্রোথিত করিলেন এবং তাহার পর গজনির্ম্মিত সেতু দ্বারা

কপিশা নদী পার হইয়া উৎকল-দেশ দিয়া কলিঙ্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সপ্তম শতাব্দীতে রচিত দণ্ডিনের দশকুমার-চরিতে লিখিত আছে—দমোলুক সুহ্মদেশের একটী নগর। "অস্তি সুহ্মেষু দেশেষু দমোলক নগরঃ।" তমোলুক নহে দমোলুক। এই সকল উক্তির আলোচনা পশ্চাৎ করা যাইবে। অগ্রে দেখা যাউক সুহ্ম ও রাঢ় এতদুভয় নামের উল্লেখ কোন্ কোন্ গ্রন্থে কিরূপে পাওয়া যায়।

> প্রাচ্য মাগধ শোনৌ চ বারেন্দ্রী গৌড়রাঢ়কাঃ।
> বর্দ্ধমান তমোলিপ্ত প্রাগ্‌জ্যোতিষোদয়াদ্রয়ঃ॥

জ্যোতিস্তত্ত্বে কূর্ম্মচক্র।

পূর্ব্বদিকে মগধ, শোন, বারেন্দ্র, গৌড় রাঢ় বর্দ্ধমান তমোলিপ্ত, প্রাগজ্যোতিষ (গৌহাটী)।

কৃষ্ণমিশ্র প্রণীত প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে কেবল রাঢ় দেশের নামমাত্র আছে তাহা নহে—দম্ভবাক্যে উহার ঐশ্বর্য্যেরও পরিচয় আছে—

> গৌড়ং রাষ্ট্রমুত্তমং নিরূপমা তথাপি রাঢ়া
> পুরী ভূরিশ্রেষ্ঠিক নামধামপরমং তত্রোত্তমা ন পিতঃ॥

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে দশকুমার-চরিত খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমে এবং প্রবোধচন্দ্রোদয় একাদশ শতাব্দীতে রচিত।

> অথ পূর্ব্বস্যামঞ্জনবৃষভধ্বজ পদ্মমাল্যবদ্গিরয়ঃ।
> ব্যাঘ্রমুখ সুহ্ম কর্ব্বট চান্দ্রপুরাঃ শূর্পকর্ণাশ্চ॥

বৃহৎসংহিতা, বঙ্গবাসী, ১৪শ অঃ ৫ম।

অনন্তর পূর্ব্বদিকে মঞ্জন, বৃষভধ্বজ, পদ্ম, মালবদ্দিগিরি, ব্যাঘ্র-মুখ, সুহ্ম, কর্ব্বট, চান্দ্রপুর শূর্পকর্ণ ইত্যাদি।

গঙ্গাবীচিপ্লুতপরিসরঃ সৌধমালাবতংশো।
ইধ্যাস্যত্ব্যয়িত্বরসময়ো বিস্ময়ঃ সুহ্মদেশঃ।
শ্রোত্রেক্রীড়াভরণপদবীং ভূমিদেবাঙ্গনানাং।
তালপত্রং নবশশিকলা কোমলং যত্রভাতি॥

২৭ ধোয়িকবির পবমদূত।

সেখান হইতে সুহ্মদেশ, উহার পরিসর ভাগ গঙ্গা-তরঙ্গে বিধৌত-সুধাধবলিত প্রাসাদরাজি উহার কর্ণভূষণ স্বরূপ। সেই সময় দেশে উপস্থিত হইলে, তুমি বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইবে। সেখানে নবশশিকলার ন্যায় কোমল তালপত্র ব্রাহ্মণাঙ্গণাগণের কর্ণভূষণ হইয়া থাকে।

পুরাণাদি শাস্ত্র হইতে সুহ্ম ও রাঢ়ের কথা অনেক উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, কিন্তু আর তাহার ততটা প্রয়োজন দেখা যায় না। কারণ আজি কালিকার ইংরাজীশিক্ষিত অনেকেই ভারতের উপযুক্ত প্রাচীনত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহা-দের সময় নিরূপণের দাঁড়া বড়ই হাস্যজনক—শ্রীমদ্ভাগবতে উৎকলতীর্থ এবং জগন্নাথ দেবের কথা আছে বলিয়া তাঁহারা বলেন—যে, জগন্নাথ দেবের প্রকটকালের পূর্ব্বে কোনমতেই শ্রীমদ্ভাগবৎ রচিত হইতে পারে না—শ্রীমদ্ভাগবৎ রচনার পর যে জগন্নাথের বিবরণ তাহাতে প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে, এ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার কি আপত্তি ছিল, তাহা ত বুঝা যায় না। যদি ভগবানের লীলা স্বীকার করিলে পাতিত্য জন্মে, তাহা হইলে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া স্থির করায় ত কোন দোষ বর্ত্তে না।

এইরূপ প্রত্নতত্ত্ববাদিরা বলিয়া থাকেন—আমাদের পুরাণ-গুলির অধিকাংশ মুসলমান রাজত্বে রচিত। পুরাণ মাত্রেই সৃষ্টি প্রকরণ, প্রজাসৃষ্টি এবং রাজবংশের বিবরণ অল্পাধিক লিখিত থাকে, থাকিলে কি হয়; যাঁহাদের নিকট তাহাদের আদর পাই-বার কথা, তাঁহারাই যদি অনাদর করেন,তাহা হইলে তাহাদের আর দাঁড়াইবার স্থান কোথায়? তাঁহারা পৃথিবীকে হাজার চারি বৎসরের অতিরিক্ত বয়স দিতে নিতান্ত নারাজ। কাজেই পুরাণগুলির উক্তি অনুসারে পৌরাণিক তত্ত্বাবধারণে প্রবৃত্ত হওয়া বিষম বিড়ম্বনার বিষয়, তাহার সন্দেহ নাই। তবে মহাভারত এবং দু-দশখানা পুরাণ যে দুই চারিশত বৎসরের নহে, তাহা ক্রমশঃ কেহ কেহ মানিয়া লইতেছেন।

সুহ্ম ও রাঢ়ের প্রাচীনত্বে কাহারও কোন আপত্তি নাই—যদি থাকে, তাহা হইলে আমাদিগকে জৈনধর্ম্মের শেষ তীর্থঙ্কর "মহাবীর চরিতের" এবং সিংহলের ইতিহাস "মহাবংশের" কথা পাড়িতে হয়। মহাবীর জৈনদিগের মধ্যে চতুর্বিংশ জিন। রাবণ নগরের অধীশ্বর কাশ্যপগোত্রজ সিদ্ধার্থনামা নৃপতির রাজ্ঞী ত্রিশলার গর্ভে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পুত্রপ্রসবে রাণী ত্রিশলার আনন্দের সীমা রহিল না। স্বর্গে বিদ্যাধরীগণ পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন, বিশ্বমধ্যে স্থাবর, জঙ্গম আনন্দে পুলকিত হইল। নৃপতি পুত্রের নাম রাখিলেন "বর্দ্ধমান"। বর্দ্ধমানে আসিয়া তিনি প্রথম ধর্ম্মপ্রচার করেন বলিয়া, তাঁহার নামানু-সারে এই স্থানের নাম হয় বর্দ্ধমান। শক্র, দেবতা ও মনুষ্যের উপর কর্তৃত্ব জন্য তাঁহার অপর নাম হয় মহাবীর। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া মহাবীর, সমর নামক রাজার কন্যা যশোদার পাণিপীড়ন করেন।

অল্পকাল পরেই প্রিয়দর্শনা নামে তাঁহার এক কন্যা জন্মে। কুমার জামলী তাঁহাকে বিবাহ করেন। ইতিমধ্যে মহাবীরের পিতৃমাতৃ-বিয়োগ হইলে, সংসার অনিত্য ও ক্ষণভঙ্গুর স্থির করিয়া জ্যেষ্ঠাগ্রজ নন্দিবর্দ্ধনকে রাজ্যভার প্রদানে তিনি যতিধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ক্রমাগত দুই বৎসর কাল ইন্দ্রিয় সংযমদ্বারা তিনি জিনত্ব লাভ করেন—তাহার পর ছয় বৎসরকাল কঠোর যোগাভ্যাসে পরম জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েন। তিনি নানাস্থানে আপনার ধর্ম্মমত প্রচারে প্রবৃত্ত হয়েন। বজ্রভূমি, সিদ্ধভূমি এবং লাট বা লাড় (রাঢ়) দেশীয় গোন্দগণ (চুয়াড়েরা) তাঁহার প্রতি যারপর নাই অত্যাচার ও উৎপীড়ন করিয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়েন নাই।

বাহাত্তর বৎসর বয়সে মহাবীর নির্ব্বাণ লাভ করেন। পূর্ব্ববর্ত্তী জিন পার্শ্বনাথের মৃত্যুর ২৫০ বৎসর পরে মহাবীর নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইউরোপীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে তাহা খৃষ্টীয় ৫৬৯ পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল।

পালিভাষায় লিখিত মহাবংশ নামক সিংহলদেশীয় ইতিহাস গ্রন্থে লিখিত আছে—বঙ্গদেশের এক রাজকন্যার নাম ছিল সুপ্রদেবী, তিনি অতি সুন্দরী ছিলেন, বয়স্থা হইলেও তাঁহার বিবাহ না হওয়ায় তিনি স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া পিতৃগৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্থানান্তর যাত্রা করেন, পথিমধ্যে এক সার্থ-পতির আশ্রয় পাইয়া তাহার সহিত অবস্থিতি করিতে থাকেন। কালক্রমে সুপ্রদেবীর এক পুত্র জন্মে, তাহার নাম সিংহবাহু, চীনীয় পরিব্রাজক হুয়েনত্সং ইহাঁকে জম্বুদ্বীপের মহাবণিক এবং সিংহ নামে উল্লেখ করিয়াছেন। সিংহবাহু শতযোজনব্যাপী অরণ্যমধ্যে

সিংহপুর নামে এক নগর এবং বহুসংখ্যক গ্রামের পত্তন করেন। সিংহবাহুর রাষ্ট্রের নাম লাড়রট্ট—প্রাকৃত ও পালীভাষায় রাঢ়কে লাড় বলে। "র" স্থানে "ল" লেখা হয়। সুতরাং রাঢ়দেশ লিখিতে লাড়্লট্ট লিখিতে হয়। * সিংহপুর বোধ হয় হুগলী জেলার সিঙ্গুর গ্রাম। সিংহবাহু স্বীয় ভগিনী সিংহ শ্রীবলিকে আপন মহিষী করিয়া তথায় রাজত্ব করেন। তাঁহার পুত্রের নাম বিজয়সিংহ। তিনি প্রজাপীড়ন দোষে নির্ব্বাসিত হইয়া তাম্রপর্ণী-দ্বীপে উপস্থিত হয়েন, এবং তথায় আধিপত্য বিস্তার করিয়া রাজত্ব করিতে থাকেন। এ জন্য ঐ দ্বীপের নাম সিংহল হইয়াছে। এ সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও সিংহোপাধিক লাড় লট্টের কোন রাজপুত্র যে সিংহলে গিয়া তথায় সিংহবংশীয় রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন, সে পক্ষে সন্দেহ নাই। ভগবান বুদ্ধদেব যে দিন কুশীনগরের শালতরুতলে নির্ব্বাণ লাভ করেন, সেই দিন বিজয়সিংহ তাম্রপর্ণ-দ্বীপে উপনীত হইয়াছিলেন। মহাবংশ পাঠে আরও জানিতে পারা যায় যে—কাশী কোশলেশ্বর প্রসেনজিৎ বিবাহ করিবার জন্য শাক্যবংশীয় এক কন্যা প্রার্থনা করিয়া কপিলাবাস্তুর তৎকালিক অধীশ্বর মহান শাক্যে নিকট এক দূত পাঠাইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার মহানন্দ নাম্নী দাসীর গর্ভজা কন্যা মালিকাকে পাঠাইয়া দেন। প্রসেনজিৎ তাহাকে শাক্যবংশীয়া বোধে প্রধানা মহিষী করেন। ঐ কন্যার গর্ভে বিরূঢ়ক নামে পুত্র জন্মে। বিরূঢ়ক কপিলা

* প্রাকৃত ভাষায় রচিত "মহাবীর-চরিত" দ্রষ্টব্য।

† রাদে লাদে—রাদে স্থানে-লাদের্ভবতি—চরণং চলনং কাষ্ঠং ব ইত্যাদি। সংক্ষিপ্তসারে প্রাকৃত পাদ।